

তাম্বূল বণিক্

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

তাম্বূল বণিক্।

তাম্বূল বণিক্

বা

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস

জাতিতত্ত্ব

ও

সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব বিষয়ক প্রস্তাব

সম্বলিত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত

এবাঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বিশ্যানামপি তথা।
(বৃষলত্বংগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।)

শুদ্ধিতত্ত্ব।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ।

মূল্য ১৷৷ দেড় টাকা।

তাম্বূল বণিক

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস।

জাতিতত্ত্ব

ও

সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব বিষয়ক প্রস্তাব

সম্বলিত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত

এবাঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা।
(বৃষলত্বংগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।)

শুদ্ধিতত্ত্ব।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ।

১৩১০।

মূল্য ১৲ এক টাকা

তাম্বূলী কুলরত্ন

শ্রীযুক্ত শম্ভূচন্দ্র দে বি, এল্,

ও

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন বি, এ,

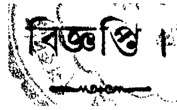
মহাশয়দ্বয়কে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।



বিজ্ঞপ্তি।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে নব্যভারতে "বাঙ্গালী বৈশ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ অব্দের আশ্বিন মাসে মহাজন বন্ধুর অতিরিক্ত সংখ্যায় "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামে অন্য একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতদুভয় অবলম্বনে বর্ত্তমান পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এতৎ সম্পাদন কল্পে আমি অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। স্থল বিশেষে তাঁহারা কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার অবসর পাই নাই। এজন্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি হইয়াছে। বাঙ্গালী বৈশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়, আশা করিয়াছিলাম, কোন উপযুক্ত লেখক বিস্তৃতভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিবেন; এ পর্য্যন্ত কাহাকেও উদ্যোগী না না দেখিয়া শারীরিক অপটুতা সত্বে পুনর্ব্বার আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। আমার উক্তি অন্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া রচনা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাম্বূলী সভার প্রথম অধিবেশনের দিন রাজকীয় জাতিতত্ব নির্ণায়ক কার্য্যালয়ে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ সমেত তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ "বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্য" নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ তাহার পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। সৎশূদ্রের অন্তর্গত বৈশ্যশাখায় অপর জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, অতএব জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী পাঠকমাত্রকে অনুরোধ করিতেছি, কৃপা করিয়া পুস্তক খানি পাঠ করিবেন।

কাশীধাম।
ফল্‌গূৎসব।
সম্বৎ ১৯৫৯

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

উপক্রমণিকা।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ।

বৈঁচির ১৪ গ্রামী সমাজ।

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সমাজ।

বাঁকুড়ার রাজহাটী সমাজ।

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী সমাজ।

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী সমাজ।

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজ।

কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজ।

ভুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রাম সমাজ।

বনকাটি "গোয়ালপেড়ে" অষ্টগ্রামী সমাজ।

কোতরাপুরের উৎকল অষ্ট-গ্রামী সমাজ।

খড়গপুরের "সংসেরে" ৪২ গ্রামী সমাজ।

সমাজ ভেদ।

বিবাহ পদ্ধতি।

বৈশ্যত্বের আলোচনা।

পরিশিষ্ট।

কলিকাতা,
শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
কটন ষ্ট্রীট ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে প্রাপ্য।
আর্য্যযন্ত্র, ফাইনআর্টপ্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট ও হরিযন্ত্র
২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয়

তাম্বূলী বৈশ্য

উপক্রমণিকা।

জগতে কোন জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ এক রূপ থাকে না। সকলেই কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক, কেবল বাহ্যিক নহে। ইহাতে শুদ্ধ গুণান্তরাধান হয় এমন নহে, ইহাতে প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এই পরিবর্ত্তনবশে এক জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অন্য এক জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, যে অগ্রে এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও জীবের কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান ছিল, পরে অসীম কাল সহকারে তাহা হইতে অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জীবের ও উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু যত ঊর্দ্ধস্থিত স্তরে উঠা যায়, তত অধিক সংখ্যক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বতন কালে অল্প সংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল; অধুনাতনকালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই যে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কখনই শূন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির এরূপে প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা সৃষ্টি-পারম্পর্য্য বিধৃত থাকে, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ বলে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যাহা সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয় এবং যাহা নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবলেই ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব আপন হইতে উৎকৃষ্ট জাতির উৎপাদন করিয়া ক্রমে হ্রাস হইয়া, হয়, এককালে

বিলুপ্ত হয়, না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ঋজু হইতে জটিল ক্রমশই উদ্ভূত হইতেছে।

এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারেই কালে কালে এই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য যে সৃষ্টির নিয়মাতীত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে অথবা একেবারে আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে। যে নিয়মে কালে কালে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, যে নিয়মে উদ্ভিদ্ প্রস্তর ও অপরাপর জীব জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই একই নিয়মবলে মনুষ্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কি জড় প্রকৃতিতে, কি জীব প্রকৃতিতে, যত প্রক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন। তাহারা যে সময়ে সময়ে কোন স্বতন্ত্র শক্তির পরিচালন প্রভাবে ঐরূপ হইতেছে তাহা নহে। তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় জাতি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার অবস্থা কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে কি জড় রাজ্যে, কি উদ্ভিদ্ রাজ্যে, কি জীব রাজ্যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে—যখন কি দৈহিক বিষয়ে, কি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে, কি প্রজনন ক্রিয়ায়, কি মানসিক গুণে, অনেক বিষয়ে জীব রাজ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঐক্য আছে, তখন একই জীব হইতে যে অন্য জীবের সৃষ্টি বা রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে জাতি সকল এ প্রকার পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদে নিবন্ধন শোণিত শুক্রের পরিণামে আশ্চর্য্য মানব দেহ উদ্ভূত হইতেছে, তখন ভূমণ্ডলে নূতন জাতি পরম্পরার উৎপত্তিও যে অবস্থাভেদ নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কোন্ গুলি জাতি, কোন্ গুলি বা এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। বর্ত্তমান জাতি-

পরম্পরার নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেরূপ সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবই দেখা যায়। নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম যুগে সরীসৃপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্য জাতির সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আর এক যুগে তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন, ইহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ।

ক্রম-প্রাদুর্ভাবের নিয়মানুসারে মানব যে নিম্ন জীব হইতে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কেবল যে পৃথিবীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বশেষে মানবের বিকাশ ইহা অনুমিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু নিকৃষ্ট জীবগণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়ও একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানব দেহের আন্তরিক গঠন ও ধাতু সকল পর্য্যালোচনা করিলে নিকৃষ্ট জীবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংসপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নর-দেহে যেরূপ, অন্যান্য প্রাণীর দেহেও সেই প্রকার। অধিক কি, মস্তিষ্কেরও অবস্থা সর্ব্বত্র সমান দেখা যায়। নিকৃষ্টজীব সকল মানবের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং উভয়েরই ক্ষত সংরোধ একই ঔষধে নিবারিত হয়। মনুষ্য স্তন্যপায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্তানোৎপাদ-নাদি মনুষ্যের বংশবিস্তার কার্য্য অপেক্ষা পৃথক্ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরি-পাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মনুষ্যেও যেরূপ, অন্যান্য জন্তুতেও তদ্রূপ। গর্ভাশয়ে শোণিত ও শুক্র প্রথমে যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যের ও নিকৃষ্ট জীবের একই রূপ। মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণ ও নিকৃষ্ট জন্তুগণের প্রাথমিক ভ্রূণ একই প্রকার। কেবল দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণীরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখদুঃখ বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল সর্ব্বসাধারণ। এই সকল ও অপরাপর নানা কারণে স্থির হইয়াছে, ক্রমপ্রাদুর্ভাবেই মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে উদ্ভিদে ও জীবে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন এক কোটী শ্রেণীর জাতি আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক কোটীবার ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, জাতিপরম্পরা নিকৃষ্টতর জাতি হইতে পর্য্যায় ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে?

মানব সৃষ্টি প্রকৃতির শেষ ও সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি। শুদ্ধ যে ভূপৃষ্ঠের স্তর

সকল পরীক্ষা দ্বারায় একথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে। অনুমান বলেও আমরা একথা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বৃক্ষ, লতা. ওষধি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, পর্ব্বত. হ্রদ, আকাশ প্রভৃতি সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির পর তবে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হয়। মনুষ্যের জীবন ধারণ জন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যেরই প্রয়োজন। এই সমস্ত অগ্রে সৃষ্ট না হইলে মনুষ্য একদিনের জন্যও পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সহিতই মানবের সাত্মতা আছে। মানবের দেহরক্ষার জন্য উদ্ভিদ্ চাই, আকরস্থিত ধাতুপদার্থ চাই, সুদূর সমুদ্র গর্ভস্থিত মণি মুক্তাদির আবশ্যক—জলজ জন্তু ও স্থলজ জন্তু—সকলই মনুষ্যের প্রয়োজন। সমুদয় সৃষ্টি মন্থন করিয়াই বিধাতা মানবসৃষ্টি করিয়াছেন। মানব সমুদয় প্রকৃতিরই সার প্রতিকৃতি। সুদূর আকাশ স্থিত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীও মানব সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। সকলেরই সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ আছে। মানব দেহের জন্য উদ্ভিদ্ রাজ্যে যাহা আছে, ধাতু রাজ্যে যাহা আছে, জীব রাজ্যে যাহা আছে, এমন কি জলরাজ্যে যাহা আছে, সমুদয়ই চাই। পার্থিব এমন কিছু নাই, যাহা মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগে না। আবার মানব মনও সমুদয় জীব রাজ্যের মনের সমষ্টি। সর্পের যে ক্রূরতা, শৃগালের যে ধূর্ত্ততা, কুকুরের যে প্রভুভক্তি, উষ্ট্রের যে কষ্টসহিষ্ণুতা, বানরের যে চাতুরি, সকলি মানববুদ্ধির আয়ত্ত। মানবকণ্ঠ সমুদয় জীবেরই ধ্বনির অনুকরণ করিতে পারে—মানবের গতি শক্তিও সর্ব্বজীবের গতিশক্তির সমষ্টি। মানবই সৃষ্টির শেষ বিকাশ। মানবদেহে আসিয়াই বৃক্ষ লতা ধাতু প্রভৃতি জড়রাজ্য ও পশ্বাদি চেতনরাজ্য লয় পাইয়া মানবেরই সম্বর্দ্ধনা করে। সুতরাং মনুষ্য যে শেষসৃষ্টি একথা বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক করে না। সমুদয় সৃষ্টির প্রভু করিয়াই বিধাতা মনুষ্যকে এখানে পাঠাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও বলে, যে আশীলক্ষ যোনি গত হইলে পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রের মৎস্যযুগ, বরাহযুগ প্রভৃতি কল্পনাও এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনেক পোষকতা করে। হিন্দুর মতে সৃষ্টি যে কত কালের তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রথমে জলের সৃষ্টি হয়। সমুদয় জগৎ জলময় থাকে। পরে কল্পান্তকাল ধরিয়া সেই জল হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি

সমুদয় পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর এক এক স্তর পরীক্ষা করিলে জানা যায়, যে এই সৃষ্টি এক দিনে বা দুই দিনে সম্পাদিত হয় নাই। বহু যুগান্তর ধরিয়া এই সৃষ্টি ক্রমশই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

আদিম জন্তুবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেচনা করিলে আমরাই ভূমণ্ডলের শেষ ও সর্ব্ব প্রধান অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব ভূমণ্ডলে আগমন করে নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আদিম অবস্থাতে ম্যামথ অর্থাৎ কেশরযুক্ত হস্তী, বৃহৎ বৃহৎ সর্প, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব সকল এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় পৃথিবীতে এই সকল পশুরই রাজত্ব ছিল। মনুষ্য ইহাদের ভয়ে সদা সশঙ্কিত হইয়া গিরিগুহামধ্যে বাস করিত। মনুষ্যকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া প্রকৃতি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল নিজ বুদ্ধিবলেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া প্রথমে আহার অন্বেষণ করিতে সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্ষুধাতুর হইলে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ কোন কার্য্য ভাল লাগে না। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কার্য্য ছিল। মনুষ্য যতই কেন অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর সর্ব্বকালেই ছিল। প্রকৃতি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি বলেই সে সমুদয় অজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন করিতে চিরদিনই সক্ষম। প্রথমতঃ মনুষ্য লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা পশু হনন করিত। কিন্তু যখন দেখিল, তদ্দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে পশ্বাদি হনন করা যায় না, তখন স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধনুঃশরের সৃষ্টি করিল। মনুষ্যের আদিম অবস্থার যদিও কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই, তথাপি পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদের আহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত কালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটী নির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিল না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায়, তাহারা গিরিগুহায় বাস করিত। ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল তাহারা অধিকার করিয়া-

ছিল ও সুবিধামত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। ইউরোপ খণ্ডে গিরি-গুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধি-মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম প্রস্তর-কাল ও দ্বিতীয় ধাতুকাল। প্রথম কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদয় প্রস্তরনির্ম্মিত। কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। পর পরকালে মনুষ্যের বাস স্থানে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র ও পিত্তলনির্ম্মিত তৈজসাদি দেখা যায় বটে, কিন্তু লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র সর্ব্ব শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্য কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে শিখিয়াছে। এইরূপে ক্রমে অভাব জ্ঞান ও তৎপূরণার্থ বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান।

মনুষ্য জাতির অবয়ব, বর্ণ, ও ভাষাভেদ দেখিয়া বলিতে পারা যায়, তিনটী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ফলে আদিম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই তিন শ্রেণীকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন।

এই আদিম মনুষ্য মধ্যে ভাষার সৃষ্টি যে কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা অথবা তাহারা কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহা জানিতে পারা অতি সুকঠিন। আদিম মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করুক বা নাই করুক, স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে থাকিতে হইলেও ভাষার প্রয়োজন। এ কারণ অনেকে অনুমান করেন, প্রথমতঃ ভাষা ঈঙ্গিতাত্মক ছিল। কাল সহকারে মনো-বৃত্তির পরিচালনে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে তিনটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভাষা অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টিতে মনুষ্যের কোন হস্ত নাই, উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাঁহারা বলেন, যখন ভাষাব্যতীত মনের কোন চিন্তা অগ্রসর হয় না, তখন মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, যে দশ জনে একত্র হইয়া যাহাকে যে নাম দিয়াছে, সেই নাম বরাবর চলিয়া আসিতেছে এবং এইরূপে ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এই মত অবৈজ্ঞানিক। কেননা, প্রথমে যাহারা একত্র হইয়া দ্রব্যাদির নামকরণ করিয়াছিল,

তাহারা তো কথা কহিয়া তবে ঐরূপ নামকরণ করিবে। সুতরাং ইহাদের মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। এ কারণ ঐ সকল মতের প্রতি আস্থা না করিয়া এক্ষণে ভাষা উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত মত, তাহা বলা যাইতেছে। ভাষা অনুকৃতি মূলক। প্রাকৃতিক অনেক বস্তুর দ্বারা এক একটা শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল শব্দের অনুকরণে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। নদী, কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ, গর গর শব্দে গর্জ্জন করিতেছে. কাক, কা কা রব করিতেছে, বিড়াল, মিউ মিঁউ করিতেছে—ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দের অনুকরণ করিয়া মনুষ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। ভাষা সকল আলোচনা দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তাহা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এক জাতীয় ভাষার ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্র দ্বারা বাক্যের গঠন হয়। কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এই সকল ভাষার বিভক্তি নাই। ইহাদিগকে "সংযোগ অসাপেক্ষ" ভাষা বলে। চীন, শ্যাম, আনাম বা ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা এইরূপ। ইহা মঙ্গোলীয়দিগের ভাষা। তুরানীয় শ্রেণী নামে অভিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উহা উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তরিত হয়। এই ভাষার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে এক প্রকার যোগ হয়। এই সকল ভাষাকে "সংযোগ সাপেক্ষ" ভাষা বলে। তামিল ভাষা. তাতার ভাষা এবং আমেরিকার আদিম জাতীয় ভাষা এইরূপ। ইহার নাম নিগ্রিটো বা দ্রাবিড় শ্রেণীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্তি আছে, সংযোগ কালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার নাম ককেসিও বা আর্য্যভাষা। ভূমণ্ডলের তাবৎ মনুষ্য কায়িক ও বাচিক ভেদে পূর্ব্বোক্ত তিন স্বাভাবিক জাতিতে বিভক্ত। আরবী, য়িহুদী, গ্রীক্, লাটিন, ইংরাজি, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সকল এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া এই সকল ভাষা গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল ভাষা দেশ ভেদে ও জাতি ভেদে বাহ্যতঃ পার্থক্য প্রতীত হইলেও অথবা ইহারা সহস্র সহস্র প্রকারে বিভক্ত হইলেও ইহাদের মূল যে এক, তাহা এক্ষণে

ভাষা বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষা গুলির মধ্যে অনেক গুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। সুতরাং এই সকল ভাষা যে একটী প্রাচীন মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত মূলক আধুনিক ভাষা, আধুনিক ও প্রাচীন পারসীক-দিগের ভাষা, গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা, এবং এই দুই ভাষা হইতে ফরাশীয়, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; জার্ম্মানি, ওলন্দাজী, ইংরাজি, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ে এবং রুস্ প্রভৃতি ভাষা সকলই সেই এক প্রাচীন আর্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন। যে জাতি ঐ প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাষাবিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে তাঁহারাই আর্য্য জাতি। এবং আর্য্যজাতীয় ভাষা সমুৎপন্ন অপরাপর ভাষা গুলি আর্য্য-ভাষা বলিয়া কথিত হয়। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা তাহারা আর্য্য বংশীয় বলিয়া অনুমিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্য জাতি।

এক্ষণে কথা এই যে প্রাচীন আর্য্য জাতি যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্য ভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই, যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যে হিন্দুকুশ পর্ব্বত-মালার উত্তরে আসিয়ার মধ্য-ভাগে প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেই স্থান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কোন দল প্রাচীন গ্রীস্ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কাল ক্রমে শিল্প ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে অতুল-নীয় হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর এক দল রোম রাজ্য সংস্থাপন করতঃ এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর এক দল ইংলণ্ড ও

জর্ম্মণিতে প্রবেশ করিয়া সভ্য জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন এবং এক দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানের অনন্ত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন।

যে সকল আর্য্য ভারতবর্ষাভিমুখে প্রয়াণ করেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা সপ্তসিন্ধু শোভিত পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া বসবাস করেন। অতঃপর তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তে, তার পর ব্রহ্মর্ষি দেশে, তৎপরে মধ্যদেশে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থান, গার্হস্থ্য-প্রণালী, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি এক্ষণকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ যখন পঞ্জাব প্রদেশের স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে প্রথমে আবাস ভূমি মনোনীত করিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন ঐ দেশের আদিম নিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনার্য্যগণ সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহায় বা অরণ্যে গমন করিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং আর্য্যগণেরই উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে এই কৃষ্ণবর্ণ দস্যুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে প্রাচীন আর্য্যগণ দেবতার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছেন। অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া যে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের রচনাকালে অর্থাৎ তাঁহাদের ভারতে বসবাস কালে যে তাঁহারা সিন্ধু নদী শোভিত ভূভাগে বাস করিয়াছিলেন, তাহারও বিস্তর প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদী এবং ইহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সকল নদীর কথাই বেদে বারম্বার উক্ত হইয়াছে—দুই এক স্থানে মাত্র গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য জাতিগণের ন্যায় তাঁহারা অসভ্য ছিলেন না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অনার্য্যগণের ভাষা আর্য্যগণের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনার্য্যগণের ভাষাকে পশুরব বলিয়াও বেদে বর্ণিত আছে। শুদ্ধ ভাষা বিষয়ে যে তাঁহারা অনার্য্যগণের সহিত

পৃথক্ ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজ সংস্থান গার্হস্থ্যাদি অনার্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; বস্ত্রবয়ন প্রথা অবগত থাকাতে উত্তমোত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া জনসমাজে বিচরণ করিতেন; গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অবগত থাকাতে প্রশস্ত প্রশস্ত পর্ণ গৃহ এমন কি অট্টালিকা সকলও নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিতেন; লৌহাদি ধাতু সকলের ব্যবহার জ্ঞাত থাকায় তাঁহারা প্রয়োজনোপযোগী সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিতেন। স্বর্গে ও নরকে এবং আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ, আর্য্য ও অনার্য্যে সেইরূপ প্রভেদ ছিল। শুদ্ধ যে প্রাচীন আর্য্যগণ তদানীন্তন অনার্য্যজাতিগণের অপেক্ষা সভ্য ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের সেই সভ্যতালোক পারম্পর্য্যক্রমাগত হইয়া অদ্যাপিও আমাদিগকে আলোকিত করিতেছে। আমাদের মধ্যে ইদানীন্তন যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, যেরূপ অতিথিসেবা, গোসেবা, দায় ভাগ, অঙ্ক, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ঈশ্বরোপাসনা, সম্বন্ধনির্ণয়, দশবিধ সংস্কার, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই সেই প্রাচীন আর্য্যগণের অনুকরণে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিবাহ স্থলে দম্পতি যুগল মধ্যে পরস্পর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রাখিবার জন্য সেই গণনাতীত কালের যে সকল বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহারা যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, আজও আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। স্নান, দন্ত ধাবন, অন্ন গ্রহণ, শয়ন, উপনয়ন, গর্ভাধান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সমুদয় সৎকর্ম্মে আমরা আজও মন্ত্রগত এবং অনুষ্ঠানগত তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকি। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবল ছিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। দেশ বিদেশে সমুদ্র পারে বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের এত বিচার ছিল না। বর্ত্তমান দেব দেবী পূজাও প্রচলিত ছিল না; তখন সকলেই সরলচেতা ছিল—যুদ্ধাদিতে সকলেরই সহানুভূতি হইত—তখন কেবল ক্ষত্রিয়গণের স্কন্ধে যুদ্ধ ভার অর্পিত হয় নাই। তৎকালে যাঁহাদিগকে ঋষি বলা যাইত, তাঁহারাও যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত

থাকিতেন। আজ কাল আমরা ঋষি শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রাচীন বৈদিক কালে ঋষি শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। আমরা ঋষি শব্দে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ধ্যানধারণাপরায়ন যোগরত অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী অলৌকিক পুরুষ মনে করি। কিন্তু বেদে যাঁহাদিগকে ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন। তাঁহারা পশ্বাদি পালন, ক্ষেত্রকর্ষণ এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঈশ্বরের নিকট ধন ধান্য পশু ও জয় লাভ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তৎকালে এক এক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষই ঋষি নামে অভিহিত হইতেন।

আজ কাল ভারতবাসী আর্য্যগণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সিন্ধুতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। ঋক্ বেদের ন্যায় প্রাচীনতম গ্রন্থ আর পৃথিবীতে নাই। উহাই আর্য্যগণের আদি পুস্তক। উহাতে দশ সহস্র ঋক্ আছে। সেই সকল ঋক্ পাঠ করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধ, বিবাহ, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সমুদয় ব্যাপারই ঐ সকল ঋকে লিখিত আছে। কিন্তু উহার কুত্রাপিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি ভেদে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই। যদি তৎকালে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আর্য্য সমাজের এমন একটী গুরুতর প্রথা কি সমুদয় বেদে উল্লিখিত হইত না? ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অপরাপর যে কোন গ্রন্থই পাঠ কর, গ্রন্থ বৃহৎই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক, কিছু না কিছু পরিমাণে তাহাতে বর্ণ ভেদের উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ঋগ্বেদের ন্যায় অতি সুবৃহৎ বিশেষতঃ আদিম পুস্তকে যে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই—তৎকালে যে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃত্তিগত জাতিভেদ বর্ণ-ভেদের নিদান। ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে বর্ণ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্য বুঝায় না—সেখানে বর্ণ শব্দে রঙ্ বুঝায়—তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য ও গৌরবর্ণ আর্য্যকে বুঝায়। আর্য্যদিগের উজ্জ্বলবর্ণ রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা

করিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বুঝায় না—ক্ষত্রিয় শব্দে বলবান বুঝায় ও উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিপ্র শব্দের যাহা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রাহ্মণ বর্ণকে বুঝায় না—তাহা জ্ঞানীকে বুঝায় এবং উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এমন কি ঋগ্বেদে যে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ আছে, উহা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝায় না। পরন্তু যাঁহারা মন্ত্র রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত। ঋগ্বেদের সময়ে পৌরোহিত্য ক্রিয়ার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল না। অথবা দেব দেবীর উপাসনা জন্য মন্দির বা স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। গৃহপতিগণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব স্ব গৃহে উপাসনা করিতেন। তখন সকলেই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র দ্বারা স্ব স্ব ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিত। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। কিন্তু তৎকালে যদি পরবর্ত্তী কালের ন্যায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়গণ ঐ যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ লেখা থাকিত। কিন্তু ঋগ্বেদের কুত্রাপিও এরূপ বিবরণ নাই। তখন সমুদয় সমাজই একতাবদ্ধ ছিল। বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ ছিল না। ঋক্‌বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তিকালে যে সকল আর্য্য কৃষি ও গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই আবার অনার্য্যগণের উপদ্রব হইতে গ্রাম বা নগর রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

সমগ্র ঋক্‌বেদের মধ্যে আমরা দশম মণ্ডলের একটী ঋকে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ইদানীন্তন কালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলটী আধুনিক। দয়ানন্দ স্বরস্বতী কহেন,—সেই ঋক্ একটী রূপক মাত্র। ঋক্‌বেদের সময় অর্থাৎ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে যে চাতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা ছিল না, তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়। মহাভারতের এক স্থানে আছে,—যে আদিমকালে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। কাল ক্রমে তাহাদের মধ্যে আচার ও বৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় লোক এক বর্ণ ও

ব্রাহ্মণ ছিল, মনুর অগ্রজন্মা বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনু অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণগণকে অগ্রজন্মা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল; ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদনন্তর চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য যে এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই, কালে কালে গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, শাস্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের সময়ে বর্ণভেদ ছিল না—ঋক্‌বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকল আলোচনা করিলে যদিও বর্ণভেদের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি তাহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বর্ণভেদের কঠোরতা দেখা যায় না। এক্ষণে যেমন যে শূদ্র আছে, সে আজন্ম শূদ্র থাকিবে, যিনি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি গুণহীন হইলেও আজন্ম ব্রাহ্মণ থাকিবেন—এক্ষণকারকালে যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিবেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অন্ন ভোজন করিবেন না প্রভৃতি প্রতি কর্ম্মে লোকে বর্ণ বিচার করে, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। এক্ষণকারকালে বর্ণভেদ বংশগত, বৃত্তিগত বা গুণগত নহে। প্রাচীন শাস্ত্র সকল আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে এক পিতার চারি পুত্রের মধ্যে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয় কেহবা বৈশ্য ও কেহবা শূদ্র ছিলেন। সকলেই জানেন, বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ক) ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (খ) ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম। তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন। বিশেষতঃ এক এক বংশে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

(ক) অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথি র্যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়।

(খ) দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর্নৃপঃ।

মৈত্রায়ণ স্তুতঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তুঃ ততঃ স্মৃতাঃ॥

মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়,

বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ূপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (গ) মনু বৈবস্বতের পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র নেদিষ্ঠ। কিন্তু নেদিষ্ঠের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর এক গাভিকে হনন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (ঘ) নাভাগারিষ্ঠের যে দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণ হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ঙ) সুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ এবং গৃৎসমদ; গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকের বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বায়ু পুরাণেও আছে, (চ) গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক; তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ছ) ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে

(গ) করুষাৎ কারুষামহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগোনেদিষ্ঠ পুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়।

(ঘ) নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ১১ অধ্যায়।

(ঙ) কাশ লেশ গৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যা ভবন্।
গৃৎসমদস্য শৌনক শ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ ॥
এতস্যবংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ॥
বায়ুপুরাণ।

ধৃষ্টকেতুস্তুতশ্চ বৈণুহোত্র স্ততশ্চভার্গঃ।
ভার্গস্য ভার্গভূমি রতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই উদ্ভব হয়। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে ;—(ক) বৎস হইতে বৎস ভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গবংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বিভিন্ন বর্ণের চারিটী পুত্র জন্মিবার কথা লেখা আছে, তদ্রূপ অপরাপর ব্রাহ্মণ বংশ হইতেও যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন গুণকর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে আছে,—কৃত যুগে বর্ণভেদ ছিল না ; পরে লোকের কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা বর্ণভেদ ব্যবস্থা করিলেন। মনুষ্যের মধ্যে যাহাদিগকে তিনি প্রভু শক্তি এবং বীরত্ব সম্পন্ন দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ক্ষত্রিয় করিলেন। যাহাদিগকে সত্যবাদী, ঈশ্বর-পরায়ণ এবং জ্ঞান প্রচারে উৎসুক দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ব্রাহ্মণ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সাংসারিক, কার্য্যপটু, পরিশ্রমী এবং কৃষিজীবী দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য করিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, মল পরিষ্কারক প্রভৃতি দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি শূদ্র করিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন, পরে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে, রক্তবর্ণ গৌরাঙ্গ দ্বিজগণ যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত, উগ্র ও ক্রোধন স্বভাব এবং যাগ যজ্ঞ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন, পীতবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা গো ও কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম ও ক্রিয়া কলাপ বর্জ্জিত হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা মিথ্যাপ্রিয়, অত্যাচার রত, সংসারাসক্ত ও নীচ কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক্ষম, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(ক) বৎসসা বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ ॥
কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম।

পূর্ব্বে প্রয়োজন ও ক্ষমতানুসারে এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বৃত্তি এবং ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না। মনুতে আছে ;—

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ ॥

স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ যদি জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন। যেহেতু এই তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃত্তি।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষি গো রক্ষমাস্থায় জীবেৎ বৈশ্যস্য জীবিকাং ॥

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি উভয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন না হইলে কৃষি, গো রক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন।

"বৈশ্যোজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্র বৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ ॥"

বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি করিবেন। এবং উপায় হীন স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার পালনে অক্ষম শূদ্রেরও দ্বিজ শুশ্রূষাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নিষ্পন্ন করিবেন। মনু বলেন ;—

"যথাযথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অনুসূয়ক শূদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের আচার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করেন।

আজকাল যেমন গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, কর্ম্মবান্ হউক বা নাই হউক, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইবেক, অথবা ক্ষত্রিয়াদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ক্ষত্রিয়াদি হইবেক, পুরাকালে বর্ণভেদের এতদূর কঠোরতা ছিল না। তৎকালে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণের উন্নতি ও অধোগতি ছিল। ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে শূদ্র হইত এবং শূদ্রও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইত। মনুতে আছে :—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মে বন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥"

কর্ম্মানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও কর্ম্মানুসারে শূদ্র হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে আছে :—

"এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগম সম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোঽপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্ব সঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভি শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্মচ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতে র্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণং ॥
সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥
ব্রহ্মস্বভাব কল্যাণিঃ সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা-শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা-শূদ্রত্ব মাপ্নুতে ॥”

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত শূদ্রসন্তান শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভকর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র. সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায়। অতএব নির্গুণ, নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে বলিলাম।

“ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ ॥১॥
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ ॥২॥”
(আপস্তম্ব সূত্র)

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে বর্ণে যোগ্য হইবে, সেই বর্ণে গণনীয় হইবে। তদ্রূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণনীয় হয়।

সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া কেবল গুণ ও কর্ম্মানুসারে হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আরও উদাহৃত হইতে পারে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে নানা প্রকারের বৃত্তির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বনকারীগণ তখনও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা অধ্যায়দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নানারূপ বৃত্তির কথা লেখা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শত পথ ব্রাহ্মণে আছে;—বিদেহ-রাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বরপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে;—ইলুষের পুত্র কবশকে দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া অপরাপর ঋষিগণ কোন যজ্ঞীয় সভা হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু কবশের সহিত দেবগণের সদ্ভাব থাকায় তিনি পুনরায় ঋষিসমাজভুক্ত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সত্যকাম-জাবাল-সংবাদ আছে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যায়, যে সত্যকাম অজ্ঞাত কুলোৎপন্ন দাসীপুত্র হইলেও গৌতম তাহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত করিয়া বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। 'শূদ্রকে বেদের উপদেশ প্রদান' এরূপ আখ্যায়িকা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাইয়া থাকি।

গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষক্রমে যে বর্ণভেদ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলিও প্রমাণস্বরূপে উদাহৃত হইতে পারে।

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্তস্তপো ঘৃণা।

দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"
(মহাভারত)

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"যস্যচাত্ম সমোলোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য অবলোকন করেন এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন নচ বন্ধুভিঃ।
ঋষয় শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনুচানঃ সনোমহান্॥"
(মনুঃ।)

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহত্ত্ব হয় না। ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আমাদের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

"নতেন বৃদ্ধো ভবতি যে নাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥"

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

পুরাকালে যে কেবল ব্রাহ্মণবীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত হইতেন, তাহা নহে। পরন্ত গুণানুসারে ব্রাহ্মণের আদর ছিল।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটী জাতি মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনার্য্যের পরিচয়স্থলে তাহারা দস্যু বা দাস ইত্যাদি ঘৃণাজনক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাইত—

দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋক্‌বেদে ব্যবহৃত হয় নাই। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরা ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ এবং আর্য্যেরা গৌর। তাহারা বর্হিষ্মান্ অর্থাৎ যজ্ঞ করে না, আর্য্যেরা যজ্ঞ করে; তাহারা "অব্রত," অর্থাৎ তাহাদেরজীবনের কোন নির্দ্ধারিত ব্রত বা কর্ত্তব্য নাই, আর্য্যেরা "সব্রত"। তাহারা অসুর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপভোগই তাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ; আর্য্যেরা সুর; অনার্য্যেরা "অন্যব্রত" "অমানুষ" "অযজান" "অদেব" "মৃধ্রবাচ" অর্থাৎ কথা কহিতে জানে না, নৃশংস, ক্রূর, রাক্ষস, পিশাচ, অতএব হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! হে বরুণ! সেই অনার্য্যগণকে নিপাতিত কর; তাহারা যেন আর্য্যগণের বশীভূত হয়; আমাদিগের বংশে যেন এমন বীর পুত্র সকল জন্মে, যাহারা ঐ সকল অনার্য্য শত্রুদিগকে ধ্বংস করে; ইত্যাদি বহুবিধ প্রার্থনা ঋক্‌বেদে বারম্বার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায়, যে আর্য্যেরা অনার্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী, এবং ভিন্নভাষী ও অনার্য্যদিগের পরম শত্রু ছিলেন।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে মনু-সংহিতা-সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্য্যেরা বসতি করিত। পৌণ্ড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চিন, কিরাত, দরদ, খস, অন্ধ্র, শবর প্রভৃতি অনেক অনার্য্য জাতির নাম মনু ও মহাভারতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে এই সকল জাতি দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে।

অনার্য্যেরা যে পরিশেষে আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই, উহারা যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য বিধায় আর্য্যেরা সেই সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং সেখানে তাহারা সহজেই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্রাবিড়ের ন্যায় কোন কোন দেশ অনার্য্য-প্রধান হইলেও তাহা

আর্য্য-অধিকৃত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য এবং দাক্ষিণাত্যের সাধারণ লোক অনার্য্য। যদিও আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তথাপি দাক্ষিণাত্য আর্য্যজিত প্রদেশ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আর্য্যীভূত হয় নাই। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও ঐ সকল আর্য্যজিত প্রদেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যীভূত, যে সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজও অনার্য্য। বাঙ্গালা দেশ অনার্য্যপ্রধান।

বাঙ্গালা দেশের উত্তর সীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে পাই; খাম্‌টি, সিংকো, মিশ্‌মি, দফ্‌লা ও পাদম্ প্রভৃতি অনেক অনার্য্যজাতি বসতি করে। আসাম প্রদেশে নাগা, কুকি, মণিপুরী, কোপেনী, মিকির, জয়ন্তিয়া, খসিয়া ও গারো জাতির বাস। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরে কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমাল জাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদের নিকট কুটুম্ব কোচ জাতির বাস। হিমালয় পর্ব্বতের ভিতরে ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী জাতির বাস। বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমায়—মগ, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইন্ প্রভৃতি জাতির বাস। ত্রিপুরার ভিতরে রাজবংশী, নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড. কোড়োয়া ও ধাঙ্গড় জাতি বাস করে। সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ড, বীরহোড়, কড়ুয়া, কুর, বা কুকু, খাড়িয়া ও জোয়াঙ্গ এই কয়েকটী কোল্‌বংশীয় অনার্য্য বাঙ্গালা বিভাগে বাস করে। তন্মধ্যে জুয়াঙ্গোরা উড়িষ্যায় ঢেকানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। খাড়িয়ারা সিংভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রদেশে বাস করে। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যার বৈতরণী তীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে; কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন সাঁওতাল পরগণা বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ্, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতাল দিগের বাস আছে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা ছোট নাগপুর অঞ্চলে বাস করে। দিনাজপুর,

মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে।

বিজিত অনার্য্যজাতিগণ কালে কালে জেতৃ আর্য্যগণের সংশ্রবে আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও ভাষা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আর্য্যাকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরাপর বৃত্তিতে যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সমাজে তাহাদের সম্মান একেবারেই ছিল না। মনু বলেন, চিকিৎসক, দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রেতা, দোকানদার, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। যাহারা গায়ক, নর্ত্তক, ধনুর্দ্ধর, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুর দমনকারী, যাহারা জ্যোতিষ গণনা দ্বারা লোকের ভাগ্যাভাগ্য নির্ণয় করে, যাহারা ব্যাধ, যাহারা স্থপতি কার্য্যে কালক্ষেপ করে, যাহারা দৌত্যকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যাহারা মেষ-পালক ও গোপালক ইহারাও ঘৃণিত। কসাই, তৈলকার, বেশ্যা,মদ্য-বিক্রেতা—মনুর মতে ইহারা সকলেই এক শ্রেণী-ভূক্ত। ব্রাহ্মণ ঐ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না। চোরের অন্ন, গায়কের অন্ন, সূত্রধর, কুসীদজীবী, চিকিৎসক, ব্যাধ, কর্ম্মকার, নাট্যকার, স্বর্ণকার, অস্ত্র-বিক্রেতা, ডোম, রজক ও শিল্পকার ইহাদের সকলের অন্নই দূষিত। ব্রাহ্মণ ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কৃষি কর্ম্মের উপরও শাস্ত্রকারগণের বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কোন মতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। স্থূল কথা, তৎকালে সমাজের সকলেই ঘৃণিত ছিল, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্মানার্হ ছিলেন। এই কারণ হিন্দু সমাজে কোন কালে শিল্প বিদ্যাদির উন্নতি দেখা যায় না। অথবা ঐ সকল ব্যবসায়ে কোন লোক যে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাও শুনা যায় না। এই কারণেই শাস্ত্রকার ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে যে এই সকল সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে অধুনা লোক-সংখ্যা-গণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ অপেক্ষা সঙ্কর বর্ণের অস্তিত্ব অধিক। যথায় ব্রাহ্মণ এক জন, তথায় সঙ্করবর্ণের সংখ্যা সহস্র জন হইবে। কিন্তু এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে হাস্যোদ্রেক হয়। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের

সহবাসে এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ এরূপ বলেন। যথারীতি প্রকাশ্য বিবাহের সন্তানসন্ততিগণের সংখ্যা এত অল্প হইল এবং গুপ্ত বিবাহের সন্তানসন্ততিসংখ্যা তাহার সহস্র গুণ অধিক হইল, একথা কোন্ বিচারে গ্রহণ করা যায়? আর কি প্রকারেই বা শাস্ত্রকারগণ জানিতে পারিলেন, যে কে কাহার নিকট গুপ্তভাবে গমন করিয়া কোন্ সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন? গুপ্ত গমনের যথারীতি গণনা-পুস্তক না থাকিলে এরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ কি প্রকারে গ্রাহ্য হইবে? গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে অন্যূন ৫০০০।৬০০০ হাজার ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক দেখা যায়; ঐ সকল জাতিই বা মনুর পরে কিরূপে উদ্ভূত হইবে? উহারাও কি স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যভিচারে উৎপন্ন, না বৃত্তিভেদ অনুসারে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে? মনুর সময়ে আর্য্যসমাজ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ়। তাঁহার সময়ে আর্য্যসমাজে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, গোয়ালা, তন্তুবায় প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না, এমন কথনই হইতে পারে না। তবে মনু কেন উহাদিগকে উল্লেখ করিলেন না? বাঙ্গালায় এক্ষণে বৈশ্য বর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। পরন্তু প্রাচীনকালে জন সাধারণকেই বৈশ্য বলিত। সুতরাং সমুদয় বর্ণের লোকাপেক্ষা বৈশ্যবর্ণের জনসংখ্যাই অধিক। কিন্তু কিরূপে এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল? ইহারা কি সবর্ণা স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বর্ণের স্ত্রীতে প্রসক্ত হইয়া পরিণামে সঙ্করবর্ণে পরিণত হইয়া আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিল? এইরূপ আশঙ্কা সম্ভবপর নহে। পরন্তু ইহা সম্ভব হইতে পারে, যে মনুর সমকালীন বৈশ্যগণ বৃত্তিভেদে এক্ষণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়াছে। মনুতে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ও বৈদ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদিগকে কোন স্থলেই স্বতন্ত্র বর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। আজ কাল বর্ণভেদের যে প্রধান অঙ্গ অন্ন বিচার, মনুর সময়ে ঐ সকল বর্ণের মধ্যে অন্ন বিচারের ততটা কঠোরতা ছিল না। কেননা মনু দাস, গোপাল, নাপিত, কুল মিত্র প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ দোষাবহ নহে বলিয়া গিয়াছেন; অথবা শূদ্রান্ন খাইলে তেজ নষ্ট হয়, গণিকার অন্ন খাইলে উভয় লোক হইতে বিচ্যুতি হয়, কুসীদজীবির অন্ন ভক্ষণ পূযভক্ষণের সমান ইত্যাদিভাবেই অন্ন বিচার করিয়া গিয়াছেন।

মনু বৈশ্যগণের কর্ম্ম-বিভাগ-স্থলে কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মতঃ গ্রহণ করিতে গেলে তখন কৃষক, রাখাল, বণিক, দোকানদার প্রভৃতি সকলেই বৈশ্যপদবীবাচ্য ও বেদের অধিকারী ছিল। পরাশর কর্ম্মকার, পোদ্দার, ব্যবসাদার, কৃষক প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন।

বৈশ্যের শূদ্র হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে তাহাদের অজ্ঞতা প্রধান। তাহারা আপন অধিকার রক্ষার জন্য কখনও প্রয়াস পায় নাই। যে সদা বিষয়কর্ম্মে রত, তাহার পক্ষে দ্বিজোচিত ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সময় কোথায়? সুতরাং তিনি যে ক্রিয়ালোপ-প্রযুক্ত শূদ্রত্বে পতিত হইবেন, ইহা অসম্ভব নহে। এইরূপ ক্রিয়াবর্জ্জিত জাতিগুলিকে অশ্রদ্ধেয় করিবার জন্য সদাচারনিরত শাস্ত্রকারগণকে কোন উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। যাহারা শূদ্র নহে, অথচ শূদ্রের আচারধারী হইল, তাহাদের সামাজিক সম্মান খর্ব্ব করিবার জন্য ও ক্রিয়াবান্‌দিগের নিকট হেয় দেখাইতে হইবে বলিয়া সঙ্করত্বের আরোপ করিয়া দিলেন। তাহাতেও কিঞ্চিৎ উৎকর্ষাপকর্ষের ভাব রাখিলেন। সঙ্করত্ব কিন্তু অলীক নহে, তাহা অন্য প্রকারে সত্য। মূলে সত্য না থাকিলে ঐ তত্ত্বের এত প্রসার হইত না। অধ্যাপক ফাউলারের মতানুবর্ত্তী পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্যানুসারে মানবগণ মঙ্গোলিক, ককেশীয়ান ও নিগৃটী এই তিন প্রাকৃতিক জাতিতে বিভক্ত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় মহাপণ্ডিত এণ্ডার্স রেডজিয়স্ জাতিতত্ত্ব বিদ্যার ক্রিয়াসিদ্ধ অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া কিউভার সাহেব ভারতের অধিবাসীদিগের মুখমণ্ডল ও মস্তকের পরিমাণ করতঃ স্থির করিয়াছেন, যে তাঁহারা ককেশীয় ও নিগ্রিটো জাতির মিশ্রণ। মিশ্রণ ভারতবর্ষীয় তাবৎ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ও ককেশীয়। তাঁহারা ভারতে আগমন করিয়া তাৎকালিক অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগৃটো দ্রাবিড়গণের সহিত কিছুকাল পরে একরক্ত হইয়া এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, যে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর করা দুরূহ হইল। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ব বর্ণানাং দুষ্পরিক্ষেতি মে মতি॥"
(বনপর্ব্ব—১৮০ অঃ)

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতরের সংরক্ষণ এই দুই অনিবার্য্য হেতু বশতঃ মনুষ্যের ভিন্ন জাতির সহিত দাম্পত্য-বন্ধন সংঘটিত হয়। বর্ণসঙ্কর হইবার ইহাই কারণ। আর্য্যগণ এই কারণেই অনার্য্যগণের সহিত যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা জিত জাতিকে সমূলে নিধন করিতে পারেন, সংখ্যায় এত অধিক ছিলেন না। ক্রমে জেতা ও জিত মিলিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছেন। তবে কোন স্থানে যে অমিশ্র আর্য্যজাতি নাই, এমন বলিতে পারা যায় না। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ আর্য্য শরীর রক্ষা করিতেছেন। আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রণ পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল। তথা হইতে এই মিশ্রিত জাতি অনুগাঙ্গ প্রদেশে গমন করিয়া তথাকার আদিমবাসীগণকে আপনাদের সহিত মিলাইয়া সভ্য করতঃ কাহাকে ব্রাহ্মণ, কাহাকেও বা ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। যাহারা তদপেক্ষায় ক্ষমতায় হীন, তাহারা যথাসম্ভব অন্যবিধ নামে অভিহিত হইল। জেতা ও জিতের সহিত একরক্ত হইয়া যাইবার নিদর্শন পৃথিবীর অনেক স্থানে আছে। কতকগুলি আর্য্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এমন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, যথায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তজ্জন্যই বংশ-বৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়। অনার্য্যা পত্নী গ্রহণ ভিন্ন সেই অভিষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনার্য্যের সহিত একরক্ত হইতে হইয়াছে। তাহাতে জেতা ও জিতের সহিত বৈষম্য বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

অসবর্ণ বিবাহ বিশ্বজনীন। ইহা হইতে কোন জাতি রক্ষা পাইতে পারে না। সুতরাং সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি স্বাভাবিক নিয়মের ফল। যে কারণে অসবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, পৌরাণিক যুগে জন-সংখ্যার বৃদ্ধিকালে তাহা তিরোহিত হওয়ায়, শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণা বিবাহ নিষেধ করেন। সঙ্কর জাতি অদ্যাপি উৎপন্ন হইতেছে। বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ "কাহার" জাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা বাভন্ নামে একটী শ্রেণীর উৎপত্তি

করিয়াছে। ছোট নাগপুরে মুণ্ডাদিগের মধ্যে নয়টি মিশ্র জাতি আছে ;—যথা—খাঙ্গার মুণ্ডা, খোবিয়া মুণ্ডা, কনকপথ মুণ্ডা, করঙ্গা মুণ্ডা, মোহিলী-মুণ্ডা, নাগবংশী মুণ্ডা, ওরাঁও মুণ্ডা, সাদমুণ্ডা এবং সবরমুণ্ডা। মুণ্ডা পুরুষ ও প্রথমোক্ত অপর জাতীয়া স্ত্রী সহযোগে এই বিভাগ গুলি জন্মে। বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক হইলেও শাস্ত্রকারগণ যে কল্পনার সাহায্যে যাহারা সঙ্কর নহে, তাহাদেরও উৎপত্তি দোষাশ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ যাহাদের জাতীয় নাম ব্যবসায়বোধক হইয়া রহিয়াছে, তাহা-দের উৎপত্তি সঙ্করতায় সংঘটন বর্ণনা করা কল্পনা ভিন্ন প্রকৃত ঘটনা বলা যাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান এমন হীন, যে পৌরাণিক কল্পনা-প্রসূত জাতিতত্ত্ব পুস্তকের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ সংস্করণ বটতলা হইতে বাহির হইয়া লোকের তত্ত্বানুরাগ-স্পৃহা পূরণ করিতেছে।

বাঙ্গালা দেশ কতকালের, ইহার আদিম অধিবাসী কে ছিল, এই দেশের ভাষার কি প্রকারে উৎপত্তি হইল, বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, হাড়ি, কাওরা, পোদ, ~~কৈবর্ত্ত~~ প্রভৃতি বাস করিতেছে, ইহারা চিরকাল এখানে বাস করিতেছে, না কালে কালে নানা দিগ্দেশ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে ? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এদেশ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস নাই। বরঞ্চ ভারতবর্ষের অপরা-পর স্থানের প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সকল নানা সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পরন্তু বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালির কথা কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিলেও হয়।

যাঁহার দিগন্ত-প্রসারী কীর্ত্তি বা যশঃ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, এদেশে এরূপ কোন ঋষি, মুনি, কবি, দার্শনিক, বীর, যোদ্ধা বা অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অথবা এদেশে এমন কোন পবিত্র তীর্থ নাই, যদ্দর্শন-লালসায় সুদূর দেশ সকল হইতে যাত্রীগণ এখানে আসিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে। সত্য বটে, চৈতন্য, জয়দেব, রঘু-নন্দন, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; পরন্তু ঐ সকল মহাত্মার আবির্ভাব বড় অধিক দিনের নয়। সুতরাং ইহাতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালার কোন দৃশ্য

দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, অতি প্রাচীনকালে এদেশ সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল। পরে গঙ্গা প্রভৃতি স্রোতস্বতী সকলের আবিলতায় কাল-ক্রমে ইহা পরিপূরিত হইয়া মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। এ দেশের ভূমি যেরূপ নিম্ন, দেশমধ্যে জলা ভূমি যেরূপ বিস্তৃত, চক্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামে এ দেশের বহুতর স্থানের যেরূপ প্রসিদ্ধি, এবং অপরাপর নানা কারণে ইহা যে পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল ও অতি প্রাচীনকালের দেশ নয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যখন সকলই জলময় ছিল, জলই যখন আদি সৃষ্টি, তখন ভূভাগ সকল যে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ঋগ্বেদে বাঙ্গালা দেশের উল্লেখ নাই, মন্বাদি স্মৃতিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ নাই, রামায়ণে ইহার নাম শুনা যায় না। প্রাচীন পুরাণের মধ্যে মহাভারতে কেবল অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও উপপুরাণ সমূহে বাঙ্গালার ও তন্মধ্যস্থ নানা প্রদেশের অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রাচীন বলা যায় না। বৈদিককালে বিহারই অনার্য্য-ভূমি ছিল—বিহারীরাই কীকতদেশবাসী ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু বঙ্গের কোন প্রমাণই নাই। মনু আর্য্যাবর্ত্তের সীমা-নিরূপণ-স্থলে পূর্ব্ব সীমাকে সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—পরন্তু বঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বঙ্গদেশ যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী আধুনিক প্রদেশ এবং ইহার আদিম অধিবাসীগণ যে অনার্য্য ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের ভাষা পূর্ব্বে অনার্য্যবহুলই ছিল, পরে আর্য্য দ্বিজ-গণের সমাগমে ঐ ভাষা ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। এদেশ প্রাচীনকালে কেন, বর্ত্তমানকালেও যে অনার্য্যবহুল, গত "সেন্‌সাস" অর্থাৎ লোক-সংখ্যা-গণনায় তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

হরিবংশে আছে, যে যযাতির কনিষ্ঠপুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল। তাঁহারই বংশে কোল-দিগের উৎপত্তি। মনুতে "কোলিসর্প" বলিয়া একজাতির পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। কোলেরাই যে পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বিহারের অনুগাঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে পূর্ব্বে কোলভাষা ভিন্ন অপর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে,

বিশেষতঃ সাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে, সে সকল চেরো ও কোল জাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিম্বদন্তী এইরূপ, ঐ প্রদেশের সাধারণ লোক কোল এবং রাজারা চেরো ছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় কীকত নামে এক অনার্য্য দেশের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, উহার বর্ত্তমান নাম মগধ। কৈকতেরা গোপালন করিত, কিন্তু গাভী-দুগ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলেরা অদ্যাপিও গোদুগ্ধ ব্যবহার করে না। এই কারণে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে মগধরাজ্যে কৈকত বা কোলগণই বাস করিত।

আবার এই অনার্য্যগণের মধ্যে অনেকে অনার্য্যভাষা ও অনার্য্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কালক্রমে আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিত্যা নামে এক জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। তাহারা কখন কখন বিত্যা মাহাত্ম্য নাম ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে এবং হিন্দু মধ্যে গণ্য। কিন্তু এই বিত্যাগণ যে মুণ্ডাজাতীয় কোল, তাহাতে আর সংশয় নাই। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডাদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্যকর্ম্মচারী দেখা যায়। বিত্যা-গণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডারা লৌহ প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিত্যাগণও লৌহ-কার্য্যে সুদক্ষ এবং লৌহ-ব্যবসায়ী। আর মুণ্ডাদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতি-বিভাগ আছে। ইহাদিগের মধ্যেও কিলী দৃষ্ট হয়। মুণ্ডাদিগের কিলীর যে যে নাম, বিত্যাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, যে বিত্যাগণ মুণ্ডাকোল-বংশীয়। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষা ব্যবহার করে ও হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।

দ্বিতীয়। আসামে চুটিয়া নামে একটী জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। লকিমপুর প্রদেশে দিক্রুনদীর উপরে এবং উপর আসামের অন্যত্র চুটীয়া নামে এক জাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা সমালোচনা করিয়া স্থির হইয়াছে, যে চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার অনু-

রূপ। অতএব চুটিয়ারা যে অনার্য্যজাতি, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটিয়া বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটিয়া বলিলেই বুঝাইবে, যে ম্লেচ্ছ চুটিয়া ছিল বা আছে।

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশীয়। তাহাদের অবয়ব মঙ্গোলিয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটী অনার্য্যজাতি। প্রকৃত কোচ্‌ভাষা মেছ্ কাছাড়ি ভাষা সদৃশ। কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচ্‌বিহারের রাজাদিগের আদি পুরুষ হজুর পৌত্র বিস্থ সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচ্‌বিহারের যত ভদ্র লোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন ও অপর কোচেরা মুসলমান হইল।

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে।

সপ্তম। পালামৌতে পহেয়া নামক একজাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদের কতকগুলি আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদেরও অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সর্গুজায় কিলাম নামে এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদের আচার ব্যবহার অধিকাংশই কোলের ন্যায়। তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড়। কিন্তু এদেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলেই হিন্দু। বাঙ্গালার বাহিরে যেমন এই সকল অনার্য্য হিন্দু দেখা যায়, সেইরূপ বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালির মধ্যে অনেক অনার্য্য হিন্দু এখনও দেখাইতে পারা যায়। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়া নামে এক জাতি আছে, তাহারা ভাষায় বাঙ্গালি ও ধর্ম্মে হিন্দু। সুতরাং তাহারা বাঙ্গালি বলিয়াই গণ্য। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষক,য়

খর্ব্বাকৃতি, শূকর পালন করে ও তাহার মাংস খায়। মনু ও মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই দেশ যে অনার্য্যবহুল এবং অনার্য্যগণই যে এ দেশের আদিম নিবাসী, তদ্বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এখানকার অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেকে এক্ষণে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। মুসলমানগণ আদিমবাসীদিগকে আপনাদের মধ্যে একবারে গ্রহণ করেন। হিন্দুগণ একবারে না লইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়াছেন। ছোটনাগপুরে এক্ষণেও সেইরূপ আর্য্যীকরণ চলিতেছে। কোন আদিমবাসী ভূম্যাধিকারী হইলে হিন্দু-সন্নিধানেবাস হেতু হৃদয় অনেকটা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় একজন ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে বরণ করেন। ইহাতে, তাহার স্বজাতীয়গণের সহিত সংশ্রব রহিত হইয়া যায়। তখন সে ব্যক্তি আপনাকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। ক্রমে ব্রাহ্মণগণ তাহাকে চন্দ্র বা সূর্য্য বংশীয় বলিয়া স্বীকার করেন। অনার্য্যগণ এক একটি করিয়া সমস্ত পূর্ব্ব প্রথা পরিত্যাগ করতঃ আর্য্যভাব ও আচার পরিগ্রহ করিয়া নবজীবন লাভ করিলে পর, বোধ হয় তাহারা চিরদিনই এইরূপ ছিল। বিধবা বিবাহ করিতে নাই, বাল্যে বিবাহ দিতে হইবে, পতি-পত্নীর পরিবর্জ্জন দোষাবহ হইয়া উঠে। বিষ্ণু ও শিবকে চিরকালের কুলদেবতা জ্ঞান হয়।

হিন্দুস্থানীদের মধ্যে তরুই পাঁড়ে ও মচিয়া পাঁড়ে নামধেয় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন রাজার অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায় আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাহাকে সম্মুখে পাও, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। তদনুসারে শস্য-ক্ষেত্র-রক্ষাকারী মঞ্চোপরি উপবিষ্ট কৃষককে আনয়ন করিয়াছিল। সে মচিয়া পাঁড়ে নামক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রবর্ত্তক হইয়াছে।

ভিন্নবংশীয় লোক সমধর্ম্মী হইলে ভারতীয় আর্য্য বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলনিবাসী শক জাতি ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বর্ণভেদের উচ্চাবচ সম্মান-অবহেলাকারী সন্ন্যাসীদিগের বৌদ্ধসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া তদনন্তর বর্ণ-গৌরবাক্রান্ত ক্ষত্রিয়শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে পুতিহর, প্রমার, চালুক্য ও চৌহান উপাধিধারী রাজপুতগণ শকবংশাবতংস। কাশ্মীরের বৌদ্ধমতাবলম্বী শকরাজা কণিষ্ক কর্ত্তৃক যে অব্দ প্রচলিত হয়

তাহা আমরা শকাব্দ নামে ব্যবহার করি। চীন ও জাপানে এই অব্দ প্রচলিত আছে।

নেপালে আর্য্যীকরণে গৃহীত যে সকল মগর, ব্রাহ্মণ্য নীতির অনুগত হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যবংশ প্রভৃতি সম্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদিগের দ্বারা বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ থাপা, ঘরটি ও রাণাকুল উৎপন্ন। এই নব ক্ষাত্রয়েরা খস্ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মগর-পত্নীতে উদ্ভূত সন্তানগুলিও উপবীতধারী; অপিচ উক্ত নব ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। এবংবিধ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া তিব্বত ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে খস্কু নামধেয় পৃথক্ উপভাষায় পরিণত হয়।

গুরঙ্গগণ উপবীত প্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে সামাজিক সম্মানে তাহারা ক্ষত্রিয়ের নিম্নে ও বৈশ্যের উপরে স্থান পায়। যে সকল গুরঙ্গ হিন্দুসমাজ হইতে সুদূরে বাস করে, তাহারা অদ্যাপি ম্লেচ্ছভাব রক্ষা করিয়া বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। তথাপি খস্‌দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, উহাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস ক্রমে রূপান্তরিত হইতেছে। সেইরূপ আবার বৃটিশ গুর্খা-সেনা-দলস্থ গুরঙ্গগণকে বিদেশে অবস্থানকালে হিন্দুসমাজে বাস করিতে হয় বলিয়া তাহারা তদনুযায়ী শৌচাচার ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নেওয়ার জাতি ৬৯ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে ১৬টি শাখা বুদ্ধমার্গী, ৩৮টি মধ্যপথাবলম্বী ও ১৫টি শিবমার্গা। মধ্যপথানুসরণ-কারিগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়বিধ পুরোহিতের দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করেন। নেওয়ারি বর্ণমালা স্বতন্ত্র সাহিত্যও আছে। তাহাদের শিল্পাদিতে চীন দেশীয় ভাব বিদ্যমান। (১) তাহাদিগের রাজা হিন্দু, তজ্জন্য নেপালে হিন্দুত্ব সম্মানিত। যদি হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত না হয়, তাহা হইলে তাবৎ গুরঙ্গ ও নেওয়ারেরা হিন্দু

(১) চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না। তাহা একটি ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন। পাঠক আপন অভ্যাস অনুযায়ী এক অক্ষরে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন। উক্ত বর্ণমালায় দুই সহস্রাধিক অক্ষর আছে।

হইবে, সন্দেহ নাই। নেওয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া গুর্খারাজ নেপালকে একচ্ছত্র করিয়াছেন। কিন্তু জেতৃ-জাতি বিজিতদিগকে সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কাজেই নেওয়ারদিগকে বাণিজ্যে নিরত থাকিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় উপাধ্যায়গণ এখন আর তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় (সামরিক জাতি) করিতে পারিবেন না। কাজে কাজেই তাহাদিগকে বৈশ্য হইতে হইবে।

মণিপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিলে, তাঁহারা শারীরিক লক্ষণানুসারে যে মঙ্গোলীয় বংশীয়, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপে 'আহম' মগগণ, রাজত্ব আরম্ভ করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচারে মগ যাজকেরা চট্টগ্রাম হইতে পলায়নপর হইলে তত্রত্য মগ অধিবাসিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়; এবং দুর্গা পূজা করিয়া ছাগবলি ও দেশীয় প্রাচীন দেবতার সমীপে পূর্ব্ব আচারানুসারে কুক্কুটবলিও প্রদান করে। এক্ষণে তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব উপদেষ্টাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধ-মতে দীক্ষিত হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক পরিবারে কালীচরণ ও বরকৃত আলি এই দ্বিবিধ নামই দৃষ্ট হয়। *

বিহার হইতে আর্য্যগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভাবিত। বিহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মত পরবর্ত্তীকালে বহু লোকের দ্বারা গৃহীত হইলে ভারত ইতিহাসে এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়াছিল। মগধের প্রভাব বাঙ্গালায় আর্য্যসভ্যতা বহন করিয়া আনিয়াছে। বৈদিকযুগে জাতিভেদ হয় নাই, বর্ণভেদ ছিল। তাহা কেবল শ্বেত ও কৃষ্ণে আবদ্ধ থাকায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণী ভেদ থাকে। প্রাচীন মহাভারতের যুগে জাতিভেদ হইয়াছে, কিন্তু ভেদ চিরস্থায়ী ছিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যগণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বর্ণভেদকে জাতিভেদে পরিণত করিলেন। জীবিকানুসারে বা গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রথমে এই চারিটী জাতি হয়। তাহাই চতুর্ব্বর্ণ নামে খ্যাত। অনার্য্যগণকে নিষাদ বলা হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য পৃথক্ জাতি তখন হইত না। এক বর্ণের ক্ষমতা-বিপর্য্যয় হইলে সে ব্যক্তি অন্য বর্ণে প্রবেশ লাভ করিত। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা

শূদ্রধর্ম্মী ও অনার্য্যগণ শূদ্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। দার্শনিক যুগে জাতিভেদ স্থায়ী বা বংশগত হইল। নানা ব্যবসায় উৎপন্ন হইয়া পুরুষানুক্রমে জনসাধারণকে অনুগত করিয়া পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করতঃ মর্য্যাদার অতিরিক্ত তারতম্য ঘটাইল। জীবিকানুযায়ী বহু নামধারী জাতি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে জাতিভেদ বংশগত হওয়ায় সঙ্কর হইলে পৃথক্ নামধেয় শ্রেণী হওয়া আবশ্যক হইল, তাহাতে আবার নূতন জাতির উদ্ভব হইতে লাগিল। এমন সময় বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিভেদের কঠোরতা ছেদন করিয়া সাম্য স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণের শঙ্কার স্থল হইলেন। জনসাধারণকে জ্ঞানী করিবার জন্য তিনি আপনার উক্তি পালি হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিতে শিষ্যগণকে নিষেধ করিয়া যান। তৎপ্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করিয়া শিষ্যগণ বৌদ্ধযুগকে ভারতের গৌরবের সময় করিয়া তুলেন। বুদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, সামাজিক জাতিভেদ তাঁহার নিকট অনাস্থার সামগ্রী বলিয়া, গৃহী বৌদ্ধগণ জাতিভেদের বিশেষ পক্ষপাতী হয়েন নাই। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ না করায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকট পতিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধদলকে পুষ্ট হইতে দেখিয়া বেদাচারীগণকে কৌশল-পরায়ণ হইতে হইল। পৌরাণিকযুগে জাতিভেদের শৈথিল্য দূর করিয়া অতি দৃঢ় করা হইল। পাণিগ্রহণ ও অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিয়া এক জাতির মধ্যে উপজাতিসকলের সৃজন আরম্ভ হইল। ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইয়া আবার অতিরিক্ত জাতি গঠিত হইতে লাগিল। মঙ্গোলীয় অনার্য্যগণ এই সময় বেদাচারে রত হইয়া নূতন জাতির উদ্ভাবন করে।

বর্ত্তমান সময় পৌরাণিককালের অন্তর্গত হইলেও মুসলমান আধিপত্য হইতে বৈদেশিকদিগের সংশ্রব হওয়ায়, এক্ষণে পৌরাণিক যুগকে বৈদেশিক আধিপত্যের যুগ নামে নির্দ্দেশ করা উচিত। ৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাজপুতদিগের অভ্যুদয়কালে বর্ত্তমান আকারের হিন্দু-ধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছে। আদিমজাতিভেদের মূলসূত্র জীবিকা। জীবিকার উপায় বিবিধ হওয়ায় বিস্তর জাতি হইয়াছে। আদি চারিবর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করা পৌরাণিকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। ফলতঃ জাতিভেদের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি-অনুসারে বহুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। সেগুলিকে

চারিটীর মধ্যে লইয়া গিয়া বিষম গোলযোগ ঘটান হইল। * পরিবর্ত্তন যতই কেন হউক না, পূর্ব্বভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। জাতি-ভেদ এ দেশের ধাতুতে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভেদ বংশগত আছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গুণকর্ম্মানুসারে নিম্নবর্ণকে উচ্চবর্ণে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না, এমন নহে। ভারতবর্ষ বৈদেশিক আধিপত্যে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পৌরাণিক জাতিভেদের প্রকৃত আকার স্বাধীন নেপালে প্রকৃষ্ট-রূপে বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট হইতে পারে। ভূপঞ্জরে খনিত যুগান্তরের জীবাস্থি যেমন ইদানীং লুপ্ত জীবের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, পর্ব্বত—প্রাকার-বেষ্টিত হইয়া পৌরাণিক জাতিভেদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ "Fossil"এর আকারে প্রত্ন-তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু গণের জন্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মনু-নির্দ্দিষ্ট বিবাহ-সূত্রে নেপালীরা জাতিভেদ রক্ষা করিতেছে। তাহারা মঙ্গোলীয় অনার্য্য হইলেও আর্য্যত্বের গৌরবস্বরূপ হইয়াছে। ১১০০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানগণ ভারত স্পর্শ করেন নাই, তৎকালে বেদাচারীগণ নেপালে প্রবেশ করিয়া আর্য্যীকরণ আরম্ভ করেন।

অধুনা নেপালে ব্রাহ্মণ সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়া; ক্ষত্রিয় সবর্ণা ও বৈশ্যা; বৈশ্য সবর্ণা ও শূদ্রা; এবং শূদ্র কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। অসবর্ণ বিবাহে কন্যার পঞ্চামৃত পান বিভিন্ন পাত্রে সম্পাদিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্য ব্যতিক্রম নাই। অন্নগ্রহণসম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায়, অসবর্ণ-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অসবর্ণা স্ত্রীর অন্নগ্রহণ করেন না; বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে অসবর্ণার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। শূদ্রের অসবর্ণা স্ত্রী অর্থে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ভিন্ন জাতীয়া বুঝিতে হইবে। অস-বর্ণার গর্ভজাত সন্তান পৈতৃকধনের চতুর্থাংশ, স্থানবিশেষে সম-অধিকারী হয়। কেবল ব্রহ্মস্ব বণ্টন করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যখন স্ত্রীর অন্ন-গ্রহণ করা হইবে না, অনর্থক বিবাহ করা কেন? এই ভাবিয়া নেপালীরা প্রায়শঃ ভোগিনী রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার সন্তান পূর্ব্ববৎ বিবাহিতা অসবর্ণা গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় দায়ভাগে অধিকারী। এই সকল সন্তান পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া অশৌচ গ্রহণান্তে শ্রাদ্ধকালে অন্নের পরিবর্ত্তে যবের পিণ্ড দিবে। ব্রাহ্মণ-বিধবার গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান একটী পৃথক্ শ্রেণীতে

আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে যোশী কহে; শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নাম উপাধ্যায়। ক্ষত্রিয় দুই প্রকার;—রাজবংশ ও সাধারণ। রাজবংশীয়েরা ঠকুরী ও সাধারণ ক্ষত্রিয়েরা খস্ নামে প্রসিদ্ধ। নেওয়ার জাতি এ দেশের বৈশ্য; উপনয়ন তাহাদের পক্ষে ইচ্ছাধীন। উপনীত হইলে মহিষ ও কুক্কুট মাংস এবং মদ্য-পান বর্জ্জন করিতে হয়। কামী নামক জাতি বৈশ্য হইলেও কোন অপরাধে রাজা কর্ত্তৃক অন্ত্যজ শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। শূদ্রের মধ্যে জল আচরণীয় ও যাজ্য এবং তাহার অন্যথায় দুইটী শ্রেণী আছে; গুরঙ্গ, মগর, সোণার, পহারি, হায়ু ও কমারা বা দাসজাতি যাজ্য ও আচরণীয় শূদ্র। কামি, সার্কি, দময়ী, বাদী ও গাঁয়ী অনাচরণীয় ও অযাজ্য বা অন্ত্যজশূদ্র। আর এক শ্রেণীর লোককে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত শূদ্র বলা যাইতে পারে। আর্য্যীকরণ আকাঙ্ক্ষায় এই শ্রেণীকে চতুর্থবর্ণের মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। লিম্বু ভোটিয়া, থামী ও জমিদার বা কিরাত্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা গো-খাদক, কিন্তু জল-আচরণীয় ও যাজ্য। প্রায়শঃ স্বজাতীয়ের দ্বারা ইহারা দৈব ও পৈতৃক কার্য্য করাইয়া থাকে। কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত আহ্বান করে। ব্রাহ্মণ জল-আচরণীয় জাতির কন্যায় আসক্ত হইয়া বা ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সেই উভয় প্রকারের সন্তান ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। অনাচরণীয় জাতিতে ব্রাহ্মণ সন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইবে; ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয় আচরণীয় জাতিতে অবৈধসন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান স্বজাতীয় মধ্যে গৃহীত হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে; এবং অনাচরণীয় জাতির স্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের সন্তান জন্মিলে মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বর্ত্তে। গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের মগর জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান গুরঙ্গ জাতি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের কামি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কামি জাতীয় হইবে, গুরঙ্গ হইতে পারিবে না। এতাবৎ দেখা যাইতেছে কোন নূতন নামধেয় সঙ্করজাতি নেপালে উৎপন্ন হয় না। যে সন্তান মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়, সে পিতৃধনের বা শ্রাদ্ধের অধি-কারী হইতে পারে না।

*খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার পাঁচশত হইতে আটশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আর্য্যনিবাস আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা এখানে আসিয়া (যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে) জাতিভেদের নূতনভাবে বিকাশ আরম্ভ করিলেন। বঙ্গে সৎশূদ্র ও নবশাখ নামে দুইটী ভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের জাতিভেদের সম্মানের উপর তন্ত্র শাস্ত্রকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে দৃষ্ট হয়। তাহাতে তন্ত্রকে বাঙ্গালায় উৎপন্ন বলিয়া অনেকে জ্ঞান করেন। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মূল বেদের ন্যায় প্রাচীন। আর্য্যগণ পূর্ব্ববাসস্থান হইতে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে সমভিব্যাহারে আনয়নপূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে অনার্য্য দ্রাবিড়গণের অসভ্য লিঙ্গপূজা দেখিয়া থাকিবেন। আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইলে বৈদিক রুদ্র ও অবৈদিক লিঙ্গ একীভূত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। আলেক্‌জাণ্ডারের সহচরগণ ২০০ দুই শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে লিঙ্গপূজা দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। এখন কাশ্মীর হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত শিব-শক্তির আরাধনাকারী তান্ত্রিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭০০ সাত শত খৃষ্টাব্দে রচিত মালতীমাধবে অঘোরঘণ্টিক কাপালিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬০০ ছয় শত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ মত তন্ত্রের দ্বারা জর্জ্জরিত অবস্থা হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করে। দশ শত খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়েরা তন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন। ভারতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমত একত্রিত হওয়ায়, বেদাচারীগণের নিকট বৌদ্ধগণকে ঘৃণার্হ করিয়া তুলে। তান্ত্রিক বামাচার পৈশাচিক অনার্য্যভাব অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। বামাচার সংস্কৃত হইয়া দক্ষিণাচারে পরিণত হইয়া আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী শূদ্র তন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকৃত। নেপাল, তিব্বত ও চীনে যে বৌদ্ধমত প্রচলিত, তাহার নাম মহাযান। সিংহল, ব্রহ্ম, ও জাপানের বৌদ্ধমত আত্মা ও ঈশ্বর বর্জ্জিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতে তাহাকে যেমন হীনযান বলিয়া থাকে, তদ্রূপ বামাচারীগণ আপনাদিগকে বীর ও দক্ষিণাচারীকে পশু বলিয়া পরিচিত করিতে ত্রুটি করেন না। বীরাচার কখন কাহাকেও নিষ্ঠাবান করিতে পারে না; অতএব পশ্বাচারীরাই ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত বাঙ্গালী সমাজকে সদাচারী হইতে শিক্ষা দিয়াছে।

বৈদিককালে সাধারণ আর্য্যগণ বিশ বা বৈশ্য নামে খ্যাত ছিলেন। বৈদে-

শিক আধিপত্যের বর্ত্তমান কালে তদ্রূপ জনসাধারণ শূদ্র নামে বিখ্যাত। অনেকে মনে করেন, শূদ্র বলিতে কেবল কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় অনার্য্যকে বুঝায়, কিন্তু কেবল তাহারাই শূদ্র নহে। শূদ্র অনেক প্রকার। এখন বৈদিক কালের ন্যায় কেবল ভাষা ও বর্ণগত প্রভেদ নাই, স্থানীয় সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত সমাজগত, ও বংশগত নানা ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। শূদ্রতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সাত প্রকার শূদ্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১ম—আদি বিভাগানুযায়ী গুণকর্ম্মশালী অর্থাৎ উপযুক্ত স্বভাব ও ক্রিয়ান্বিত পূর্ব্বতন শূদ্র; যথা—কাহার। ২য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়;—যথা—চণ্ডাল। ৩য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত নেপালী ও আসামী প্রভৃতি গৌরকায় মঙ্গোলীয়, যথা—গুরঙ্গ প্রভৃতি। (৪র্থ—পাতিত্ব হেতুক বা ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; যথা—কায়স্থ প্রভৃতি। ৫ম—পিতৃত্যক্ত ও জারজ; যথা—রামজনী। ৬ষ্ঠ—দূষিত বৃত্তিজীবী বা অন্ত্যজ; যথা—চর্ম্মকার। ৭ম—যাহাকে অন্যবর্ণে স্থান দিতে পারা যায় না, এমন অতিরিক্ত জাতি; যথা—ভুটিয়া। শারীরিক লক্ষণানুসারে বঙ্গদেশীয় শূদ্র নামে খ্যাত উচ্চ শ্রেণীর জাতিগুলি দ্রাবিড় অপেক্ষা আর্য্যের সহিত অধিক ঘনিষ্ট। বেদে অনধিকারী হইয়া ইহারা দ্বিজজাতির সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছিল। তন্ত্র ইহাদিগকে উচ্চাসন দিয়াছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকেই তন্ত্র এক দেবতা, এক মন্ত্র ও এক গুরুর শিষ্য করিয়া দিল। বৈদিক সাবিত্রী প্রাপ্ত না হইলেও শূদ্রেরা তান্ত্রিক গায়ত্রী প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের পক্ষেও তান্ত্রিক গায়ত্রী না হইলে চলে না। শূদ্রের ক্রিয়া, কলাপ, আচার, ব্যবহার ব্রাহ্মণের পদ্ধতি অনুসরণ করিল। উত্তর ভারতের শূদ্র ও পূর্ব্ব ভারতের শূদ্র এখন আর এক নহে। আচার গুণে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর আপনাদিগকে বেদে অনধিকারী জ্ঞান করিতে পারে না। উচ্চকণ্ঠে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে কহিতেছে;—"অস্মাকম্ বৈদিকং স্মার্ত্তং তথাগমিক মে বচ।" তান্ত্রিকগণ বেদ অপেক্ষা আগম নিগম ও যামলকে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন না। বঙ্গদেশীয় শূদ্রের মধ্যে শূদ্র অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক আছে, সৎশূদ্র বলিয়া একটি শ্রেণী থাকায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সৎশূদ্রের মধ্যে কি কারণে পতিত হইয়াছেন, কল্পনা ভিন্ন তাহার হেতু নির্ণয়

করিবার অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, আর্য্য সমাজে অনার্য্য-জাতি অধিকপরিমাণে প্রবেশ লাভ করায়, এক্ষণে শূদ্রের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যখন বৈশ্যের ভাগ অধিক হওয়া উচিত ছিল, একেবারে তাহার লোপ সম্ভবপর নহে। অতএব বৈশ্য জাতি যে শূদ্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে অনুগত করিয়াছে, তাহার উৎপত্তি-স্থান পূর্ব্বভারতে। সেই ধর্ম্ম ঐ স্থানে যে অত্যন্ত প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না কি? এক্ষণে বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বণিকের নাম দৃষ্ট হয়। বণিকশ্রেষ্ঠ জৈনেরাও বৌদ্ধ হইতে পৌরাণিক আচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যেরা বৌদ্ধমত গ্রহণ করায় ক্রিয়ালোপ ঘটিয়াছিল। সেই পাতিত্ব-নিবন্ধন আর পূর্ব্ব বর্ণে উন্নীত হইতে পারে নাই—এমন অনুমান করিবার হেতু আছে।

সৎশূদ্রের মধ্যে নবশাখ আর একটি অবান্তর ভেদ। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দভট্ট বল্লালচরিত গ্রন্থে বল্লাল সেনের সময়ের প্রচলিত জাতি-কথায় লিখিয়াছেন;—

"গোপমালী চ তাম্বুলি কাংসারি তন্ত্রি শাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রানাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥"

লোকাচার অদ্যাপি প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণ কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নাপিত ও কায়স্থ ভিন্ন উপরোক্ত জাতি গুলি বৈশ্য বর্ণের বিভিন্ন শাখা। গোপ, মালী, তাম্বূলী, কাঁসারি, তন্তুবায়, শঙ্খকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তৈলি, গন্ধবণিক ও বৈদ্যজাতির মধ্যে বৈদ্যগণ যে বৈশ্য, তাহা নিজ ক্ষমতায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে সাধারণে স্বীকারও করিয়া থাকেন। সৎগোপেরা কহেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপ, সুতরাং বৈশ্য ছিলেন, অতএব সৎগোপগণ বৈশ্য। তন্তুবায়-ভ্রাতৃগণ কহেন, মনুতে লিখিত আছে, বস্ত্রবয়ন বৈশ্যের ধর্ম্ম, অতএব তাঁহারা

বৈশ্য। গন্ধবণিকগণ কহেন, তাহাদের নামের সহিত যখন বণিক শব্দ বিদ্যমান, তখন তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য। এই প্রকার যুক্তিবলে বৈশ্যত্ব প্রমাণিত করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। পূর্ব্বে হইতে বলা হইতেছে, মূল একেবারে ধ্বংস হয় না। যে মূল অবলম্বনে বর্ণভেদ স্থাপন করা হইয়াছিল, নানা পরিবর্ত্তন রূপ আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়াও অদ্যাপি তাহা সজীব আছে। কে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন, তাঁহার সামাজিক সম্মান ও আচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্থিরীকৃত হইবে। গুণ কর্ম্ম অর্থে স্বভাব ও ক্রিয়া বলা হইয়াছে। আচার ও জীবিকা ক্রিয়ার অন্তর্গত। আচার ও জীবিকা দেখিয়া হিন্দুসমাজে জাতি—বিশেষের সম্মানের তারতম্য হয়। যে জাতিগুলি সাধারণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশ্য বৃত্তিধারী, তাহারাই বৈশ্য। তাহাদের বৈশ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের গুণকর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধভাবে সেই জাতিগুলিকে বৈশ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। বর্ণ বংশগত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই; এবং সেই ভাবটি সমাজের অতীব কল্যাণকর ও বৈজ্ঞানিক। অতএব বঙ্গে গুণকর্ম্মানুসারে বৈশ্য নির্ণয় করা উচিত। বৈশ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ নবশাখের মধ্যে অনেকের বিদ্যমান নাই। যে গুলির অভাব আছে, পূরণ করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-পত্রে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন স্বাক্ষর করিতে সম্মত ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইহা অশাস্ত্রীয় নহে, স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন, কিন্তু কেবল স্বাক্ষর করাইয়া কোন লাভ নাই। যে জাতি বৈশ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সমগ্রজাতি একমত হউন—নতুবা কতিপয় ব্যক্তি অগ্রসর হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

সঙ্কলিত ব্যবস্থা।

পরমপূজনীয় শাস্ত্রাধ্যাপক
মহাশয়গণ সমীপেষু।

প্রশ্ন :—

সৎশূদ্রগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বৈশ্যত্ব-লাভ ও বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ-গ্রহণ এবং অন্যান্য কর্ম্ম করিতে পারেন কি না? ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এই বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করুন।

অস্যোত্তরং—

বৈশ্যত্বব্যাপ্যং বৈশ্য-গুণ-কর্ম্ম, অতোবৈশ্য-গুণ-কর্ম্ম-ভ্যাং ইদানীমপি বঙ্গদেশীয়াঃ প্রায়ঃ সৎশূদ্রাঃ বৈশ্যত্বং প্রাপ্তুমর্হন্তি। যথাশাস্ত্রমাচরদ্ভি-দ্বিজ-শুশ্রূষাকারিভিঃ শূদ্রৈর্গুণকর্ম্মানুসারেণ বৈশ্যসমান ধর্ম্মতয়া জননমরণাদৌ মন্বাদিশাস্ত্রতো বৈশ্যবৎ পঞ্চদশদিনাশৌচং গ্রহণীয়ং, এবমন্যানি চ কর্ম্মাণি তদ্বদনুষ্ঠেয়ানীতি সতাং মতং।

গুণ-কর্ম্মানুসারেণ বৈশ্যত্বং ইত্যস্য প্রমাণং শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্-বাক্যং—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

কেবলকর্ম্মণাপি শ্রেষ্ঠত্বাপকৃষ্টত্বং গতাঃ

অত্র প্রমাণং মহাভারতে—

"কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ।"

অত্রাপি-গুণ-কর্ম্মভ্যাং উচ্চৈস্ত্বং নীচৈস্ত্বং প্রাপ্তা-শ্চত্বারোবর্ণাঃ। যথা মনু-সংহিতায়া দশমাধ্যায়ে ভগবান্ মনুরাহ—

"শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।

ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥" ইত্যাদি

ইদানীং সৎশূদ্রাণাং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ো মনুসংহিতায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে তেনৈবোক্তঃ—

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।

বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টস্ত ভোজনং॥"

স্মার্ত্তমহামহোপাধ্যায়-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যৈরেতদ্বচন-স্থিত'চ'কারেণ (অর্থাৎ বৈশ্যবৎ শৌচ-কল্পশ্চেতি চকারেণ) যথা-শাস্ত্র-ব্যবহারিণাং দ্বিজ-শুশ্রূকানাং শূদ্রাণাং বৈশ্যসাকল্য ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।

যথা শুদ্ধি-তত্ত্বে—

"চকারাদ্বৈশ্য-ধর্ম্মাতি-দেশেন।"

যথা উদ্বাহতত্ত্বে চ—

"চকার সমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ॥"

ইদানীং বিশাং ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।

মনুসংহিতায়াঃ প্রথমাধ্যায়ে যথা—

"পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেব।

বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥"

ইজ্যা যজনমিত্যর্থঃ।

অত্রাধ্যয়নশব্দেন পুরাণতন্ত্রপঠনার্থোপি গৃহ্যতে।

ততশ্চ ইদানীমপি বঙ্গ-দেশীয়ানাং প্রায়ঃ সৎশূদ্রাণাং এষঃ মনুসংহিতায়াঃ প্রথমোধ্যায়োক্ত ধর্ম্মোদৃশ্যতে। যথাবিধি আচরণশীলানাং ব্রাহ্মণাদিশুশ্রূষকাণাং শূদ্রাণাং স্বজাতিত উত্তমবর্ণত্বং প্রাপ্নোতি। অত্র প্রমাণং মানবে নবমাধ্যায়ে—

"শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্ম্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়োনিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥"

শুচিরিতি। বাহ্যাভ্যন্তরশৌচোপেতঃ স্বজাত্যপেক্ষয়া উৎকৃষ্টদ্বিজাতি-পরিচরণশীলোঽপরুষভাষী নিরহঙ্কারঃ, প্রাধান্যেন ব্রাহ্মণাশ্রয়ঃ তদভাবে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্রয়োঽপিস্বজাতিত উৎকৃষ্টাং জাতিং প্রাপ্নোতি ইতি কুল্লূকভট্টেন ব্যাখ্যাতং।

যৎ তু শুদ্ধি তত্ত্বেঽভিহিতং—
দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং
স্বগোত্রধর্ম্মং ন হি সন্ত্যজেচ্চ।"

তৎসঙ্গত্যনুসারেণ সামঞ্জস্যং বিধাতব্যং।
বক্ষ্যমাণ-মৎস্যপুরাণীয় শাতাতপবচনাৎ যথা—
"দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্য-প্রয়োজনং।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বাশৌচং প্রকল্পয়েৎ॥"
যৎ তু শুদ্ধিতত্ত্বে—
"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
এবঞ্চক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা।"

তৎকলের্নিন্দাপরং। ন তু শুচিরিত্যাদি মনুবচন-স্থস্য এতাদৃশগুণযুক্তস্য সৎশূদ্রস্য বৈশ্যত্বাভাবপরং।

তিথিতত্ত্বে—

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তিসর্ব্বে কলৌ যুগে।

ইতি মৎস্যপুরাণীয়বচনং যদ্বৎকলের্নিন্দাবোধকং তদ্বৎ শনকৈস্তিতি অনুমেয়ং ধর্ম্মদর্শিভিঃ।

যৎ তু মিতাক্ষরায়াং—

"অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু।"

তৎ শুচিরিত্যাদিবচনস্থস্য উৎকৃষ্টাং জাতি-মশ্নুতে ইতি ন্যায়বর্ত্তিশূদ্রাণাং লোকাচার-বিরুদ্ধমপি।

"তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ।"

ইতি প্রয়োগপারিজাতধৃতস্মৃতি বচনাৎ স্মৃতি-বাক্য-লৌকিক-বাক্যয়োর্ব্বিরোধে স্মৃতিবাক্যং গ্রাহ্যং। এবমন্যেষাং বিরুদ্ধবচনানাং সামঞ্জস্যার্থং ব্যাখ্যাতব্যং বুধৈঃ।

[অনুবাদ।—বৈশ্য-গুণ ও কর্ম্ম বৈশ্যত্বকে আশ্রয় করে। অতএব বৈশ্যের গুণাশ্রয় ও কর্ম্মানুষ্ঠান করাতে ইদানীন্তন কালেও বঙ্গদেশীয় প্রায় সমস্ত সৎ শূদ্রই বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন। যথাশাস্ত্র আচরণ করত দ্বিজ-শুশ্রূষাকারী শূদ্রগণ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বৈশ্যতুল্য ধর্ম্মহেতু জনন ও মরণাদি স্থলে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ এবং বৈশ্যের ন্যায় কর্ম্ম সকল করিতে পারেন, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তিই প্রমাণ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, আমি গুণ ও কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ

(অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির) সৃষ্টি করিয়াছি। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়েও কথিত হইয়াছে যে,—কেবল কর্ম্ম দ্বারাও বর্ণত্ব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব) লাভ হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্ব লাভ করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়েও আছে। মনু বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণগণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় সমস্ত শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে; শূদ্রও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে এবং বৈশ্য সমূহ শূদ্র-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; শূদ্রগণও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

শুদ্ধিতত্ত্বে ও উদ্বাহতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন ;—মনুসংহিতার ৫ অধ্যায়ে সৎশূদ্রের কর্ত্তব্যনির্ণয়প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের সেবাপরায়ণ শূদ্রসমূহ প্রতি মাসিক কেশাদি মুণ্ডন করিবে এবং জননাশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন করিবে ও ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে। এই বচনস্থিত "চ-কার" দ্বারা যথাশাস্ত্রব্যবহারী ও দ্বিজ-শুশ্রূষক শূদ্র সম্বন্ধে বৈশ্যের সমস্ত ধর্ম্মই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক্ষণে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বৈশ্যদিগের যে ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। পশুদিগের প্রতিপালন, দান, যজন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি পাঠ, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত সুদ গ্রহণ ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আধুনিক বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সৎ শূদ্রেই উক্ত ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে।

যথাশাস্ত্র-ব্যবহারকারী ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষক শূদ্র স্বীয় জাতি হইতে উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়েরও প্রমাণ মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে দৃষ্ট হইতেছে। কুল্লূক ভট্ট সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে শুচি ও স্বজাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির শুশ্রূষক, এবং অহঙ্কারশূন্য ও মিষ্টভাষী, প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বশতঃ ব্রাহ্মণাশ্রিত, তদভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আশ্রিত যে শূদ্র, সে উক্ত গুণাদি দ্বারা স্ব স্ব জাতি হইতে উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হয়।

ইদানীং বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা সংস্থাপন করিতেছি। শুদ্ধি-

তত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, দেশাচার ও কৌলিক ধর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে প্রথমতঃ কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র কখনও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেশাচার এবং কৌলিক ধর্ম্ম এই দুইয়ের সঙ্গতি অর্থাৎ উপপত্তি অনুসারে উক্ত বচনের মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ মৎস্য পুরাণে শাতাতপ বলিয়াছেন, দেশাচার, কাল, আত্মা, বস্তু, দ্রব্যের প্রয়োজন, উপপত্তি (সঙ্গতি) এবং শারীরিক অবস্থা জানিয়া শৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং সৎশূদ্রও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, ক্রিয়ার লোপ হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করিলেন। তবে কিরূপে শূদ্রগণ এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ করিবেন? কিন্তু এই বচনটিকে কলির নিন্দামূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাহ্য এবং অভ্যন্তর শুচি, স্বজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির শুশ্রূষক, মৃদু ভাষা এবং নিরহংকার শূদ্র প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি ক্রমে শ্রেষ্ঠ-জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাও কলিতে সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব লাভের নিষেধক নহে। যেমন তিথিতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় আচারভ্রষ্ট হইয়াছে—এই কথাটিতে কলির স্বধর্ম্ম বুঝাইয়াছে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এই বচনেও কেবল কলির নিন্দা বুঝিতে হইবে।

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, যাহাতে পুণ্য নাই ও যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা ধর্ম্মানুগত হইলেও অনুষ্ঠেয় নহে। তাই কেহ কেহ বলেন, ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র কখনও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা লোকাচারবিরুদ্ধ হইলেও মদনপারিজাত-ধৃত স্মৃতি-বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, লৌকিক বাক্য এবং স্মৃতিবাক্য এতদুভয়ে বিরোধ ঘটিলে স্মৃতিবাক্যই প্রামাণ্য অর্থাৎ স্মৃতিবাক্য অনুসারে কার্য্য করিবে। সুতরাং সৎশূদ্রের বৈশ্যত্বের বাধা নাই এবং অন্যান্য বিরুদ্ধবচনগুলিরও পণ্ডিতগণ এইরূপ সঙ্গতি-অনুসারে সামঞ্জস্য করিবেন।]

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বঙ্গের সৎশূদ্রেরা বৈশ্য। কিন্তু সংকলিত ব্যবস্থায় বৈশ্যত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আছে; যাহারা বৈশ্য, তাহাদের আবার বৈশ্যত্ব গ্রহণ কেন? এমন প্রশ্ন হইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই, যাহারা শূদ্র নামে পরিচিত, তাহাদিগকে সকলে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না, সুতরাং বৈশ্যোচিত ক্রিয়া-কলাপ করিতে গেলে বাধা পাইবেন। এজন্য চলিত মতের অনুসরণ করিয়া সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব আনয়ন করিতে পারিলে প্রতিবন্ধক দূর হইবে বিবেচিত হওয়ায় ব্যবস্থা-পত্র উপরোক্তভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। অনেকে কহিবেন, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈশ্যধর্ম্মী নাই কি? তাহারা কি বৈশ্য হইবে? এস্থলে আমাদের সে কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। কোন প্রকার অধিকার থাকিলে তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা অন্যায়। স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং, ইহাই সকলে প্রার্থনা করে। সৎশূদ্রের আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইবার মত দেশাচারবিরুদ্ধ, ইহা সত্য; কিন্তু আচার আপনা হইতে হয় না। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা দাঁড়াইয়া যায়। মালাকার, তন্তুবায় প্রভৃতি এক একটি জাতির সমগ্র লোককে আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইতে হইবে। নতুবা ভোজ্যান্নতা এবং বিবাহ ক্রিয়া রক্ষা হইতে পারে না। উক্ত জাতিগুলির মধ্যে তাবৎ লোকের বৈশ্যবৎ গুণ কর্ম্ম থাকা অসম্ভাবিত; ইহার উত্তর এই, অধিকাংশ ব্যক্তির গুণকর্ম্মের সাম্য থাকিলেই একটি শ্রেণী গঠিত হইতে পারে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের বৈশ্যবৎ গুণ কর্ম্ম না থাকিলেও তিনি সেই সমাজে থাকিতে পারেন। কিন্তু আগরওয়ালা প্রভৃতি যেমন বৈশ্য হইলেও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর পরিচায়ক নাম হইয়াছে, বাঙ্গালী বৈশ্যের তদ্রূপ সৎগোপ বৈশ্য, তাম্বূলী বৈশ্য প্রভৃতি বৈশ্যত্বের ভেদ অবশ্যম্ভাবী। রক্ষণশীলগণ কহিবেন, বর্ণাশ্রমবিভাগ পৃথিবীতে ব্রতধারণমাত্র, তাহার উদ্দেশ্য ঐহিক নহে, পারলৌকিক কল্যাণ সাধন; সুতরাং যে যেমন আছে, তাহার সেই অবস্থায় থাকিয়া আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, অতি সহজ কথায় বলিতে গেলে দেখাইতে পারি আমাদের পরলোক ইহলোকের আদর্শে গঠিত। ইহলোকে অগ্রসর হইতে পারিলে—পরলোকে আরও অগ্রসর হইতে পারিব, জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। যতটা অগ্রসর হইয়া থাকা যায়, ততই শ্রেয়স্কর।

ধর্ম্ম, ভাষা, রাজ্য, জাতি বা বাণিজ্যের জীবনী-শক্তি না থাকিলে তাহা-দিগের বিলোপ ঘটে। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যেমন উহাকে সতেজ রাখিতে হয়, সেইরূপ উপরি উক্ত বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা না করিলে তাহার জীবন্ত-ভাব রক্ষা পায় না। ধর্ম্ম ও জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে কিম্বা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি করা উচিত। জাতি-ভেদ, হিন্দুত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। অতএব তাহা রক্ষা করা ও তাবৎ জাতিকে উন্নত করিতে সযত্ন হওয়া বিধেয়। আমাদের বিভিন্ন জাতির একপ্রাণতা, ধন ও অধিকার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন, পৃথিবীর অন্যত্রও প্রকারান্তরে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ ও স্পর্শদোষ না থাকিলেও, অভিজাতবর্গ সাধারণ লোকের সহিত আহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। তবে তাঁহাদিগের সমাজে গুণ ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে নীচও মহৎ হইতে পারেন। তখন তিনি আর অনাচরণীয় থাকেন না। ইহা তথাকার সামাজিক জীবনী-শক্তির নিদর্শন। অধুনা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণেতর জাতির অনেকে উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে সযত্ন হইয়াছেন। বস্তুতঃ আত্ম-সম্মান-বোধ না থাকিলে, মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, মহৎ হইতে পারাও যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে বৈদ্য ও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, মধ্যম শূদ্রের অন্তর্গত সুবর্ণ-বণিকেরা বৈশ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীস্থ চণ্ডালজাতি শূদ্রত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা তাঁহাদের সামাজিক জীবন্ত-ভাবের পরিচায়ক।

আপন উন্নতির জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইতে হয়। স্বজাতির অধিকার-বৃদ্ধি অপর শ্রেণীর দ্বারা হইতে পারে না। নবীন-জাতি-ভুক্ত ব্যক্তিগণ আপনা-দিগকে যে প্রাচীন জাতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী উপপদ ও শৌচাচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ, বিবাহাদির সঙ্কল্পে দাস-মিত্র স্থলে বর্ম্মমিত্র বাক্য পাঠ করুন। তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকের পক্ষে দাসীর পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি ব্যবহার কর্ত্তব্য। অশৌচাদি আচারে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উপনয়নসংস্কার

যাহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপক্ষেও রীতিমত চেষ্টা করা বিধেয়।

বাঙ্গালার সৎশূদ্রের অন্তর্গত জাতিগুলি এমন সদাচারনিরত যে, ভারতের অন্যান্য স্থলের শূদ্রের তুলনায় তাঁহাদিগকে দ্বিজাতি বলিলেও দোষ হয় না। বঙ্গীয় বৈদ্য, কায়স্থ ও নাপিত ভিন্ন অপর সকলে বৈশ্যবৃত্তিধারী। কাংস্য-বণিক, গন্ধ-বণিক ও স্বর্ণকারগণ পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ও যজ্ঞোপবীতধারী। অতএব বাঙ্গালার সৎশূদ্রগণ, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও ক্রিয়াবান্ হইয়া শূদ্রনাম পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হউন। গন্ধবণিক, কাংস্যকার, শঙ্খ-কার, কর্ম্মকার, তৈলী, তন্তুবায়, তাম্বুলী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, মালী ও সৎগোপ প্রভৃতি জাতি দাস উপাধির পরিবর্ত্তে বৈশ্যোচিত 'ভূতি' উপাধি ব্যবহার করুন।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"

(কল্লুকভট্ট-ধৃত যম-বচন)

মাড়ওয়ার-নিবাসী বণিকদিগকে ভূতি উপপদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রাজস্থান ও গুর্জ্জর নিবাসী বৈশ্যগণের মধ্যে উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়। কেহ বা গৃহস্থ হইয়া প্রৌঢ় বয়সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন। অপরে উহা গ্রহণ-বিষয়ে আদৌ মনোযোগী নহেন। সুতরাং যজ্ঞোপ-বীতের অভাবে বৈশ্যত্বের হানি হয় না।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে। ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা সে সম্মানের অধিকারী নহেন। বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে এক্ষণে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করাইতে পারা যায় না, ইহা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল। অপরাপর জাতি শাস্ত্রালোচনা করিলে উচ্চ হইতে পারিবেন। হিন্দুর জন-সংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শূদ্রনামে ঘৃণিত। তাঁহাদের মধ্যে সমর্থ ব্যক্তিগণ রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনা আরম্ভ করিলে নিশ্চয় গৌরবান্বিত হইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। বৈদ্য জাতিতে যেমন রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্য্যবিশেষের

ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য জাতিতে তদ্রূপ মহাপুরুষের আর্বির্ভাব আবশ্যক। বৈশ্যদিগের উপবীত গ্রহণের সম্মান, রাজা রাজবল্লভ দ্বারা অর্জ্জিত।

মুসলমান ও খৃষ্টানের সংশ্রবে থাকিয়া আমাদের প্রচলিত জাতিভেদের প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। যিনি যে জাতীয় হউন না কেন, তাঁহার গুণ ও ক্ষমতার মান্য হইয়াছে। নিম্নজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিলে সেই জাতি অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। অতএব কতকগুলি জাতির এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ চেষ্টার প্রস্তাব অসাময়িক হইতেছে, এমন মনে করা কর্ত্তব্য। ভারতে অধিকাংশ লোক জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত; তাহাদের মতে বর্ণভেদ সম্মানের নিদান। এই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক সম্মানের সময় বর্ণভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

নবশাখা শব্দ সংক্ষিপ্ত আকারে নবশাখ এই আকার ধারণ করে। উহা সংস্কৃত হইয়া নবশায়ক শব্দের উৎপত্তি করিয়াছে। পৌরাণিক আকার ধারণ করিতে হইলে সংস্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ করা আবশ্যক, এজন্য বাঙ্গালা নবশাখ সংস্কৃতে নবশায়ক হইল। কথিত আছে, পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়করণে নয়টী জাতি সহায়তা করিয়াছিল। সেই জন্য তাহারা শায়ক অর্থাৎ বাণস্বরূপ গণ্য হয়। শব্দকল্পদ্রুমে পরাশর সংহিতার নামে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা মূল গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাইলাম না। অতএব নবশায়ক শব্দটি এখনও শাস্ত্রীয় হয় নাই। নবশাখ পরিচায়ক কয়েক প্রকার শ্লোক দৃষ্ট হয়, বোধ হয় তাহাতে প্রাদেশিক বৈষম্য আছে। যথা—

নবশাখা।

১। গোপালস্তৈলিক স্তন্ত্রীমালি মোদক বারুজিঃ।
কুলাল কর্ম্মকৃত্‌কুন্দো নবশাখা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
উদ্ভট (কলিকাতা রিভিউ)

২। মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কাংসকারঃ এতে ষট্‌ শিল্পিনোবরাঃ॥

সূত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকার স্তথৈবচ।
গৌণকল্পশ্চ বিজ্ঞেয়ো-নবশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

উদ্ভট (নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা)

৩। গোপনাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বুলি পর্ণকারৌচ করণা বণিকাদয়॥
এতে সৎশূদ্র জাতাশ্চ নবশাখা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

উদ্ভট (নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা)

নবশায়ক।

৪। গোপোমালী চ তাম্বুলি কাংসার তন্ত্রী সাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিত নবশায়কাঃ॥

(আনন্দ ভট্ট)

৫। তৈলিগোপ স্তথা মালী তাম্বুলি বণিক বারুজিঃ।
কুম্ভকারঃ কর্ম্মকারঃ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

উদ্ভট (কলিকাতা রিভিউ)

৬। গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজিঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

উদ্ভট (শব্দকল্পদ্রুম)

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে দৃষ্ট হইবে, নবশাখ এক প্রকারের নহে। যে প্রদেশে সমশ্রেণীর যে কয়েকটি জাতির বাস ছিল, তন্মধ্য হইতে নয়টী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে নবশাখের মধ্যে জাতির প্রভেদ গ্রহণ করিলে শ্লোক কয়টির সমন্বয় হইতে পারে। নব শব্দ সংখ্যাবাচক না হইয়া যদি নবীন এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে নানাবিধ জাতির উল্লেখ হইলেও শাখা

শব্দের বিশেষণ হওয়ায় অসঙ্গত হইবে না। নবশাখ বা নবশায়ক যাহাই বলুন, তাম্বূলী জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

নবশাখের মধ্যে যাঁহারা অধিক উন্নত হইয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে সকল গুলি অঙ্কুরিত হয় না। কতকগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। যে বীজ অধিকতর পুষ্ট ও অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে, কেবল সেই গুলিই অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাম্বূলী বংশ তদ্রূপ যোগ্যতরের সংরক্ষণ স্মরণ রাখিয়া সমাজক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী যোগ্য হইবার উপায় অবলম্বন করিলে বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। সমাজ ও মানব, মানব ও পশু, জীব ও উদ্ভিদ্, চেতন ও জড়ে দ্বৈতভাব নাই ও একমেবাদ্বিতীয়ং নিয়মের অধীন।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

পরশুরাম লিখিয়াছেন, শিবঘর্ম্ম হইতে তাম্বূলি উৎপন্ন হইয়াছে।

যখন করিল শিব সমুদ্র মন্থন।
মন্থন হইতে বিষ হইল উপার্জ্জন॥
বিষ অগ্নি দাবানলে পৃথিবী ভস্ম হয়।
সেই বিষ ভক্ষণ করিল শিব মহাশয়॥
বিষ পানে সদানন্দ ঢলিয়া পড়িল।
পার্ব্বতী আসিয়া শিবে চেতন করিল॥
কণ্ঠেতে রাখিয়া বিষ পরম যতনে।
নীলকণ্ঠ নাম হইল তথির কারণে॥
কপালের ঘাম পুঁছি তাম্রের কষায় ধরি।
অঙ্গের মলা তাতে দিলেন ত্রিপুরারি॥
সেই মলা হতে হইল পুরুষ রতন।
শিব খ্যাতি নাম দিলেন নারায়ণ॥
দিনে দিনে সেই পুরুষ বাড়িতে লাগিলা।
হিমাবতী নাগ-কন্যা তারে বিভা দিলা॥
কতদিনে হিমাবতী গর্ভবতী হইল।
তাহার গর্ভেতে এক পুরুষ জন্মিল॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ পুরুষ দেখি ত্রিলোচন।
তাম্বূল-পুত্র বলে নাম দিলেন নারায়ণ॥
শিবখ্যাতি পিতা মাতা হিমাবতী।
তাহার গর্ভেতে হইল তাম্বূলি উৎপত্তি॥
এই মত হইল তাম্বূলির জনম।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম॥

পরশুরাম এই আখ্যান কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, বা কল্পনার আশ্রয়ে বর্ণনা সরস করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ফলিতার্থে দুইই এক। স্মার্ত্ত শিরোমণি যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, হিন্দুজাতিবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে কেবলমাত্র চারিটী জাতি ছিল ও শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা অপরাপর জাতির মধ্যে বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া কতকগুলিকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত করেন। আমার বোধ হয় অধিকাংশ অতিরিক্ত জাতি ব্রাহ্মণ দিগের কৌশলে কিম্বা ঐ সকল জাতির চারিটী আদিম জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব হওয়ায়, সঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত জাতির আদিসম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, কতকগুলি ইংরাজ লেখকের দ্বারা তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমার ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনু কিম্বা অপর শাস্ত্রকার যে ভাবে নূতন কোন জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে কোন জাতি গঠিত হইতে, পারে না। প্রত্যেক অনিয়মিত বিবাহ এবং নিষিদ্ধ সঙ্গমের আবশ্যকীয় লিপি কি রক্ষিত হইয়াছিল? এবং ঐ সকল দলের সন্তান সন্ততি কি রাজাজ্ঞায় বিভিন্ন জাতিভুক্ত হয়? রাজসভায় প্রাধান্যলাভার্থ কীদৃশ ষড়যন্ত্র করিতে হইত, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণেরা গ্রহাচার্য্যকে চর্ম্মকারের ঔরসজাত ও বৈদ্যকে ব্রাহ্মন দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া কেন পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" কল্পভেদ উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য বিধানের প্রথা থাকিলেও ইতিহাসের চক্ষে বিভিন্ন পুরাণে জাতি সকলের উৎপত্তির কারণ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পুরাণ নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস নহে, কল্পনার ক্রীড়া-প্রদর্শন পুরাণে দূষণীয় হইতে পারে না। পুরাণকার যে অতিরিক্ত জাতিকে যেমন সামাজিক সম্মানের অধিকারী দেখিয়াছেন, তদনুযায়ী অনুলোম প্রতিলোমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিতৃ ও মাতৃকুল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে এক্ষণে কোন জাতি নাই। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়, বেনিয়ারা বৈশ্য, তদিতর জাতিগুলি শূদ্র নামে খ্যাত। ব্রাহ্মণেরও গুণ ও কর্ম্মানুসারে অন্য নামে পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতাবলে তাহা ঘটে নাই। তাম্বূলের ব্যবসায় করিবার পূর্ব্বে কখনই তাম্বূলি নামে কোন জাতি হয় নাই।

হিন্দুস্থানী তাম্বূলিদের সহিত নামগত একতা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য নাই। অনৈক্য,—১ম বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, ২য় চূড়াকরণ, ৩য় দীক্ষা, ৪র্থ গোত্রীয়তা, ৫ম অশৌচ-ব্যতিক্রম, ৬ষ্ঠ জীবিকান্তর। অতএব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খিলিব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালী তাম্বূলির পূর্ব্ব পুরুষ কিনা, সন্দেহ হইতে পারে। যখন ভাষা বিভিন্ন হইয়াছে, তখন আচার ব্যবহার বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত নহে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বারুইগণ দ্বিজপাত্র নামে কোন ব্যক্তির পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজার নামান্তর তাম্বূলি পূজা। হরগৌরী পূজার সময় দেবীর পার্শ্বে মৃণ্ময় দ্বিজপাত্রের মূর্ত্তি চণ্ডীমণ্ডপে অনেকে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কুচিয়াকোলে প্রাপ্ত আমাদের কুলজীতে দৃষ্ট হয়, দ্বিজপাত্রের পুত্রের নাম হরানন্দ; এবং পরশুরাম দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরানন্দ। পরশুরামের ভণিতায় তাঁহাকে দ্বিজ কহা হইয়াছে। এখন অনুমান করিতে পারি, দ্বিজপাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিজপদবাচ্য হইয়াছে। তাম্বূলির কুলজী লিখন ও সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তনে পরশুরামকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহাকে স্বজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। কি গুণে তিনি দ্বিজপাত্র হইয়াছিলেন, জানিতে পারা যায় না। পরশুরাম নিরঞ্জনের দাস ছিলেন ও ধর্ম্মের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন।

নিরঞ্জন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর।
তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর॥
দূত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল।
প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল॥
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ। *
দ্বিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ। সুতরাং পরশুরামের

* পরশুরাম দাসের পুত্রগণ।

১ম হরানন্দ, ২য় গুণাকর, ৩য় রতিনাথ, ৪র্থ কেশব, ৫ম কামদেব, ৬ষ্ঠ, অনিরুদ্ধ, ৭ম শঙ্কর, ৮ম * * ৯ম লোকনাথ, ১০ম জনার্দ্দন, ১১শ * * ১২শ রঘুনন্দন, ১৩শ জয়কৃষ্ণ, ১৪শ কলানিধি।

ধর্ম্মকে বৌদ্ধ রত্নত্রয়ের অন্যতর কহিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছেন, বাঙ্গালায় অন্যান্য জাতির যে কুলজী পাওয়া গিয়াছে, তাহার আরম্ভে অনাদ্যের নমস্কার দৃষ্ট হয়। ইহাতে তিনি অনুমান করেন, এই সকল জাতি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ্য মতে প্রবিষ্ট হইলে এই জাতিগুলিকে নবশাখ বা নূতন শাখারূপে গণ্য করা হইয়াছে। ঘনরাম ও তদীয় আদর্শ ময়ূরভট্টের কাব্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পরিবর্ত্তে সদ্গোপ এবং বারুইগণের রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে। রাজা হইলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় বটে, কিন্তু পালরাজগণ সদ্গোপ ছিলেন, বোধ হইতেছে। ইহারা ভারতীয় বৌদ্ধযুগের শেষ রাজা। এখনকার যেমন ব্রাহ্ম, তৎকালে সেইরূপ বৌদ্ধ। একই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিভিন্ন সম্প্রদায়। পৌরাণিকগণ বৌদ্ধ যুগকে কলিকালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণ্য মতের আশ্রয় লইলে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হউন, ক্রিয়ালোপ বশতঃ শূদ্ররূপে গণ্য হইলেন; এইজন্য বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে গোপকে বৈশ্য বলা হইয়াছে; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞের অবসানে সদ্গোপকে বৈশ্যের মাল্য প্রদান করেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শিরোমণি বিবেচনা করেন, ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কারণে ক্রিয়ালোপ হইয়াছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈশ্যত্বের লক্ষণ-অনুসারে তাম্বূলিগণ শূদ্র নহে। তাঁহারা যদি হিন্দু ধর্ম্মের সকল ক্রিয়াকলাপে অধিকারী হইতে চাহেন, বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান অতি প্রাচীন নগর। অনেকবার ইহার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বহু রাজবংশ এই স্থান শাসন করিয়াছেন। তাম্বূলি বণিকগণ প্রথমতঃ এখানে বাস করিয়া গণনীয় ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বংশ বহু-বিস্তৃত হইল। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের সময় সম্মানিত তাবৎ জাতির মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে ইহাদের মধ্যেও কৌলিন্য প্রবর্ত্তিত হয়। রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে।

দেব-অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হইল আচরণি॥

জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥
যে দেশে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাতে লিখিল॥

এতদনুসারে যে কুল-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পাওয়া যায় না। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হইবার বহুবৎসর পরে সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দিতে পরশুরাম তাম্বূলীর কুলজী লিখিয়াছিলেন। কেননা, পরশুরামের কুলজীতে আমেদপুর, ইছলা-বাজার প্রভৃতি তাম্বূলিগণের বাসগ্রামের এবং খাঁ ও পিরি প্রভৃতি তাহাদের উপাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আনুমানিক ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের আদিসমাজের সহিত মনান্তর ঘটাতে শ্রীমন্ত পাল ও ষষ্ঠীবর সিংহ কর্ত্তৃক বৈঁচিগ্রামে তাম্বূলিগণের একটী পৃথক দল স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ১৪ গ্রামী সমাজ নামে খ্যাত হয়।

দ্বারবাসিনী, বেলে, জাঙ্গিপাড়া বাটী।
কৃষ্ণনগর, চাঁচোয়া আর দোয়ার হাটী॥
দিপে, গুপীনাথপুর মধ্যে খাঁড়েশ্বরপুর।
চাঁদবাটী, আদি করে বালগড় দূর॥
বড়শূল, ফতেপুর, আর কর্জ্জনা গ্রাম।
যথা হতে আসিলেন যিনি তাহাকে প্রণাম॥

আদিসমাজ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত যে কয়েক খানি গ্রামের অধিবাসীর সহিত একতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার সংখ্যা ৪২ বিয়াল্লিশ।

দশপুর, আমোদপুর, সাতগেছে নাম।
মাদপুর, কাইগ্রাম, পলাশডাঙ্গা ধাম॥
সিউড়ী, কেশেড়া, পলাশন, গন্ধপুর।
চাকুলে, ছাতিনে, দাসপুর, নিলপুর॥
দুয়ারবাসিনী, কুচুট, কালেশ্বর।
পুনকুট্যা, সিঙ্গারকোণ, রাধানগর॥
কাটোয়া, কড়ার, কোগ্রাম, পুরগ্রাম।
শাঁচড়া, পাঁচড়া, মহানন্দা, মধুগ্রাম॥

বাইচী, বড়য়া, বটগ্রাম, বড়বেলুন।
জগদাবাজ, ইটুলে-বাজার, ছোটবেলুন ॥
তেলকুপী, কর্ণ, গজস্কন্ধ, ঝাজুর।
চাইদ, নাড়িচে, সাটনন্দাদী, দেপুর ॥

অতএব এক্ষণ হইতে তাঁহারা ৪২ গ্রামী নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই বিয়াল্লিশের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রামে অদ্যাপিও আদি সমাজ বাস করিতেছেন।

৪২ গ্রামী তাম্বূলিরা বেহার হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া থাকিবেন। আসামে স্বভাবতঃ তাম্বুল উৎপন্ন হয়। নাগ এই প্রদেশের পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ অর্থাৎ নাগাগণ যেথানে বাস করে, সেই স্থানকে নাগলোক বলিতে পারা যায়। এই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাম্বূলের অপর নাম নাগবল্লী। পরশুরাম লিখিয়াছেন, নাগলোক হইতে পান আনীত হয়।

ধর্ম্মের রচনে পুরুষ গমন করিল।
নাগলোক মধ্যে গিয়া উপনীত হইল ॥
পুরুষের রূপ দেখি নাগের নন্দিনী।
মায়ের নিকটে কহে যোড় করি পাণি ॥
এই পুরুষে আমি করিব বরণ।
শুনিয়া নাগিনী হইল আনন্দিত মন ॥
স্বামির নিকটে তবে বলে এ বচন।
তোমার কন্যা এই পাত্রে করিবে বরণ ॥
শুনি নাগরাজ তবে পাত্রেরে আনিল।
কোন বংশে জন্ম বলি তারে জিজ্ঞাসিল ॥
তাম্রকুণ্ডে ধর্ম্মরাজ করিল সৃজন।
শুনি নাগরাজ তবে আনন্দিত মন ॥
দুহিতা আনিয়া নাগ সম্প্রদান কৈল।
তাম্বূল যতেক আনি পুরুষেরে দিল ॥
তাম্বূল লইয়া পুরুষ হরষিত অন্তরে।
যোড় হস্ত হ'য়ে বলে নাগের গোচরে।

অবিলম্বে যাব আমি মরত ভুবনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে॥
শুনি নাগরাজ তবে বিলম্ব না কৈল।
কন্যা সহ জামাতারে বিদায় করিল॥
অবিলম্বে গেল তবে মরত ভুবনে।
তাম্বুল লইয়া সেবা কৈল মুনিগণে॥
এই ত হইল তাম্বুল পত্র উপাদান।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম॥

এই লতা কৃষকগণ আসাম হইতে বেহার লইয়া গিয়া থাকিবে। বেহার প্রদেশের বাতাবরণ অনুকুল না হওয়ায়, বরজ নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত লতা রক্ষা করিতে হইয়াছে। যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের নাম বারুই। পান প্রথমে পর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে মসলা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, তাম্বূল নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে মসলা সংযুক্ত খিলিই তাম্বূল। যাহারা পানের খিলির ব্যবসায় করে, তাহারা তাম্বূলি।

কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জীবনধারণের জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে স্থানান্তরে যাওয়া আবশ্যক হইল। বর্দ্ধমান হইতে তাম্বূলিগণের একটী সম্প্রদায় বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য অদ্যাপিও আপনাদিগকে বর্দ্ধমানিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বসমাজের নাম ৪২ গ্রামী ছিল, এজন্য তাঁহারা ৪২ গ্রামী নাম ত্যাগ করিতে চাহেন না। বর্দ্ধমান হইতে ইঁহারা অনেক দূরে আছেন এবং আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রেরও অভাব নাই, এজন্য বর্দ্ধমানের আদিসমাজের সহিত ইঁহারা সর্ব্ব প্রকারে সংস্রব-শূন্য হইয়াছেন। ইঁহারা যে বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছেন, ইঁহাদের কৌলিক পরিচয়ে তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। যথা, চাকুলের দে, গজস্কন্ধ দত্ত, বটগ্রামী দত্ত ও বড়য়ার দত্ত। ইহার অর্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, যে চাকুলে, গজস্কন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া গ্রামে উক্ত দে এবং দত্ত বংশের পূর্ব্বে বাস ছিল। এই চারি খানি গ্রাম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত।

এইরূপে কতকগুলি ব্যক্তি বাঁকুড়ার সন্নিকটে রাজহাট গ্রামে আসিয়া গজস্কন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া শব্দ উপাধির সহিত ব্যবহার করিতেছেন এবং বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, যে কেবল জীবিকার জন্য নহে, পরন্তু মুসলমানের অত্যাচারে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের মায়াপুর হইতে তাম্বূলিগণের একটী সম্প্রদায় জাহানাবাদে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা আদি ৪২ গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেব্যরাজ, হেলান, সেনপুর, কুশপাতা, পোল, পাতুল, বাগড়া, ও বড়াম প্রভৃতি ৮ খানি গ্রামে আপনারা বাস করিয়াছিলেন; একারণ তাঁহাদের সমাজকে অষ্ট-গ্রামী সমাজ বলে। ইহাদের আদান প্রদান এই ৮ খানি গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। তাঁহারা পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছেন ও এক্ষণে বর্দ্ধমানের ৪২ গ্রামী সমাজের সহিত পূর্ব্বসম্পর্ক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যখন দে এর দে অর্থাৎ দেপুর নিবাসী দে ও তেলকুপীকর বা তেলকুপী গ্রামনিবাসী করবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে হইতেছে, তখন ৪২ গ্রামীর সহিত সম্পর্ক প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

অষ্টগ্রামী সমাজে কুলীনের মান্য অত্যধিক। কতকগুলি লোকের তাহা সহ্য না হওয়ায়, তাঁহারা আবার পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নাম চতুর্গ্রামী। সেই চারিখানি গ্রামের নাম যথা;—সেনপুর, বিষ্ণুপুর, পাতুলসাঁড়া ও দেগ্রাম। ইহাদের মধ্যেও দে এর দে এবং বটগ্রামী দত্ত আছেন।

যে তাম্বূলি সম্প্রদায় আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্দ্ধমানের দক্ষিণ অংশে গিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা দক্ষিণ-দাঁড়া নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ৪২ গ্রামী বলিয়া জানেন। তাঁহারা দে এর দে, গজস্কন্ধ দত্ত ও বটগ্রামী দত্ত এই পরিচয় রক্ষা করিয়া ৪২ গ্রামিত্বের প্রমাণ দিতেছেন। পরন্তু আদি সমাজ হইতে অনেক দিন হইল, তাঁহাদের সংস্রব রহিত হইয়াছে বলিয়া, কর্ণপুরের স্থানে কর্ণসেনী সেন এবং চাকুলের দের পরিবর্ত্তে চোকালের দে বলিয়া উল্লেখ করেন।

দয়াল রক্ষিত উপাধিটীর অর্থ এই, যে রম্ভাবতী ও দয়াবতী এই দুই পূর্ব্বমাতৃকা হইতে রম্ভাবতী রক্ষিত ও দয়াল রক্ষিত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

অষ্টগ্রামী সমাজে এই উপাধি প্রচলিত আছে। দক্ষিণদাঁড়া সমাজ হইতে ঐ পদবীধারী লোক অষ্টগ্রামী সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কিম্বা অষ্টগ্রামী সমাজের ঐ উপাধিধারী ব্যক্তি ৪২ গ্রামী থাকে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, স্থির করিতে পারিলাম না। দক্ষিণদাঁড়া সমাজের ৪২ গ্রামী নামটী আধুনিক। ১৪ গ্রামীর দৃষ্টান্তে ৪২ গ্রামী নামকরণ হইয়াছিল। এই দলাদলির বহু পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইতে এই দক্ষিণ দাঁড়ার দল সপ্তগ্রাম প্রদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়া বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিল।

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী সপ্তগ্রামের তটবিধৌতকারিণী জাহ্নবী অন্য দিকে প্রবাহিতা হওয়ায় বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিতে অসমর্থ হয়। ইহাতে নগর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির সময় মুসলমান শাসনকর্ত্তা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রজাকুল দিগন্তে পলায়ন করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে লাগিল। তাম্বূলিগণ সেই কারণে গঙ্গা পার হইয়া কুশদহের নিকট গিয়া বাস করিলেন। ১৫৯০ হইতে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রঘুনাথ চৌধুরী খাঁটুরাগ্রামে ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বাসস্থান প্রদান করিলেন। আনুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈঁচি হইতে একটী পরিবার এখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তদনন্তর ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার সময় আরও কতকগুলি লোক নিরাপদ হইবার মানসে খাঁটুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে কুশদহ তাম্বূলিদের একটী পৃথক্ সমাজ রূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বদেশে আসিয়া ইঁহারা দাম্‌পাল রক্ষিত, কর্ণপুরের সেন ও চাকুলের দে, এই উপাধি ধারণ করিয়া আজও রাঢ়ের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার কল্যাণে কর্ণপুরের সেনকে কর্ণমুনি সেন এবং চাকুলের দে কে কাঁঠালে দে করিয়া লইয়াছেন।

৪২ গ্রামী দক্ষিণদাঁড়া ও ১৪ গ্রামীদের মধ্যে বর্ষাদি নামে কুলপূজা প্রচলিত আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় কেহ কেহ অতি সমারোহের সহিত মহামায়ার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার অঙ্গ বলিদান পর্য্যন্ত দিতে ত্রুটী হয় না। শিব-দুর্গার সন্নিধানে জাতীয় বৃত্তির সহায়স্বরূপ চূর্ণের ঘট, তাম্বূলপত্র, জাঁতি ও কাতারি রক্ষিত হয়। কুশদহে সপ্তগ্রামী সমাজে এই পূজা প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নাই। বর্দ্ধমানিয়া, রাজহাটী, অষ্টগ্রামী ও চতুর্গ্রামী সমাজ বৈষ্ণব।

অতএব শক্তিপূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে এই ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে যে, তাম্বূলিরা পানের খিলির ব্যবসায় করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে খিলি বিক্রয় করিবার প্রথা দৃষ্ট হয় না; ইহাতে অনুমিত হয় যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের খিলি-ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালায় আগমন করতঃ অন্য পণ্যজাত অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন।

নামের সহিত আমরা যে উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকি, পরশুরাম ইহাকে আশ্রম কহিয়াছেন। আশ্রমের সংখ্যা ৩৭ সাঁইত্রিশ।

দে, দত্ত, সেন, পাল, প্রধান চারি ঘর।
আশ, দাস, নাগ, নন্দী, হয় তার পর॥
কুণ্ডু, গুঁই, লাহা, তদপর হয় চেল।
সিংহ, রক্ষিত, দাঁ, চন্দ্র, এই যোল মেল॥
কর, গণ, বর্দ্ধন, মৌলিক মধ্যে গণি। *
এন্দ, কেন্দ, বিট, পিরি, তৎপর বাখানি॥
চার, সার, শো, শীল, নাদ, কচ, ধল।
রুদ্র, খাঁ, পরম, ঘোষ, হয় এক মেল॥
মাল, মুগুর, তদপর সর্ব্বশেষ ভূঁই।
এই তিন আশ্রমকে কদাচিৎ ছুঁই॥
সাঁইত্রিশ আশ্রম এই প্রত্যেকেতে (?) নাম।
বহু আদরেতে কহেন পরশুরাম॥

উল্লিখিত ৩৭ আশ্রমের মধ্যে ৩০টি প্রচলিত দেখা যায়। নন্দন নামে আশ্রম নাই, কিন্তু বর্দ্ধমানিয়া সমাজে এই আশ্রমের লোক আছেন। আশ্রমের পর্য্যায়ে পাঠভেদে বিভিন্ন উপাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। গাঁই সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রকৃত পাঠ বিস্মৃত হইলে সভায় প্রশ্নোত্তর কালে যথা সম্ভব একটি পাঠ লাগাইয়া আবৃত্তি করতঃ অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইত। প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের সূচনা যথা;—

---

* কুচিয়াকোলের পাঠান্তর 'বল্লালসেনি অষ্টাদশ ডাকিলেন কেনে।"

বন্দিব তাম্বূলি গোষ্ঠী চরণ কমলে।
যাহার প্রসাদে প্রাপ্তি বাসনা সকলে॥
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব বসিয়া একাসনে।
নিষ্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে॥
পদরেণু পরশে পাপীর পরিত্রাণ।
দর্শনে দুর্গতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ॥
গয়া, গঙ্গা, গণ্ডকী, গোকুল, গোবৰ্দ্ধন।
গোদাবরী, দ্বারকা, যমুনা, বৃন্দাবন॥
প্রয়াগ, পুষ্কর, কাশী, শ্রীপুরুষোত্তম।
সরস্বতী, সেতুবন্ধ, সাগর সঙ্গম॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, রেবতী, অবন্তিকা।
প্রভাস, পুষ্কর, কাশী, মুকুট, দ্বারকা॥
এই আদি অনেক তীর্থ আছে এ ভুবনে।
সর্ব্ব তীর্থের ফল হয় গোষ্ঠী দরশনে॥
গোষ্ঠীর গরিমা গৌরী (?) সম গণ্য।
গোষ্ঠীকে বিদিত তাহা নাহি হয় অন্য॥
তৃণ হয় পর্ব্বত পর্ব্বত হয় তৃণ।
গোষ্ঠীর নির্দ্দয় দয়া করণেতে চিন॥
যাহার ঘরেতে হয় গোষ্ঠীর গমন।
পাপ তাপ দুখ তার আপদ মোচন॥
নাহিক নিস্তার জ্ঞাতি বন্ধু যদি রোষে।
তাহার প্রমাণ গরুড়ের পাখা খসে॥
জ্ঞাতি-বাক্য না রাখিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশে শতেক ভাই হইল নিধন॥

* * *

স্ববৃত্তি নিজ ধর্ম্ম নরের ভূষণ।
তাম্বূলি জাতির অন্য বৃত্তি না হয় শোভন॥

যত জীব বিধাতার সৃজন পৃথিবীতে।
এই মত জাতি-তত্ত্ব শুনি নাই কোন জেতে ॥
জিজ্ঞাসায় আলাপন অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ।
আদ্যোপান্ত কথা দুর্ব্বার এ তরঙ্গ ॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কথা অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ।
কেহ ভক্ত কেহ বক্র লেগে যায় দন্দ ॥
গোষ্ঠীর বিচারে যার জয় পরাজয়।
জনক জননী ধন্য তার যশ হয় ॥
গোষ্ঠীকে করি আমি অসংখ্য প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে ভাগবত পুরাণ (?) ॥ *

মাল ও বর্দ্ধন অষ্টগ্রামী সমাজ, থাক্ বা থাগ্, মুগুর ও রুদ্র দক্ষিণ দাঁড়া সমাজ, ভুঞি ও নন্দন বর্দ্ধমানিয়া সমাজ ভিন্ন অপর ৭ সাতটি সমাজে প্রচলিত নাই। উপাধির অর্থ স্থির করা কঠিন। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্রে পিতার নাম পুত্রের নামের পর উপাধি স্থলে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। দেবদত্ত ও শান্তিরক্ষিত এই নাম দুইটীর অর্থ, দেবতা কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি প্রদত্ত হইয়াছে ও শান্তি দ্বারা যে রক্ষিত হয়; এই নাম দুইটীকে যদি সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, তবে দত্ত ও রক্ষিত থাকিয়া যাইবে। এই অংশ কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়া দত্ত ও রক্ষিত বংশ-পরিচায়ক শব্দ হইবে। তাম্বূলিকুল যখন বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বংশের পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য প্রতিবাসীদিগের উপাধি গ্রহণ করিলেন। দত্ত ও রক্ষিত প্রভৃতি উপনাম তাহাদিগের নিজের বংশে উৎপন্ন হয় নাই। কুণ্ডু ইত্যাদি উপাধি ৭২ বায়াত্তর ঘর কায়স্থের মধ্যে লক্ষিত হয়। এঁদ্, কেঁদ্ প্রভৃতি অপভাষার

* গোষ্ঠীবন্দনা ও পরশুরাম দাসের কারিকা জয়পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ দত্ত মহাশয়ের যত্নে পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়া জেলায় পরগণা বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত কুচিয়াকোল গ্রামে শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস মহাশয়ের বাটীতে প্রাপ্ত লালপুরনিবাসী শ্রীকালিচরণ দের জন্য ১২৮০ সালের ৮ আশ্বিন লিখিত "জিজ্ঞাসা পড়ারখাতা" ও বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, মহাশয়ের প্রেরিত পাঠভেদ দৃষ্টে সংগৃহীত।

শব্দের ন্যায় ৭২ ঘর কায়স্থের উপাধি আছে। ৪২ বিয়াল্লিশ পর্য্যায়ের ১৭ খানি গ্রামে ইদানীং বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজের বসতি আছে। তাহাদের নাম যথা ;—ছোট বেলুনী, মাধপুর, কাইগ্রাম, কাশিয়াড়া, ইছলে-বাজার, সাতগেছে, আমদপুর, ছাত্নী, জগদাবাদ, দেপুর, শিউড়ি, দাসপুর, নাড়িচে, নীলপুর, বটগ্রাম, সাটনন্দী ও কানপুর (কর্ণপুর)। অতএব এই সমাজকে আদি সমাজ বলা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আদি সমাজে কুলজী রক্ষিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া সমাজ হইতে ইহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

তাম্বূলি কুলের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। গোত্র অর্থে ঋষি বিশেষের যজমান শ্রেণী বুঝায়। ঋষির যিনি পুরোহিত, তাঁহাকে প্রবর কহে। বিশেষতঃ আমাদের পুরোহিতের গোত্রে গোত্র হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; সুতরাং স্বগোত্র হইলে স্ববংশ হইতে পারে না। মধুকৌল্য নামে যে গোত্র দেখা যায়, তাহা মৌদ্গল্য শব্দের অপভ্রংশ সন্দেহ নাই। মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবরের সংখ্যা ৫ পাঁচ যথা :—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নু-বৎ। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর :—শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। কাশ্যপ গোত্রের প্রবর ;—কাশ্যপ, অপসার ও নৈধ্রুব। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর :—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য। পরাশর গোত্রের প্রবর— পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ। গর্গ গোত্রের প্রবর :—গর্গ, কৌস্তুভ ও মাণ্ডব্য।

তাম্বূলি সমাজে কোন বিশেষ উপাধিধারী ব্যক্তি সর্ব্বত্র কুলীন নহেন। গুণের পুরস্কার স্বরূপ বল্লাল কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, নির্গুণের পক্ষে সে মর্য্যাদা ভোগ করা অনুচিত। যে সমাজে যিনি যোগ্য, তাঁহাকে কুলীন করা সঙ্গত হইয়াছে। এই জন্য কুলজীতে যেরূপ আশ্রমের মর্য্যাদা বর্ণন আছে, তাহার সহিত ঐক্য হয় না। আদি সমাজে চেল, দত্ত, পাল ও সেন কৌলিন্য সম্পন্ন। ১৪ গ্রামী সমাজে দত্ত ও সিংহ কুলীন। অষ্টগ্রামীতে দে, সেন, নন্দী, গুঁই, রক্ষিত ও লাহা। চতুর্গ্রামীতে দে, কুণ্ড, সেন ও গণ। দক্ষিণ-দাঁড়ায় দে, দত্ত, সেন, সিংহ, লাহা, রক্ষিত, দাঁ ও নন্দী কুলীন। বিষ্ণু-পুরের কথা জানি না। বাঁকুড়া ও কুশদহ সমাজে কুলীন বলিয়া কেহ খ্যাত নাই। এক উপাধিধারীর মধ্যে সকলে কুলীন নহে। কুলীনের বংশ

পৃথক। চারি প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা কুলীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। ১ম—মালাচন্দন, ২য়—অধিবাসের ডালা, ৩য়—পঙ্‌ক্তি-ভোজন এবং ৪র্থ—অনুমতি গ্রহণ। সকল সমাজে না হউক, অষ্টগ্রামীরা এই চারিটী অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আটঘর কুলীনের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক ঘর কৌলিন্য মর্য্যাদা গ্রহণের পাত্র আছেন। পাত্রের বাটীতে ক্রিয়া কলাপের সময় তিনি উল্লিখিত চারিটী সম্মান ব্যতীত বরণের যুগ্ম বস্ত্র ও অঙ্গুরীয় পাইয়া থাকেন। পাত ও ভাত তাঁহাকেই অগ্রে প্রদত্ত হয়। যজ্ঞে ঘৃত প্রদানের অনুমতি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কুলীনের নিকট লইতে হয়। বিবাহাদিতে গোষ্ঠী সভায় কর্ম্মকর্ত্তা কুলপতি দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। কর্ত্তার কুলীন কহেন, "স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, আত্ম, অন্তরঙ্গ, দশ উপাধিধারী দশজন" * মহাশয়দিগের অনুমতি হইলে শুভ বিবাহ বা অন্য কাজ আরম্ভ করিতে পারি। কুলীনের বাটীতে কার্য্য হইলে, তাঁহার ভ্রাতা বা অন্য প্রতিনিধি কুটুম্বমণ্ডলীতে উপরোক্ত বচন পাঠ করেন। যে কুলীনের পাত্র নাই, তিনি নিরংশী ভাই। কুটুম্বিতার কাগজে কুলীনদিগের সহিত বাগ্‌ড়ার নন্দীর নাম লিখিত হয় না। মর্য্যাদার টাকা মোড়কে করিয়া স্বতন্ত্র রাখা হয়, এই জন্য উহাদিগকে "মোড়কের নন্দী" বলা হয়। আশ কুলীন না হইলেও মৌলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ কোন কুলীনের নির্দ্দিষ্ট পাত্র নহেন। তাঁহারা যে কোন কুলীনকে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন। কাগজে তাঁহাদের নাম হেঁকাতে বা বক্রভাবে লেখা হয়। অন্যান্য সমাজে যেমন একজন কুলপতি থাকেন, অষ্টগ্রামীদেরও তাহাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তা যে কুলীনের পাত্র, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, মুখ্য কুলীনকে মালা দিবেন। ১৪ গ্রামী সমাজে মালাধর সেন উষ্ণীষ ধারণ করিয়া সভায় আসিতেন। পাগড়ী দেখিলে মালাচন্দন প্রথমে কাহাকে দিতে হইবে, সকলে বুঝিতে পারিতেন। অষ্টগ্রামী সমাজে বিজয়াবিঘূর্ণিত হইয়া মালাধর সেন তাঁহার শ্রীপদে মাল্য প্রদান করিতে কহিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাকে মাল্য গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কুলপতির মাল্য সাতদের প্রাপ্য হইল। তাঁহাকে মাল্যধর দে কহা যাইতে পারে। রাজা বৈকণ্ঠ

* "দশগ্রাম দশজন বেষ্টিত"

নাগ্দে বাহাদুর এই মালাধরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাম্বূলিকুলের প্রকৃত মালাধর হইয়াছেন। আদি সমাজ চেল-লায়েকদিগের আদিপুরুষ রাজ্যধরের উদ্দেশে বাটা রক্ষা করিয়া ৪ এর মধ্যে ১৷৹ ঘরের স্থান যাঁহার প্রাপ্য, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পান সুপারি দেন। চতুর্গ্রামীদের ডালা কুলীনকে দিবার নিয়ম আছে। মালা চন্দন কুলীন মৌলিক বিচার না করিয়া বয়ঃজ্যেষ্ঠকে সর্ব্বাগ্রে দিয়া থাকেন। কুশদহে অধিবাসের ডালাকে "আজ্ঞার বাটা" কহে। প্রামাণিক রক্ষিত বা প্রামাণিক আশ বৈবাহিক সভায় ইহা গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীসেবায় এই দুইজনকে অগ্রভাগ অন্ন যুগপৎ পরিবেশন করা হইত। দক্ষিণ-দাঁড়া সমাজে দয়াল রক্ষিত কুলপতি। তাঁহার বিনানুমতিতে কুলীনের বিদায়, সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের তিরস্কার হইতে পারে না। নিম্ন ঘরে আদান প্রদান করিলে কুলক্ষয় হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে ধনগত কুল হইয়াছে। কুলীনদিগকে প্রথমতঃ মালা চন্দন ও পান সুপারি দিতে হয়, পরে কুলীনেরা উচ্চ বিদায় ও মৌলিকগণ তদপেক্ষা লঘু বিদায় পান।

বিষ্ণুপুর সমাজে পূর্ব্বে একটি হাঁড়িতে পান সুপারি ও নবাত্ দিয়া নিমন্ত্রণের চিহ্ন স্বরূপ অর্ঘ্যরূপে কুটুম্ব গৃহে প্রেরিত হইত। ক্রমে বসতি স্থান দূরে সন্নিবেশিত হওয়ায়, উক্ত দ্রব্যের মূল্য এক পোণ কপর্দ্দক পাঠাইবার নিয়ম হয়। সকল সময় অনুষ্ঠানকারী পারগ না হইলেও তাঁহার পক্ষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করা উচিত বিধায় যাঁহাকে গৃহে আনিতে অক্ষম, তাঁহার জন্য পূর্ণ /৹ এক পোণ ও যাঁহাকে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে হইবে, তাঁহাকে পাঁচ কড়া কম পাঠাইতেন। এই সঙ্কেত দ্বারা পূর্ণ মূল্যগৃহীতা বুঝিতেন, স্বগৃহে অবস্থিত হইয়া তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া অনাবশ্যক। স্বল্পমূল্য গৃহীতাকে অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণার্থ ক্রিয়াবাটীতে যাইতে হইত। এই প্রথার নাম পরশুরামী দাঁড়া। এক্ষণে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। বাঁকুড়া সমাজে বিবাহ রাত্রে কন্যা ও বরপক্ষীয়দিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়াকে পরশুরামী দাঁড়া কহে। ১৪ গ্রামী সমাজে শ্রাদ্ধে এক স্থানে যাইবার জন্য (৬৷৹ সওয়া ছয় গণ্ডা এবং বিবাহে বর ও কন্যাগৃহে উভয় স্থানে যাইবার জন্য পাঁচ বুড়ি

পাথেয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজহাটী সমাজের মধ্যেও কড়ি দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল। অষ্টগ্রামীরাও শ্রাদ্ধে ৻১৫ পনের গণ্ডা ও বিবাহে ৴০ পোণ কড়ি দিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন। দক্ষিণ-দাঁড়া সমাজ পাথেয়ের কড়ি গ্রহণ করিতেন। কড়ির মূল্য তাম্র খণ্ড দ্বারা গ্রহণ করা অনেকে এক্ষণে অবিধেয় মনে করেন। কুশদহে বহুকাল যাবৎ উক্ত প্রথা রহিত হইয়াছে। খাঁটুরা হইতে যাঁহারা বরাহনগরে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কড়ির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

তাম্বূলিকুলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সামাজিক ও ভৌগোলিক ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পৌরাণিক একতা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ১ম—চেল এই নামধেয় আশ্রম আদি, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও সপ্তগ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্তর্গত। ২য়—সেন উপাধিধারীগণ আদি, ১৪ গ্রামী, ৮ গ্রামী, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুর, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজের সেনগণের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় ব্যক্তিও আছেন। ৩য়—পালগণ আদি, রাজহাট, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে কিয়দংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। অন্যে ১৪ গ্রামী ও ৭ গ্রামী সমাজে কাশ্যপ। কেবল ৭ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয় আছেন। ৪র্থ—দত্ত উপাধিধারীগণ তিন গোত্রে বিভক্ত। শাণ্ডিল্যেরা বিষ্ণুপুর, রাজহাট, ৪ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া, ভুবরাজপুরের পল্লীগ্রাম ও কুশদহ সমাজে বাস করেন। ব্যাসঋষি গোত্রীয়েরা ১৪ গ্রামী, রাজহাট ও দক্ষিণদাঁড়া সমাজে বাস করেন। পরাশর গোত্রীয়েরা আদি, ১৪ গ্রামী ও রাজহাট সমাজে বাস করেন। ৫ম—কর এই উপনাম বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আদি, ৮ গ্রামী ও ১৪ গ্রামী থাকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং ৪ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ৬ষ্ঠ—লাহা আশ্রমের জনগণ ৮ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া দলে শাণ্ডিল্য গোত্রাবলম্বী এবং আদি ও ১৪ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রাশ্রিত। ৭ম—রক্ষিত উপাধি দুই গোত্রে দৃষ্ট হয়। আদি, কুশদহ ও ৮ গ্রামী সমাজে শাণ্ডিল্য এবং ১৪ গ্রামী, ৮ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহে কাশ্যপ। ৮ম—আশ বিষ্ণুপুর, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহ সমাজে শাণ্ডিল্য। ৯ম—গুঁই ১৪ গ্রামী, বিষ্ণুপুর, ৮ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া সমাজে কাশ্যপ। ১০ম—দে উপাধিধারীগণের মধ্যে তিন গোত্র দৃষ্ট

হয়। আদি, দক্ষিণদাঁড়া ও ৭ গ্রামী থাকে কাশ্যপ। রাজহাট, ৮ গ্রামী ও দক্ষিণদাঁড়া থাকে শাণ্ডিল্য এবং ১৪ গ্রামী, রাজহাট, ৪ গ্রামী ও ৭ গ্রামী সমাজে কপিল ঋষি গোত্রীয়। ১১শ—দাঁ উপাধিধারীগণ ১৪ গ্রামী, দক্ষিণ-দাঁড়া ও ৭ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ১২শ—কোঁচ দক্ষিণদাঁড়া ও সপ্তগ্রামী সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয়। ১৩শ—কুণ্ডু আদি, রাজহাট, ৪ গ্রামী, দক্ষিণদাঁড়া ও কুশদহ সমাজে সপ্তর্ষি গোত্রীয়। ১৪শ—সিংহ আদি, ১৪ গ্রামী, ৪ গ্রামী ও তুবরাজপুরের পল্লীগ্রামী সমাজে ভরদ্বাজ গোত্রীয়। লৌহ-বর্ত্ম্য এক্ষণে বিভিন্ন সমাজকে নিকটস্থ করিয়া দিয়াছে। আমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া হৃদয়ের দূরতা নষ্ট করিতে পারিলে এক মহাসমাজে পরিগণিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য দ্বারা আপনাদের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারিব।

জন সংখ্যা।

(আনুমানিক)

১।	বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী	১৬০০
২।	বৈঁচির ১৪ গ্রামী	৮০০০
৩।	বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী	৪৫০০
৪।	বাঁকুড়ার রাজহাটী	৪৫০০
৫।	জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী	৫৫০০
৬।	মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী	৪৫০০
৭।	হুগলীর ৪২ গ্রামী (দক্ষিণদাঁড়া)	২২০০
৮।	কুশদহের সপ্তগ্রামী (গণিত)	১২০০
৯।	তুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী	৪০০০
১০।	বনকাটির গোয়ালপাড়া অষ্টগ্রামী	৩০০
১১।	কোতরাপুরের উৎকল অষ্টগ্রামী	১৫০০
১২।	খড়্গাপুরের সংসারে ৪২ গ্রামী	১০০০
		৩৮৮০০

বৰ্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী।

আদি ৪২ গ্রামী সমাজ এখনও প্রায় আদি অবস্থায় আছেন। অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই। কলিকাতা রসাপটীতে ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। মেমারির নিকটবর্ত্তী পাঁচথেয়া গ্রাম নিবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় ৺ রঘুনাথদের পুত্র গণেশচন্দ্র মুরসিদাবাদের নবাবের মুদি ছিলেন। মুরসিদাবাদের পথে ইনি বহু জলাশয় খনন করাইয়া গিয়াছেন। বাপীতটে শিবস্থাপনা করিয়া দেবসেবার জন্য পূজককে তন্নিকটে নিষ্কর ভূমিদান করিয়া ছিলেন। জলদান তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। পাঁচথেয়া, শশনাড়া, শাজন, ঘোষ, দেবপুর, শক্তিগড় এবং ছোট বেলুন গ্রামে তাহার অনেক নিদর্শন দেখা যায়। তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত ৺ রঘুনাথজিউ ও ৺ গণ্ডারচণ্ডী অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। গণ্ডারে তাল নামক পুষ্করিণীর তটে ও অপরাপর বহুতর স্থানে ইনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চণ্ডী মন্দিরের গাত্রে নির্ম্মাণ অব্দ ১৬৫৫ শক খোদিত আছে। চণ্ডীর সেবার জন্য পূজককে ৮/০ আট বিঘা ও ঢাকীকে (বাদ্যকর) ১/০ এক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। গণেশচন্দ্রের বংশপর্য্যায়ে দুর্গাচরণ, গিরিতরাম, রামসুন্দর, শ্রীমন্ত, হইতে বাবুলাল উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি কুশীদজীবি। নিঃশঙ্কনিবাসী শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর কর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। পূর্ব্বে ইনি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যাপারে রত থাকিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত উঠাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার জমীদারী প্রভৃতির বার্ষিক আয় অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা। এই গ্রামে কর পদবীধারী নফরচন্দ্র নামে আরও একজন জমীদার আছেন। এতদ্ভিন্ন সোনামুখী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মহাদানী ও কাঞ্চন নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লায়েকও এই সম্প্রদায়ের খ্যাত-নামা ব্যক্তি। শেষোক্ত ব্যক্তি বৰ্দ্ধমান মিউনিশিপালিটীর কমিসনর ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বর্দ্ধমানের আ।দ ৪২ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি
শ্রীবঙ্কুবিহারী লায়েক	ছোটবেলুনী	পাটের ব্যবসায়	চেল	দ্বারবাসিনী	শাণ্ডিল্য	কুলিন	লায়েক সমাজপতি।
শ্রীরামসুখ সেন	সুউড়ি	রসির ব্যবসায়	সেন	সুউড়ি	শাণ্ডিল্য	কুলিন	প্রামাণিক সেন।
শ্রীনফরচন্দ্র পাল	মাধপুর	কুসীদ	পাল	মাধপুর	শাণ্ডিল্য	কুলিন	প্রামাণিক পাল।
শ্রীরামতারণ দত্ত	মাধপুর	কুসীদ	দত্ত	মাধপুর	পরাশর	মৌলিক	"
শ্রীনফরচন্দ্র কর	নিঃশঙ্ক	রসির ব্যবসায়	কর	"	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরাসবিহারী লাহা	কাইগ্রাম	"	লাহা	"	মধুকোল্য	মৌলিক	"
শ্রীগোপালচন্দ্র চন্দ্র	সিঙ্গারকোন	ঘৃত ব্যবসায়	চন্দ্র	দাসপুর	"	মৌলিক	"
শ্রীবাবুলাল দে	পাঁচখেয়া	কুসীদ	দে	"	কাশ্যপ	মৌলিক	"
শ্রীধনঞ্জয় দাস	দেপুর	রসির ব্যবসায়	দাস	দেপুর	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরামলাল রক্ষিত	ভদ্রেশ্বর	ব্যবসায়	রক্ষিত	ইচ্লেবাজার	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীহংসেশ্বর কুণ্ডু	দে পাড়া	ব্যবসায়	কুণ্ডু	বটগ্রাম	সপ্তর্ষি	মৌলিক	"
শ্রীকানাইলাল রুদ্র	কাশিয়াড়া	ব্যবসায়	রুদ্র	"	শাণ্ডিল্য	"	"
শ্রীআনন্দমোহন চার	ছাতিনে	ব্যবসায়	চার	ছাতিনী	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীরাজকৃষ্ণ সিংহ	মাসডাঙ্গা	"	সিংহ	"	ভরদ্বাজ	মৌলিক	"
শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন	সাঁকো	অপ্রাপ্ত ব্যবহার	বর্দ্ধন	"	"	"	

বৈঁচির ১৪ গ্রামী।

আদি ৪২ গ্রামী তাম্বূলি হইতেই ১৪ গ্রামী থাকের উদ্ভব। শকাব্দা ১৪৬১ অব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া পরগণার সন্নিকট মৌজে দ্বারবাসিনী গ্রামে বিল্ববর সিংহ নামে জনৈক তাম্বূলি বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ষষ্ঠীবর সিংহ। ইনি পূর্ব্বে কড়ির ব্যবসায় করিতেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ছুটীপুর পরগণার এলেকায় গোকুলডাঙ্গা নামক গ্রামের নিকট কংস নদীর তীরে লোহারডাঙ্গা নামক স্থানে প্রাচীনকালে একটি হাট হইত। উক্ত লোহারডাঙ্গার হাটে নানাস্থান হইতে বলদে, গো-শকটে ও নৌকাযোগে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানি হইত। তৎকালে পয়সার প্রচলন ছিল না। সুতরাং কড়ির দ্বারাই বিনিময়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এমন কি সোণা রূপা আদি এই কড়ির দ্বারা খরিদ হইত।

* একদিন ষষ্ঠীবর সিংহের হাট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঘোর অন্ধকারে গন্তব্য পথ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বৈঁচিগ্রামে উপস্থিত হন। অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সেই গ্রামে একঘর তাঁহার স্বজাতি তাম্বূলির বাস আছে। ষষ্ঠীবর সিংহ সেই ঘোর অন্ধকারে অতি কষ্টে তথায় উপনীত হইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি বর্দ্ধমানের পালবংশ সম্ভূত তাম্বূলী। তাঁহার নাম শ্রীমন্ত পাল। এই সন্তোষজনক পরিচয় পাইয়া তিনি উক্ত পাল মহাশয়কে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহাতে পাল মহাশয় তাঁহাকে স্বজাতি বলিয়া যত্নসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পাল মহাশয়ের একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। আহারান্তে কথোপকথনকালীন পাল মহাশয় ষষ্ঠীবরকে কহেন, "মহাশয়! আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। আপনি আমার স্বজাতি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যাটিকে বিবাহ করেন, তবে কন্যাদায় হইতে আমাকে উদ্ধার করা হয়। আপনার সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে

* দামোদর দত্ত প্রামাণিক মহাশয়ের বংশীয় বৈঁচি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস দত্তের গৃহে রক্ষিত কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত।

আবদ্ধ হইয়া যারপরনাই সুখী হই।" এই প্রস্তাবে ষষ্ঠীবর সিংহ সম্মত হইলেন এবং সেই দিন শুভ বিবেচনা করিয়া শ্রীমন্তপাল অতিথিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহা আনন্দে রাত্রি গত হইল। পরদিন প্রাতে প্রতিবেশীবর্গ ও আত্মীয় স্বজন পাল মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সমারোহে বরকন্যাকে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্বারবাসিনী গ্রামে অর্থাৎ ষষ্ঠীবর সিংহের বাটীতে তাঁহার পিতা বিল্ববর সিংহ গত রাত্রের দারুণ দুর্য্যোগ ও পুত্রের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহা সমারোহে বাদ্যভাণ্ড করিয়া ষষ্ঠীবর সস্ত্রীক গৃহপ্রবেশ করিলেন। বিল্ববর দেখিলেন, পুত্র হাট করিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিল। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ষষ্ঠীবর সিংহ গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। পুত্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিল্ববর রুষ্টভাবে কহিলেন, "তুমি আমার সন্তান, আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, আমার অজ্ঞাতে তুমি বিবাহ করিয়া আসিলে, আমাকে না জানাইয়া তুমি কাহার ও কোন্ জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলে? আমি তাহার কিছুই জানিলাম না; অতএব তুমি আমার পুত্র হইয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে আমি গৃহে স্থান দিতে পারি না। পুত্রবাৎসল্য বশতঃ যদি তোমাকে স্থান দিই, তাহা হইলে আমি স্বজাতির নিকট পতিত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব; তাহা আমি ইচ্ছা করি না। অতএব স্বজাতির নিকট অপদস্থ না হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। তুমি যেখানে বিবাহ করিয়াছ, তথায় গমন কর।" এই বলিয়া বিল্ববর সিংহ আপন পুত্র ষষ্ঠীবরকে পরিত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠীবর সিংহ আপন পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়া পত্নীসহ পুনরায় বৈঁচি গ্রামে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। তৎকালে বৈঁচি গ্রামে দামোদর দত্ত নামে একজন ক্ষমতাবান্ কুলীন ছিলেন। শ্বশুর ও জামাতা তাঁহার সাহায্যে একটি পৃথক্ দল গঠন করিতে সংকল্প করিলেন। কুটুম্বদিগকে বৈঁচিতে আসিয়া বাস করিবার জন্য নানা স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা

হইল। তদনুসারে প্রথমতঃ দামোদরের পরিচিত ৬ ছয়টী পরিবার এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর আর চারিটী পরিবার ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ইহার পর রত্নাকর সিংহ বৈঁচিতে আসিয়া বাস করিলেন। সর্ব্বসমেত ১৪ চতুর্দ্দশটী পরিবার এক প্রাণ হইয়া একই লক্ষ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস যে ১৪ স্থানে ছিল, তাহার নাম প্রবন্ধের শিরোভাগে ছন্দোবন্ধে লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ১৪ স্থানের অধিবাসী হওয়ায়, আপনারা ১৪ চতুর্দ্দশ গ্রামী নামে পরিচিত হইলেন। রত্নাকর সিংহ কুল বৃত্তান্ত লিখিবার ভার প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তিনি সরকার সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বেলেড়া গ্রামে মল্লিক উপাধিধারী জনৈক তাম্বুলী বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকারে চাকরি করায়, খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তৎসঙ্গে কিছু জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা মল্লিক মহাশয় বেলেড়া গ্রামে এই সময়ে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি খাঁএর পুষ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ এবং এখনও বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন খাঁএর দেবালয় ও তাঁহার অপরাপর কীর্ত্তি উক্ত গ্রাম এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইনি মোকাম মৌগাছি হইতে যাদব সিংহ ও চন্দ্রকোনা হইতে দিবাকর সেন এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে আরও কতকগুলি তাম্বুলিকে আনাইয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ১৪ গ্রামীদের সহিত মিলিতে সম্মত হইলেন। যাদব সিংহকে কুলীন করা হইল। দিবাকর সেন ও মল্লিক প্রভৃতি ৪ ঘর উত্তম মৌলিক বলিয়া গণ্য হইলেন। যাদব সিংহ পশ্চাৎগামী কুলীন হইলেন। চন্দ্রকোনার দিবাকর সেন পশ্চাৎগামী মৌলিক হইলেন এবং বর্দ্ধমানের শ্রীমন্ত পালের যে সম্মান, মল্লিক মহাশয় সেই সম্মান লাভ করিলেন। ইহাদের গাঁই হইল না। ইহাদের উপাধি বেলেড়ার সিংহ ও বেলেড়ার সেন এই পর্য্যন্ত মান্য হইল। অতঃপর এই শ্রেণীতে দে, সেন, লাহা, রক্ষিত, চেল, গুঁই, ধুচনিসিংহ ও রত্নাকর সিংহের জ্ঞাতি হাড়গেয়ে সিংহ প্রভৃতি আসিয়া দলভুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহারা বিশেষ মান্য পাইলেন না।

চতুর্দ্দশগ্রামী সমাজ প্রবর্ত্তকের পরিচয়

	নাম	উপাধি	গাঁই	গোত্র
১।	দামোদর দত্ত প্রামাণিক		বালগোড়	ব্যাসঋষি
২।	শ্রীমন্তপাল খাঁ বর্দ্ধমানের পাল		কর্জ্জনা	
৩।	ষষ্ঠীবর সিংহ হালদার		দ্বারবাসিনী	ভরদ্বাজ
৪।	রত্নাকর সিংহ সরকার		দিপে	ভরদ্বাজ
৫।		বারসিন্নিলাহা	বেলে	মধুক্কোল্য
৬।		তেলকুপী কর	কৃষ্ণনগর	শাণ্ডিল্য
৭।		দাম্পাল রক্ষিত	জাইপাড়া	কাশ্যপ
৮।		সৃষ্টের দাঁ	দ্বারহাটা	মধুকোল্য
৯।		দেয়ার দে	ফতেপুর	কপিলঋষি
১০।		কর্ণসেন	গোপীনাথপুর	শাণ্ডিল্য
১১।		পরাশর দত্ত	চাঁদবাটী	পরাশর
১২।		গর্গঋষিসেন	বড়মুল	গর্গঋষি
১৩।		বিরুলে গুই	ঘাঁড়েশ্বরপুর	কাশ্যপ
১৪।		বটগ্রামী দত্ত	চাঁচোয়া	শাণ্ডিল্য

দামোদর দত্ত প্রামাণিকের ৪ পুত্র। ১ম যদুনাথ, ২য় বাণীনাথ, ৩য় গোপীনাথ, ৪র্থ মুরারী মোহন। ষষ্ঠীবর সিংহ হালদারের ৪ পুত্র;—১ম ভবনাথ, ২য় বৈদ্যনাথ, ৩য় চন্দ্রশেখর বা রঘুনাথ এবং ৪র্থ গোকুল। রত্নাকর সিংহ সরকারের ২ দুই পুত্র;—১ম হরি, ২য় বিষ্ণু। ইনি দ্বিতীয় পক্ষে বর্দ্ধমানের সন্নিকট ধামাশ গ্রামে মাল্যধর সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাল্যধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার সম্মান দৌহিত্রদ্বয়ের উপর অর্শে। মাল্যধরের উষ্ণীষ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া হরি ৩ পেঁচ ও বিষ্ণু ৩ পেঁচ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা না হইলে কেহ কৃতী হইতে পারে না। আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অদম্য উৎসাহের সহিত আপনাদের

শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমতঃ দলের পুষ্টিসাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য বিধবার ব্রতোপবাসাদিতে কঠোরতার বিধান করিয়াছিলেন। আচার ব্যবহার সৎ হইলে লোকসমাজে মর্য্যাদান্বিত হইতে পারা যায়, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

বৈঁচির দক্ষিণ পাড়ায় একটি মন্দির আছে। বৈঁচির সমাজ সংস্থাপনের নিদান ষষ্ঠিবর সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র গোকুল ইহার নির্ম্মাতা। প্রবেশদ্বারোপরি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে;—

শুভমস্তু।

শকাব্দা ১৫০৪।

এই অব্দ * আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ। মন্দিরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অন্তর্হিত হইয়াছেন। গর্ভগৃহ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়াছে। দেবোপাসকের ভবন জনশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় অতীত কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় অর্থবলে আপন আবাসের অন্তর্ভূক্ত করায়, সেবকের বংশকে কীর্ত্তি মন্দিরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। এই সমাজের মূলীভূত শ্রীমন্তপাল পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানরাজের নিকট কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে বৈঁচি-প্রদেশ বনাকীর্ণ ও গুণ্ডার দ্বারা উপদ্রুত ছিল। মহারাজ এই স্থান লোকালয়ের উপযুক্ত করিবার জন্য শ্রীমন্তকে আয়মা অর্থাৎ স্বল্পকরে প্রদান করেন এবং খাঁ উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তদীয় বংশধরগণ বর্গীর হাঙ্গামাকালে ধন প্রাণ লইয়া ভাগীরথীর পরপারে আবাস মনোনীত করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরি এই বংশের অধস্তন পুরুষ। নফরবাবু অত্যন্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি। কখন আলস্যে কালাতিপাত করেন না। জমীদারীর আবশ্যকীয় স্থান সমূহ স্বয়ং পরিদর্শন করেন। জমীদারী অপেক্ষা ব্যবসায়ে ইঁহার প্রসার অধিক। নীলকুঠি, চা-বাগিচা, ধান্য ক্ষেত্র হইতে আয়ের অর্দ্ধাংশ উপার্জ্জিত হয়। কৃষ্ণনগরে জলের কল নির্ম্মাণের

* ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ।

জন্য একসময় ইনি লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাজোপাধি দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতে পারিতেন। নফর বাবু অতি যোগ্য লোক। বহুকাল হইতে District Board এর Vice Chairman এর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্রদাস বাবু লৌহ ব্যবসায় শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র না পাওয়ায়, কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা বিফল করিয়াছেন। কেবল বিদেশীয় আহার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া বংশে অশান্তি আনয়ন করা হইয়াছে। কর্ম্ম সকলেরই করা আবশ্যক, কিন্তু তাহার ফলের অধিকারী সকলে হইতে পারে না। বিপ্রদাস বাবু সমুদ্র-পারে যাইয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তিনি প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। নফর বাবুর সমবেত জমীদারী ও মহাজনীর আয় ৩০০০০০৲ বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার পিতামহ অধিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। পিতা অল্পদিন মাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। নফর বাবুর ক্ষমতায় বর্ত্তমান সৌভাগ্য লক্ষ্মী অর্জ্জিত। নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগররাজের পর নফর বাবু গণনীয়। গোয়াড়ি হইতে নাটুদহ আট ক্রোশ ব্যবহিত। কৃষ্ণনগর হইতে শিবিকারোহণে বাটী যাইবার কালে ইহাকে অন্যের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। আসামে চা-বাগীচা করিয়া নফর বাবু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাঁহার পিতামহের শ্রাদ্ধে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধ কাশীধামে এক হাজার টাকা ব্যয়ে সংসাধিত হইয়াছে।

রত্নাকর সিংহের বংশধর দেবীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীলাল সিংহ কলিকাতার বণিকদিগের মধ্যে গণনীয়। ইনি এক সময় রাজধানীর সেরিফ পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। জল পথের বাণিজ্য হ্রাস হইলে উত্তর পশ্চিম হইতে তাঁহার এত দ্রব্য সম্ভার আসিত যে, এক সময় কেবল মাত্র তাঁহার তিসি লইয়া পূর্ণ রেলওয়ে শকটের এক খানি ট্রেণ আনাইতে হইত। ব্যবসায় উপলক্ষে মুঙ্গের অঞ্চলে ইনি অনেক জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে স্বকীয় জমিদারী ভিন্ন অন্যত্র হইতে তাঁহার ঘৃত আইসে না। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্শ সভার ইনি পৃষ্ঠপোষক। এতদ্ভিন্ন এই সমাজে আরও অনেকগুলি জমীদার আছেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বড়মুল নিবাসী শ্রীমনমোহন দে, কেশেডাঙ্গার শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, মহানন্দ নিবাসী শ্রীগিরীশচন্দ্র কর, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জিতপুর নিবাসী শ্রীমহেশ-চন্দ্র সিংহ, জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত গোয়ালকাঁদি নিবাসী শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত ও আমরাল নিবাসী শ্রীবীরেশ্বর সিংহ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বরস্বতীর সেবা করিয়া তাম্বূলিকুলের মুখোজ্জ্বল করি-য়াছেন। শ্রীযুগল কিশোর দে, মুনসেফ, শ্রীশিবচন্দ্র দে, হুগলীকোর্টের উকিল, শ্রীশম্ভূচন্দ্র দে, বি, এল, হাইকোর্টের উকিল। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, কৃষ্ণনগরের উকিল, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, চুয়াডাঙ্গার উকিল, শ্রীদ্বিজদাস সিংহ ভাগলপুরের উকিল, শ্রীকেদারেশ্বর দত্ত, খুলনার উকিল আমরাল নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সিংহ, মুরশিদাবাদ নিবাসী শ্রীপঞ্চানন দত্ত, খয়েরপুর নিবাসী শ্রীবসন্তকুমার সিংহ ও কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীপঞ্চানন সেন ইঁহারা সকলেই ওকালতী করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীনবীনচন্দ্রসেন ও রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীদ্বারকা-নাথ সিংহ ইঁহারা উভয়ে মোক্তারি করিয়া থাকেন। এই সমাজে ডাক্তা-রেরও অভাব নাই। বৈঁচী নিবাসী শ্রীরাধিকাপ্রসাদ সিংহ এম, বি, খাঁড়দহ-নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ এল, এম, এস, কেশেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীনৃসিংহ দাস সিংহ এল, এম, এস, উপরোক্ত সাকিমের শ্রীনিশানাথ দত্ত ইঁহারা সকলেই চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী আছেন। কেশেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীরামগোপাল দত্ত এক জন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ-নগর কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। নিস্‌ড়া নিবাসী শ্রীদাসরথীকর ও শ্রীপুলিনবিহারী কর ইঁহারা উভয়েই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ। এখনও ইঁহাদের ছাত্রজীবন। সাহাগঞ্জ নিবাসী শ্রীগজেন্দ্রনাথ দে ও আমরাল নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ ইঁহারা উভয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। এক জন বেঙ্গল আপিসে ও শেষোক্ত নামা মিলিটারি আপিসে কর্ম্ম করেন।

বৈঁচি ১৪ গ্রামী স[illegible]জের পরিচয়

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি।
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	নাটুদহ	জমিদারী	(খাঁ) পাল	”	কাশ্যপ	মৌলিক	বর্দ্ধমানের পাল
শ্রীচণ্ডীলাল সিংহ	দেবীপুর	জমিদারী	সিংহ	”	ভরদ্বাজ	কুলিন	সরকার
শ্রীমনোমোহন দে	বড়শূল	জমিদারী	দে	দেপুর	কপিলঋষি	মৌলিক	দেয়ার দে
শ্রীমতিলাল সিংহ	বৈঁচি	চাকরী	সিংহ	দ্বারবাসিনী	ভরদ্বাজ	কুলিন	হালদার সিংহ
শ্রীঅক্ষয়কুমার লাহা চৌঃ	আলিপুর	জমিদারী	লাহা	”	মধুকৌল্য	মৌলিক	বারসিঁও লাহা
শ্রীবঙ্কুবিহারী রক্ষিত	বৈঁচি	ব্যবসায়	রক্ষিত	”	কাশ্যপ	মৌলিক	দয়াল রক্ষিত
শ্রীদাশরথি কর বি, এ,	নিশড়াগোড়	আইন অধ্যয়ন	কর	তেলকুপি	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	তেলকুপি কর
শ্রীএককড়ি দত্ত	কাঁকড়াখুলি	চাকরী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীযদুনাথ দত্ত	কাশীয়াডাঙ্গা	চাকরী	দত্ত	”	পরাশর	মৌলিক	পরাশর দত্ত
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	বৈঁচি	লবণের যোজকতা	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	কুলিন	প্রামাণিক দত্ত
শ্রীহরিহর সেন	হুগলী	ব্যবসায়	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	কর্ণসেন
শ্রীপ্রসন্নকুমার গুঁই	মাহানাদ	ব্যবসায়	গুঁই	”	কাশ্যপ	মৌলিক	বিন্নলের গুঁই
শ্রীঅটলবিহারী সিংহ	চাকদহ	ব্যবসায়	সিংহ	”	ভরদ্বাজ	”	হাড়গেঁয়ে সিংহ

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি।
শ্রীকালীদাস সিংহ	বৈঁচি	চাকরী	সিংহ	„	„	„	ধুচনী সিংহ
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন	বেলেড়া	মোক্তারি	সেন	„	শাণ্ডিল্য	„	বেলেড়া ও চন্দ্রকোনার সেন।
শ্রীশিবচন্দ্র দে বি, এল,	হুগলী	ওকালতী	দে	„	„	„	„
শ্রীযদুনাথ সেন	পাঁচগড়া	চাকরী	সেন	„	„	„	„
শ্রীতুলসীদাস লাহা	বড়সুল	চাকরী	লাহা	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীদ্বারকানাথ রক্ষিত	রামচন্দ্রপুর	ব্যবসায়	রক্ষিত	„	„	„	„
শ্রীবলাইলাল চেল	বৈঁচি	চাকরী	চেল	„	„	„	„
শ্রী * *	*	*	দাঁ	„	মধুকৌল্য	মৌলিক	সৃষ্টের দাঁ
শ্রী * *	*	*	সেন	„	গর্গঋষি	মৌলিক	গর্গঋষি সেন
শ্রী * *	*	*	„	„	„	„	মৌগাছির সিংহ

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় এই সমাজের ব্যক্তিগণও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। চাকরী করিতে হইলে স্বজাতি ভিন্ন অন্যের নিকট থাকিতে প্রায় দেখা যায় না। বাঁকুড়ার জঙ্গল-মহলে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়স্থ অনেকেই রং-গালার কার্য্য করিতেছেন। সোনামুখী এই ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। তথা হইতে অনেক লাক্ষার বাবা কলিকাতার মোরান কোংর হাটে আসিয়া বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সোনামুখী গ্রামে এক ঘর বিট উপাধিধারী জমীদারের বাস ছিল। এক্ষণে তাঁহার সন্ততিগণ বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়াছেন। এই সমাজে স্বরস্বতীর সেবক অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। জয়পুর নিবাসী শ্রীহরিশঙ্কর দত্তের পিতামহ হইতে অধস্তন ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহারা সমভাবে শিক্ষিত। ইহারা তিন সহোদর-জ্যেষ্ঠ, শ্রীহরিশঙ্কর, মধ্যম শ্রীব্রহ্মানন্দ এবং কনিষ্ঠ শ্রীপরমানন্দ দত্ত। হরিশঙ্কর বাবুর পিতামহ বিষ্ণুপুর রাজার নায়েব দাওয়ান ছিলেন। ইঁহার পিতা ২৪ পরগণার কালেক্টারির সেরেস্তাদার ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কলিকাতার ভবানীপুরে বাস করেন। তাহাতে তদীয় পুত্রগণের বিদ্যোপার্জ্জনের সুবিধা হয়। তিনি কহিতেন, বিদ্যোপার্জ্জন বিনা অন্ন সংস্থাপন হইবে না, এইটী বোধগম্য হইলে অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। হরিশঙ্কর বাবু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল, উপাধি অর্জ্জন করেন। অতঃপর চাঁইবাসায় অবস্থান করিয়া ব্যবহারা জীবের কার্য্য করিতেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ইনি বিশেষ অনুরাগী। বহুকাল চেষ্টা করিয়া স্বজাতিদিগের মধ্যে কড়ি ও পান দ্বারা নিমন্ত্রণ প্রথা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পত্রের প্রচলন করেন। কুচয়াকোলে রামানন্দ দাসের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ রহিত করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য হন। সাহিত্য সেবায়ও ইঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইঁহার বিদ্যাবিষয়ক একটী প্রবন্ধ দেখা যায়। ময়ূরভঞ্জের রাজপরিবারের ইতিহাস ইঁহার লেখনী প্রসূত। এতদ্ভিন্ন "ফুল" নামে এক খানি কবিতা গ্রন্থও ইঁহার দ্বারা রচিত। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণমাধব দত্ত বি, এল, এক্ষণে

পিতার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই আদর্শ পরিবার বিদ্যাধনে অধিকারী হইয়া তাম্বূলীকুলের গৌরব ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পরমানন্দ বাবুও একজন সাহিত্যসেবী। ছাত্র জীবনে ইনি "রমণীরত্ন" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে ইহার কবিসুলভ হৃদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ বাবু হাইকোর্টের মোক্তার, পুত্র শরৎচন্দ্র উকিল ও পরমানন্দ বাবু ঐ স্থানের অনুবাদক। হরিশঙ্কর বাবু নিজে উকিল, পুত্র উকিল ও ভ্রাতুষ্পুত্র উকিল। এই সমাজে ইঁহাদিগের অপেক্ষা অর্থ বলে বলীয়ান্ অন্য কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু বংশ পরম্পরা বিদ্যাবলে বলীয়ান্ এই পরিবার ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন দত্ত ময়ূরভঞ্জে ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ আশ বি, এল, আলিপুরে ওকালতী করিয়া সামাজিক সম্মানের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন।

এই সমাজের মধ্যে "জিজ্ঞাসা পড়ার খাতা" প্রাপ্ত হওয়া গিয়া তাহাতেই আমরা পরশুরামের আর একটি কবিতা পাইয়াছিলাম।

প্রশ্ন। শ্রীকেনে কহিলে আগে নাম কহ পিছে।
শ্রীএর সহিত নাম কোন্ শাস্ত্রে আছে॥
শ্রী বা কাহারে বলে নামের হয় কেহ।
লঘু গুরু দুজনাকে নির্ণয় করে দেহ॥
উত্তর। জন্মিলেন লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র মন্থনে।
তেকারণে শ্রীনাম বলয়ে সর্ব্বজনে॥
দ্বিজ পরশুরাম কহে শুন মহাশয়।
স্ত্রীপুরুষে দুজনাতে গুরু শিষ্য হয়॥

বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ তাম্রকূট ব্যবসায়ী মৃত শ্রীপতি কর এই সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা তাম্বূলী সমাজ নামক মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৪২ গ্রামী তেলকুপির কর—মৌদ্গল্য গোত্রীয় ৺শ্রীপতি করের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ পরিচয়।

ইনি ৺গঙ্গানারায়ণ করের পুত্র; ইঁহার মাতার নাম শ্রীমতী হরমোহিনী

দাসী, (এখনও জীবিতা)। ইনি সন ১২৫০ সালে বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতা তাদৃশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। মৃত্যুকালে সন্তানগণের ভরণ পোষণ জন্য কোনও রূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইনি বিদ্বান্ ছিলেন না; কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। একমাত্র সঙ্গীত ব্যতীত, শ্রীপতি পিতার আর কোন বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার প্রতিপালনের ভার শ্রীপতির উপর পড়িল। পৈতৃক সম্পত্তি কিছুমাত্র ছিল না; ব্যবসায় বাণিজ্যেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে লেখা পড়া না শিখিয়া, জাতীয় ব্যবসায়ে উপেক্ষা করিয়া, গীত বাদ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় নিজের উদরান্নের সংস্থান ও তদুপরি পরিবার প্রতিপালন অন্য লোকের পক্ষে যে, দুর্বিষহ যন্ত্রণাপ্রদ ক্লেশকর ও চিন্তার কারণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু চিন্তা কাহাকে বলে, শ্রীপতি আশৈশব তাহা জানিতেন না; কোনরূপ ক্লেশকরী চিন্তাও কখনই উঁহার মনে উদিত হয় নাই। আজীবন তিনি মনের আনন্দে ছিলেন। তাঁহার আর একটী অমানুষিকী শক্তি ছিল, তাঁহার কথোপকথনে অত্যন্ত বিষাদিত ও তাপিত প্রাণও ক্ষণকালের জন্য সংসারের দুঃখ শোক তাপ ভুলিয়া, এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিত। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, লোকে বলিত—"শ্রীপতি মরা মানুষকে হাসাইতে পারে"।

যাহা হউক, শ্রীপতি নিজের এবং পরিবারের প্রতিপালনের জন্য এক দিনের তরে চিন্তিত হন নাই।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; এক্ষণে তথায় আর তাদৃশী সঙ্গীতচর্চ্চা হয় না সত্য; কিন্তু শ্রীপতির বাল্যাবস্থাকালে বিষ্ণুপুরের প্রতিগৃহে সঙ্গীতচর্চ্চার অতিসুন্দর বন্দোবস্ত ছিল; ২।৪টী অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ যাত্রার দলও ছিল। শৈশবকালে ইনি কোন একটী যাত্রার দলে বালক সাজিতেন; পরে যৌবনে তিনি সং সাজিতে বেশ শিখিয়াছিলেন। সন ১২৭৯ সালে তিনি কোন একটী যাত্রার দলের আসামী হইয়া, পঞ্চকূটাধিপতির রাজধানী কাশীপুরে গান করিবার জন্য, গমন করেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর।

অন্য লোকে বলে যে, শ্রীপতি গান করিবার জন্য কাশীপুরে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, লক্ষ্মী দেবীর সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গে আনয়ন জন্য শ্রীপতি কাশীপুরে গমন করিয়াছিলেন। কাশীপুর গমন হইতেই তাঁহার ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে বিষ্ণুপুর যেমন তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ, তখন কাশীপুরও সেইরূপ ছিল; কিন্তু কাশীপুরের রাজার খাসের তামাক রাজা ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পাইতেন না।

শ্রীপতির গীতাভিনয়ে কাশীপুরাধিপতি তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে কতকখানি খাস তামাক উপহার দেন এবং তৎসঙ্গে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী শ্রীপতিকে শিখাইয়া দিবার জন্য তামাক প্রস্তুতকারীকে আদেশ করেন। শ্রীপতি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, পর বৎসর সন ১২৮০ সালে নিজ বাটীতে তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই শ্রীপতির তামাক চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও তৎসঙ্গেই প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তামাকের কাট্‌তী দেখিয়া, তিনি অধিকতর উৎসাহে নিজ কারখানার আয়তন বাড়াইলেন এবং বর্দ্ধমান, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বন্দরে তামাকের দোকান খুলিয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন অবস্থাতেও তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন,—দেব, দেবী ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল।

তিনি পরোপকারীও ছিলেন—পরদুঃখ অপনয়ন জন্য বা দুর্ব্বিপাকের প্রতীকারার্থ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালের দুর্নিবার শক্তিবশে তিনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের রীতিমত ব্যবহার করিবার সময় পাইলেন না; সন ১৩০৩ সালের ১৬ই শ্রাবণে শোকার্ত্ত জননীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, নিঃসন্তান অবস্থায় পরকালের শান্তিনিকেতনে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সম...র পার...

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য-সূচক উপাধি —
শ্রীহরি শঙ্কর দত্ত বি, এল,	জয়পুর	ওকালতী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য		বটগ্রামী দত্ত
শ্রীগণেশচন্দ্র দে	কুশমতী	”	দে	”	”	”	”
শ্রীনটবর পাল	চৌবেট্যা	”	পাল	”	”	”	”
শ্রীহরিহর সেন	শ্যামনগর	”	সেন	”	”	”	”
শ্রীকেদারনাথ আশ বি, এ,	মদনমোহনপুর	”	আশ	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	”	বটগ্রামী আশ
শ্রীরামানন্দ দাস	বিষ্ণুপুর	”	দাস	”	”	”	”
শ্রীরামপ্রসাদ নাগ	উপরজবা	”	নাগ	”		”	”
শ্রীহারাধন নন্দী	বদনগঞ্জ	ব্যবসায়	নন্দী	শাঁচড়া	যোগ্যঋষি	”	শাঁচড়ার নন্দী
শ্রীশিবচরণ কুণ্ডু	বদনগঞ্জ	”	কুণ্ডু	”	”	”	”
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুঁই	সাহানপুর	”	গুঁই	”	”	”	”
শ্রীরামচাঁদ রক্ষিত	ইন্দাস	”	রক্ষিত	”	”	”	”
শ্রীঅযোধ্যানাথ চন্দ্র	বারপেট্যা	”	চন্দ্র	”	”	”	”
শ্রীআনন্দচন্দ্র কর	আমদান	”	কর	”	”	”	”
শ্রীপার্ব্বতীচরণ পিরি	রামজীবনপুর	”	পিরি	”	”	”	”
শ্রীশ্রীরাম নন্দন	চৌবেট্যা	”	নন্দন	”	”	”	”
শ্রীভৈরব ভুঁঞে	তালডাংরা	”	ভুঁঞে	”	”	”	”
শ্রীশ্রীধরচন্দ্র চৌধুরী	বিষ্ণুপুর	”	দত্ত	”	”	”	”

বাঁকুড়ার রাজহাটী।

.৯৪। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাতগেছে, পাঁচড়া, বটগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এই সমাজের আদি বাসস্থান ছিল। মুসলমান বাদসাহের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া প্রথমে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর পরগণার মধ্যে রাজহাট গ্রামে বাস করেন। অনেকে আবার মহারাষ্ট্র অর্থাৎ বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া রাজহাট পরিত্যাগ করতঃ রাজগ্রাম, নড়রা, বালগুমা, ছাতনা প্রভৃতি গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। বর্দ্ধমান হইতে রাজহাটে বাস হেতু এই সম্প্রদায়কে রাজহাটী তাম্বূলী কহে। রাজহাটী তাম্বূলীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—৬৪,৪৯,৬০ ও ২০০ ঘরে। ইহার কারণ এই অনুমিত হয় যে, প্রথমে সাতগেছে হইতে আসিবার কালীন যে কয়েক ঘর এক সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই সংখ্যার আখ্যায়ে এক একটি পৃথক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪৯ ও ৬৪ ঘরে, পরস্পর আদান প্রদান চলে এবং ৬০ ও ২০০ ঘরেও আদান প্রদান চলিয়া থাকে। নৈকট্য-হেতু কোন কোন স্থলে ৪৯ ও ৬৪ ঘরের সহিত ২০০ ঘরের আদান প্রদান চলিতে দেখা যায়। এই সমাজের তাম্বূলী-গণ ১৬২ ঘ'রে নামেও আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মসূত্রে এক্ষণে পুরুলিয়া ও তদন্তর্গত নানা স্থানে বসবাস করিতেছেন।

পুরাকালে বাঁকুড়ার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে একটি অনাদি শিবলিঙ্গ ছিল। তত্রত্য অধিবাসী বনমালী দত্ত মহাশয়ের একটি গাভী প্রত্যহ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করতঃ উক্ত শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ বর্ষণ করিত। বনমালী দত্ত গাভীর দুগ্ধ না দিবার কারণ অনুসন্ধান জন্য একদিন ঐ গাভীর অনুসরণ করেন এবং বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করেন। পরে স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীস্থ ১৬২ ঘরের অনুমতি লইয়া তন্মধ্যে ১৪ জন লোক এই হরিহরনাথ মহাদেবের সেবাইত নিযুক্ত হন। ইহারা ১৪ ভাই নামেও কথিত হন। তাঁহাদের বংশধরগণও পূর্ব্বোক্ত মহাদেবের সেবাদি করিয়া থাকেন ও সেই সম্মান উপভোগ করেন। বাঁকুড়া জঙ্গ

আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমাজে যে কয়েকটী শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই দত্ত পরিবার ভুক্ত। গিরীশ বাবু ব্যতীত রাণীগঞ্জ নিবাসী শ্রীশশীভূষণ দত্ত ও আড়রা নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ইহারা উভয়েই সুশিক্ষিত। এক জন রাণীগঞ্জে ওকালতি করেন। ইনি বি, এল, উপাধিধারী ও অক্ষয় বাবু স্কুল সমূহের সহকারী পরিদর্শক। ইনিও বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ। এতদ্ভিন্ন কুণ্ডু বংশেও কয়েকটী শিক্ষিত লোক আছেন। তন্মধ্যে শ্রীত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু, শ্রীহৃদয়নাথ কুণ্ডু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথের এখনও ছাত্রজীবন। ত্রৈলোক্যনাথ ও হৃদয়নাথ উভয়েই মোক্তারি করিয়া থাকেন। অন্যান্য সমাজের তুলনায় এই সমাজে জমীদারের সংখ্যা অল্প। রাজগ্রাম নিবাসী কুণ্ডু পরিবারই জমীদার শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ ও কেদারনাথ কুণ্ডু বর্ত্তমান আছেন। জমীদারী ভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্যে ইঁহাদের খ্যাতি আছে। নড়রা নিবাসী অনন্তলাল দেও এই সমাজের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি।

উপরোক্ত বনমালী দত্তই হরিহরনাথের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজহাটী বটগ্রামী দত্তদিগের আদি পুরুষ। যৎকালে ইনি প্রথম রাজহাটে বসতি করেন, সেই সময় অর্থাৎ সাতগেছে হইতে আসিবার কালীন দণ্ডপানি মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী৺ হরিহরনাথ ঠাকুরই রাজহাটী তাম্বূলীদিগের কুল দেবতা। এই সমাজের মধ্যে যখন কোন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুষ্করিণী, কূপ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা অথবা অপরাপর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীশ্রী৺ হরিহরনাথের নিত্য সেবা ও গাজন প্রভৃতি পর্ব্বের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই টাকা করিয়া আদায় হয় এবং ঐ টাকা উপরোক্ত দেব সেবায় ব্যয় হইয়া থাকে।

ইহাদের ন্যায় ২০০ ঘরেদেরও বাঁশকেটে গ্রামে শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জিউ নামক বিগ্রহ আছেন এবং রাজহাটীদিগের মত প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে তাঁহারাও দুই টাকা করিয়া শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জিউর সেবার জন্য দিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, কুটুম্বের অভিসম্পাতে পুনকুটীর দত্ত বংশ নিঃসন্তান। কুটুম্বর্গকে নিমন্ত্রণকালে ঢেঁটরা দ্বারা আহ্বান করিবার ভার উপরোক্ত দত্ত

দিগের প্রতি অর্পিত হয়। একদা তাঁহারা আপনাদিগের সম্মান প্রদর্শনার্থ মিছামিছি ঢেঁটরা দিয়া অনেক কুটুম্বকে একত্র করিয়াছিলেন। আহূত কুটুম্ববর্গ ইঁহাদিগের মিথ্যা চাতুরী অবলোকনে সকলে অভিসম্পাত করেন। তদবধি এই বংশ নিঃসন্তান।

৺ নবীনমোহন দত্ত এক জন বিখ্যাত লোক ছিলেন। সন ১১৯০ সালে ইনি বাঁকুড়া মোকামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম সৃষ্টিধর দত্ত। ইনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে বাঁকুড়া একটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বলদের পৃষ্ঠে ছালা চাপাইয়া নানা প্রকার শস্য, তৈল, লবণ, মৃত প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভার বেপারীরা আমদানী করিত এবং এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য সকল অপরাপর স্থানে বিক্রয়ার্থ চালান দিত। এই সকল বেপারিদিগের অবস্থানের জন্য ৺ নবীন-মোহন দত্ত আবাস স্থান প্রস্তুত করাইয়া দেন। অদ্যাপি ঐ স্থান বেপারিহাটা নামে খ্যাত। ঐ সকল বেপারিদিগের নিকট হইতে বাসা ভাড়া, তদ্ভিন্ন নবীন মোহন নিজেও তাহাদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া অত্যল্প-কাল মধ্যেই প্রচুর লাভবান হন। ইনি ব্যবসায় দ্বারা যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সৎকার্য্যে ব্যয়ও তাঁহার ততোধিক ছিল। তিনি নিরন্ন, নিরাশ্রয় ও বস্ত্রহীনকে অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদানে যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ-মোচনে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার আরও একটী বিশেষ গুণ ছিল। যখন তিনি বেপারিহাটার কুঠি হইতে মধ্যাহ্ন ভোজন জন্য বাটীতে আসিতেন, তখন সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে সকল স্বজাতীয় কুটুম্বকে দেখিতে পাইতেন, বিশেষতঃ যাঁহারা পল্লীগ্রাম হইতে ব্যবসায়োপলক্ষে বাঁকুড়া সহরে আসিতেন, তাঁহাদিগকে সাদরে মধুর সম্ভাষণে আপন বাটীতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন। শুনা যায়, প্রত্যহ তিনি ২০।২৫ জন কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। বাঁকুড়াবাসী অধিকাংশ লোকই ইঁহাকে সম্মান করিত এবং ইঁহার পরোপকারিতা গুণ থাকায়, বহুতর লোক তাঁহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ ছিল। তিনি এস্থানে এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সহসা কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহস করিত না। বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া বেপারিহাটার সন্নিকট একটী সুবৃহৎ

বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইঁহার আরও একটী উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ। সন ১২৪৯ সালে উপরোক্ত রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ সহস্র টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সময় ইনি বিভিন্ন দেশ হইতে উপযুক্ত কুলাল সকলকে আনাইয়া সহস্র সহস্র মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দিরের সর্ব্বস্থানে সুচারুরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। ইহার রাসোৎসব দর্শনার্থ দূরতর পল্লী ও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য লোক এই বাঁকুড়া সহরে সমবেত হইত ও তন্নিবন্ধন লোকের এতই জনতা হইত যে, বাঁকুড়া সহরের প্রশস্ত পথে ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া সুকঠিন হইত। খাদ্য দ্রব্যাদি সাতিশয় দুর্লভ ও মহার্ঘ হইয়া উঠিয়া ছিল। যে সময় বাঁধ প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ সময়েও ইনি যথেষ্ট ব্যয় স্বীকার করিয়া স্থানীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে সুচারুরূপে ভোজন করাইয়া পাথেয় ও দক্ষিণা-দানে তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বাঁকুড়াবাসী সমস্ত কুটুম্ব মণ্ডলীকে ও সকল বর্ণের লোককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইনি - রাজহাটী তাম্বূলীগণের কুলগৌরব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, উন্নতমনা লোক এই সম্প্রদায়ে অতি অল্পই দেখা যায়। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরেরা উপরোক্ত কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে ও স্মরণে আপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিয়া থাকেন।

ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে আর একটি কৌতূহল বিশিষ্ট আখ্যায়িকা স্মরণ হওয়ায় লিপিবদ্ধ করা গেল। যে সময় ইনি রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ সময় বাঁকুড়াবাসীদিগের মধ্যে দুইটী দল ছিল। এক দলে এই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত তাম্বূলীগণ, অপরদলে বাঁকুড়া সহরের সাত মহলের বিভিন্ন জাতীয় লোক ছিল। তাঁহারা ৺ নবীনমোহন দত্তের অনুকরণে সকলে একত্র হইয়া একটি দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ৺ গৌরমোহন দত্ত ও জনৈক কর্ম্মকার তাহার প্রধান নেতা ছিলেন। পরস্পর ঈর্ষাবশতঃ একদল অপর দলকে অপ্রতিভ ও অপদস্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একদা দোল পর্ব্বোপলক্ষে সাত মহলের লোক সকল ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণবর্গকে নিমন্ত্রণ করতঃ তদনুযায়ী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া-

ছিলেন। ৺নবীনমোহন দত্ত পূর্ব্বাহ্ণে এই সংবাদ পাইয়া যাহাতে সাত মহলের লোক সকল এই সমারোহ কাণ্ডে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও সাধারণের নিকট অপদস্থ হয়, তাহার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি অপর কয়েক জন ব্রাহ্মণের দ্বারা দূরতর গ্রামের আরও বহু শত ব্রাহ্মণকে সাত মহলের দোল-তলায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, ও সকলের অজ্ঞাতে আপন কুঠি বাটীতে ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর যখন বিভিন্ন গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-বর্গ দলে দলে আসিয়া দোলতলায় উপস্থিত হইলেন, তখন সাতমহলের লোক সকল ব্রাহ্মণদিগের এতাধিক জনতা ও সংখ্যা দেখিয়া ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে পুনরায় আহারীয় দ্রব্যের নূতন বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে এতাধিক লোকের খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা বড়ই সুকঠিন হইল। ব্রাহ্মণগণ একে পথশ্রান্ত, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সকলেই অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করতঃ দোলমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণকে যথোচিত তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ৺নবীনমোহন দত্ত সুযোগ বুঝিয়া অপরাহ্ণ সময়ে স্বয়ং সেই সকল ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সম্মুখীন হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে কাতর ও দীন বচনে ঐ সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবর্গকে আপন কুঠিবাটীতে ভোজনার্থ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণও তাঁহার বিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন ও তাঁহার কুঠি বাটীতে আসিয়া স্বপরিতোষে ভোজন করিলেন। ৺নবীনমোহন এইরূপে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিয়া দক্ষিণা ও পাথেয় দানে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। যাহাহউক স্বোপার্জ্জিত ধনের এরূপ সদ্ব্যয় অতি অল্পই দেখা যায়। সন ১২৬২ সালে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি কালকবলিত হয়েন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঁধ ও রাসমঞ্চ অদ্যাবধি সুনামের যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে।

বাঁকুড়ার রাজহাটী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি
শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল,	বাঁকুড়া	ওকালতী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	„	বটগ্রামী দত্ত
শ্রী * * দরিপা	বাঁকুড়া	„	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীকেশবলাল দত্ত	বালগুমা	„	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	„	গজস্কন্ধ দত্ত
শ্রীবনমালি দত্ত	রাজগ্রাম	„	দত্ত	বড়েয়া	পরাশর	„	বড়েয়ার দত্ত
শ্রীঅনন্তলাল দে	নড়রা	„	দে	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীনদেরচাঁদ পাল	রাজগ্রাম	„	পাল	„	কপিলঋষি	„	„
শ্রীনারাণচন্দ্র পাল	ভেলাই ডিহা	„	পাল	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীহৃদয়নাথ সেন	পুরুলিয়া	„	সেন	„	কাশ্যপ	„	কর্ণপুরে সেন
শ্রীগোপীনাথ খাঁ	হাটগ্রাম	„	সেন	„	কাশ্যপ	„	খাঁ
শ্রীকেদারনাথ কুণ্ডু	রাজগ্রাম	জমিদারী	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	„	„
শ্রীক্ষেত্রমোহন চৌধুরি	কালাবুতি	„		„	মধুকোল্য	„	„
শ্রীকৈলাসচন্দ্র চেল	রাজগ্রাম	„	চেল	„	শাণ্ডিল্য	„	„

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী।

অষ্টগ্রামী তাম্বূলীগণ কটকী তাম্বূলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ কটকের তাম্বূলী নামে কোন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের তাম্বূলীগণ উড়িষ্যার তাম্বূলী বলিয়া খ্যাত। অবশ্য যখন মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান উড়িষ্যার অন্তর্গত ও নিকটবর্ত্তী, তখন যে কটকী তাম্বূলীগণ বঙ্গদেশীয় তাম্বূলীগণের সংস্রব না রাখিবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। অষ্টগ্রামীরা যদিও কটকী তাম্বূলী বলিয়া পরিচিত, তথাপি দক্ষিণে শেষ সীমা বালেশ্বর পর্য্যন্তই ইঁহাদের আদান প্রদান চলিয়া থাকে। বালেশ্বরের দক্ষিণে অর্থাৎ কটক বা পুরিতে ইহাদের কুটুম্ব বিরল। মেদিনী-পুর অষ্টগ্রামী সমাজের প্রধান স্থান। কারণ এই স্থানেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। মেদিনীপুরস্থ তাম্বূলীগণ একত্রিত হইয়া এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসরে ঐ দেবায়তন সম্পূর্ণ হয়। ১২৫৮ সালের কার্ত্তিক মাসে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১২৬২ সালের ১৫ই শ্রাবণ রবিবার শেষ হয়। আরব্ধ ও পরিসমাপ্তির তারিখ এবং নির্ম্মাতার নাম মন্দিরনিম্নে দেখা যায়। ইছাপুর নিবাসী শ্রীমাধবচরণ মিস্ত্রি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের উপরিভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে।

"জগন্নাথ নিবাসার্থং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরং।
জগন্নাথ পদাব্জাপ্ত্যৈঃ তাম্বূলিনিকরৈঃ কৃতঃ॥"
শুভমস্তু শকাব্দা * *

এই সমাজের প্রত্যেক বিবাহে অথবা গার্হস্থ্য উৎসবে অগ্রে জগন্নাথ দেবের জন্য কিছু দান করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে "সন্দেশের কড়ি" কহে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কোন দুষ্কার্য্য করিলে সামাজিক নিয়মে তাহার অর্থদণ্ড হয়। ঐ দণ্ডিত অর্থও জগন্নাথ দেবের সেবায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সন্দেশের কড়ি লইয়া বিষম গোলযোগ ঘটে।

এই সমাজ ২২ স্থান লইয়া গঠিত। চলিত ভাষায় স্থানকে থান কহে।

ক্রিয়া-কলাপ কালে সেই সেই স্থানীয় কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। উপ-রোক্ত ২২ স্থানের মধ্যে ১৭ স্থান বাঙ্গালার অন্তর্গত এবং ৫ স্থান উড়িষ্যার অবস্থিত। সুবর্ণ রেখার পরপার হইতে উড়িষ্যা আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে ২২ স্থানের নাম ও তত্রত্য জনৈক অধিবাসীর সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। যথা:—

১।	ঘাঁটাল	শ্রীরামেশ্বর মল্লিক।
২।	চন্দ্রকোনা	„ ত্রৈলোক্যনাথ মল্লিক।
৩।	রাধানগর	„ বাবুলাল দে।
৪।	চাঁইপাট	„ মহেন্দ্রনাথ কর।
৫।	বালিদাওয়ানগঞ্জ ...	„ বেণীমাধব গুঁই।
৬।	থানাকুল	„ সীতানাথ লাহা।
৭।	সেমহাট	„ গোঁসাইদাস রক্ষিত।
৮।	গোপীগঞ্জ	„ দেবেন্দ্রনাথ দে।
৯।	বোরজো	„ শশীভূষণ দে।
১০।	খাঁড়াল বনপাটনা ...	„ ব্রজনাথ দে।
১১।	ক্ষীরপাই	„ যোগেন্দ্রনাথ গুঁই।
১২।	দাসপুর	„ সতীশচন্দ্র দে।
১৩।	বাসদেবপুর	„ রামেশ্বর দে।
১৪।	নিমতলা	„ বিহারীনাথ নন্দী।
১৫।	নোয়াদা	„ প্রাণকৃষ্ণ দে।
১৬।	প্রতাপপুর	„ মহেশচন্দ্র আশ।
১৭।	হরিণাডাঙ্গী	„ গৌরহরি সেন।
১৮।	গয়েশপুর	„ রামচরণ কর।
১৯।	তমলুক	„ ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।
২০।	মোহনপুর	„ যোগেন্দ্রনাথ সেন।
২১।	মলিঘাটী	„ হরেরাম রক্ষিত।
২২।	মহানালার গড় ...	* * *

১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অপেক্ষা সকল বিষয়েই ইঁহারা পশ্চাৎগামী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই সমাজে বিরল। বালেশ্বর নিবাসী শ্রীজ্যোতীন্দ্র

নাথ কর, তমলুক নিবাসী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত ও মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত ইঁহারা এই সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত নামা জ্যোতীন্দ্র বাবু নীলগিরিতে মোক্তারি করিয়া থাকেন। তমলুকের প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে ত্রৈলোক্য বাবুকে উৎসাহী দেখা যায়। ইনি বিলুপ্ত তমলুক পত্রিকার সম্পাদক ও তমলুক ইতিহাসের প্রণেতা। অধুনা ইনি জমীদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্রতী আছেন। দুর্গাদাস বাবু মেদিনীপুর মিউনিশিপালিটীর কমিশনরের ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাহাহউক এই সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব থাকিলেও, জমীদারের তাদৃশ অসদ্ভাব নাই। বালেশ্বরের রাজা ও মেদিনীপুরের মল্লিকদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোক অন্য সম্প্রদায়েও বিরল। বিশেষতঃ রাজোপাধির সম্মান কেবল এই সম্প্রদায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সমাজে যে কয়েক জন জমীদার আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই নিবাস মেদিনীপুর। পূর্ব্বোক্ত মল্লিক পরিবারের মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীযোগেন্দ্রনাথ, জ্যোতীন্দ্রনাথ, যামিনীনাথ ও রত্নেশ্বর মল্লিকই খ্যাতনামা। এতদ্ব্যতীত শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত ও রামচরণ দে উভয়েই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। মল্লিক উপাধিধারী শ্রীরত্নেশ্বরের জমীদারী ও তাহার আয় স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন অপর তিন জনের সমবেত সম্পত্তি। আয় অন্যূন ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকা। বালেশ্বর রাজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্পত্তির আয়ও লক্ষাধিক মুদ্রা হইবে।

কলিকাতার জোড়াসাঁকো নামক পল্লীতে এই সমাজের ৫০ ঘর লোকের বসতি। বড়বাজারস্থ মনোহর দাসের চকে তাঁহারা লৌহ ব্যবসায়ে লিপ্ত।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত "জিজ্ঞাসা পড়ার খাতার" ন্যায় উড়িয়া অক্ষরে লিখিত এক খানি কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে। মায়াপুর হইতে আগত বাঙ্গালীরা যে কুলজী সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অনুলিপি সন্দেহ নাই। আমরা ইহাতে দেখিলাম;—মালাধর সেন ৯৭২ সালে গয়েশপুর পরিত্যাগের সময় সম্মানিত ছিলেন। ৯৭৬ সালে মায়াপুরে ধর্ম্ম ঠাকুর স্থাপনকালে যে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অষ্টভাইয়ের মধ্যে গণ্য হন নাই। সুতরাং তাঁহার তখন সম্মান তিরোহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম

ঠাকুর বৌদ্ধমতের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনটীর অন্যতর দেবতা। রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন;—

"শ্রীধর্ম্ম দেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।"

ধর্ম্মের ধ্যান যে প্রকার দেখা যায়, পৌরাণিকদিগের কোন ধ্যেয় তদ্রূপ হইতে পারে না;—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নো পাদঃ
নাকারো নৈবরূপং নচভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈ র্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথম্
ভক্তানাং কামপুর স্থরনর বরদং চিন্তয়েত্ শুন্য মূর্ত্তিং।"*

মায়াপুর জাহানাবাদের অতি নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে, তাম্বূলী-দের এখানে বাস নিষিদ্ধ। কিন্তু এই জাতিকে এক্ষণে তথায় ব্যবসায়ের জন্য অবস্থিতি করিতে দেখা যায়।

রক্ষিত বংশীয় জন্মেজয় মল্লিক।

অষ্টগ্রামী তাম্বূলিদিগের মধ্যে ধনে বিখ্যাত জমীদার জন্মেজয় মল্লিক দ্বিতীয় স্থানীয়। বালেশ্বর রাজের নিম্নেই ইনি আসন পাইতে পারেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ দাতারাম মল্লিক। প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুতব-পুর পরগণার এলাকাধীন মলিঘাটি গ্রামে ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল। অনু-মান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা ও ব্যবসায় প্রভৃতিতে অসুবিধা হওয়ায়, তাঁহার পিতা উপরোক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ মেদিনীপুর সহরে আসিয়া বসবাস করেন। পিতা তাদৃশ ধনবান্ ছিলেন না। সামান্য মুদির দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময় মেদিনীপুরের জঙ্গল-মধ্যে মহারাষ্ট্রদিগের একটী দুর্গ ছিল। দুর্গ হইতে সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্র বা

* Discovery of Living Buddhism in Bengal By pandit Hara Prasad Sastri M. A.

বর্গীগণ বহির্গত হইয়া নানা স্থানে লুণ্ঠন করিত। ঐ দুর্গ গড় মান্দারণ নামে অভিহিত। ইংরাজগণ বর্গীদিগকে দমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে এখানে সৈন্য প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হওয়ায়, ইংরাজ রাজ কর্ণেল-গোলা, সিপাহি-বাজার প্রভৃতি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং ক্রমে বর্গীদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া তাহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। উপরোক্ত দুর্গে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ সেনা রক্ষিত হয়। ঐ সময় ৺ দাতারাম মল্লিক ও ৺ ভগীরথ রক্ষিত প্রভৃতি কয়েক জন সমশ্রেণীর তাম্বূলি মিলিয়া ইংরাজ সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ করিতেন। তাঁহারাও যাইবার কালে ঐ সকল রসদের মূল্য পরিবর্ত্তে প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া অনেক অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। এইরূপে তাঁহারা কিছু ধন সঞ্চয় করেন। যাহাহউক তৎকালে ৺ দাতারাম মল্লিক শিশু জন্মেজয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করেন। জন্মেজয় শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতার ব্যবসায় ও তেজারতি দেখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ৺ দাতারাম মল্লিক অত্রস্থ ৺ প্রেমচাঁদ দের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। কিছুদিন পরে দাতারাম পাঁচ বা ছয় শত টাকা মাত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ সময় জন্মেজয়ের বয়ঃক্রম ২০।২৫ বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর, জন্মেজয় ঐ সামান্য অর্থ সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ টাকা খাটাইয়া ব্যবসায় ও তেজারতিতে দ্বিগুণ লাভ করেন। যে সময় দাতারাম মল্লিক মলিঘাটী হইতে সদরে আইসেন, সেই সময় ৺ ভগীরথ রক্ষিতও কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মেদিনীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। উভয়েই এক জাতীয় ও এক স্থানীয় ছিলেন। অবস্থাও উভয়ের সমান ছিল। একই উপায়ে উভয়ে ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন ও সমভাবে কৃতকার্য্যও হয়েন। দাতারাম ও ভগীরথ উভয়ের যেরূপ সখ্যতা ছিল, তাহাদের পুত্রদিগের মধ্যেও তদ্রূপ সাতিশয় প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছিল।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, জন্মেজয় মল্লিক প্রথম অবস্থায় এতাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন যে, কি পিতৃসঞ্চিত কি স্বোপার্জ্জিত অর্থের মধ্য হইতে যে কোন কারণেই হউক না কেন, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে কাতর হইতেন।

এইরূপ ব্যয়কুণ্ঠতা-হেতুই তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। যাহাহউক, জন্মেজয় সঙ্গতিশালী হইয়া নানা প্রকার সৎ-কার্য্যে উপরোক্ত বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, ক্রিয়াশীল, মিতব্যয়ী ও পরিণামদর্শী লোক ছিলেন। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় যে জমীদারী ক্রয় করিতে হইবে, স্বয়ং তাহা বিশেষ রূপে দেখিয়া শুনিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। ইনি যে সকল স্থানে জমীদারী ক্রয় করেন, প্রত্যেক জমীদারীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব স্থাপনা করিয়া যান এবং বসতবাটীর সম্মুখে কাশী হইতে দ্বাদশটী শিব আনাইয়া দ্বাদশ শিব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৮০ সালে শিবালয় ও রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১২৮৩ সালের ২২শে পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হয়। উদ্যানবাটীর মধ্যেও ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবালয় আছে। বাটীর সন্নিকটে (মীরবাজার) আরও দুইটী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত ধনেশ্বরপুর গ্রামে তিনি ১০৮টী অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তুলা-পুরুষ-দান উপলক্ষে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন ও নানা দিগেদশ হইতে অধ্যাপকমণ্ডলীকে আনাইয়া যথেষ্ট সমাদরে বিদায় ও পাথেয় প্রদানে তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তুলার সময় অন্য অন্য ধাতু অপেক্ষা রৌপ্যই অধিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সার্দ্ধ নব সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, কুটুম্ব, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোককেই সযত্নে ভোজন করাইয়া অশেষবিধ দানাদি করিয়াছিলেন। তুলা, শিব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা একই দিনে সমাহিত হয়। আবার ঐ দিনেই ইঁহার মধ্যমা কন্যার বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে কয়েক দিন যাবৎ দান ও ভোজনাদিতে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বাটীতে কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার ও অপরাপর স্থানের দেব সেবার সুবন্দোবস্ত আছে। লোকহিতকর প্রত্যেক কার্য্যে ইঁহার মুক্তহস্ততা দেখা গিয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ স্থানে স্থানে পথ, ঘাট, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব, রাস, জগদ্ধাত্রী, স্বরস্বতী, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোল, শিবরাত্রি প্রভৃতি যে সময়ের যে পূজা, সকলই সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যাহাহউক, উল্লিখিত কীর্ত্তি সকল আজও তাঁহার

স্বনামের পরিচয় দিতেছে। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর, ২য় যোগেন্দ্রনাথ, ৩য় যদুনাথ, ৪র্থ জ্যোতীন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ যামিনীনাথ। সন ১২৯৩ সালে চৈত্র মাসে জন্মেজয় পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বরও ১৩০৭ সালের ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় পুত্র যদুনাথ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং অনুমান ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলিত হন। ব্যাধিগ্রস্ত থাকায় ইনি পিতার সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। জন্মেজয় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জীউর নামে উইল করিয়া যান। এমন কি বসতবাটী পর্য্যন্ত দেবস্ব করিয়া যান। তদনুসারে আজ পর্য্যন্ত জমীদারীর দাখিলা রাধাকান্ত জীউর নামেই লিখিত হইয়া থাকে। সমস্ত সম্পত্তির আয় সর্ব্বাগ্রে দেব সেবার জন্য রক্ষিত হয়। অনন্তর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উপস্থিত তিন সহোদরে বণ্টন করিয়া লন।

১২৯৪ সাল হইতে অর্থাৎ জন্মেজয়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তি রিসিভারের তত্ত্বাবধানের অধীন রহিয়াছে। জন্মেজয় মল্লিকের সখা রমানাথ রক্ষিতের বংশধর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রক্ষিত এক্ষণে মেদিনীপুরের এক জন খ্যাতনামা জমিদার ও অবৈতনিক বিচারক বলিয়া সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে গণ্য।

বালেশ্বর রাজবংশ।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।)

প্রত্যেক লোকহিতকর কার্য্যে একাগ্রতা ও দানশীলতার জন্য এই বংশ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা উড়িষ্যার আদিম নিবাসী নহেন। অনুমান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে এই স্থানে বাসস্থান নিরূপিত করেন।

ইঁহারা যে উচ্চবংশসম্ভূত, তদ্বিষয়ে খ্যাতি আছে। ইঁহারা জাতিতে তাম্বূলী। সৎশূদ্র মধ্যে নির্দ্দেশিত। তাম্বূলীদিগের মধ্যে অষ্টগ্রামী শ্রেণীভুক্ত। এই বংশ অতি প্রাচীন বলিয়া ইঁহারা গৌরব করিয়া থাকেন। অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে এই বংশের ইতিহাস পরিষ্কাররূপে সংগৃহীত হইতে পারে। তৎকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার অধীন

মায়াপুর গ্রামে ইঁহারা বসতি করিতেন। ঐ সময় এই গ্রাম অতিশয় জনাকীর্ণ ছিল; অবশ্য ইঁহারা বংশপরম্পরা বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তথায় কতদিনের বাস ছিল, এতকাল পরে অনুমান দ্বারা তাহা স্থির করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দে হইতে এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। সাধারণতঃ তিনি "সারদে" বলিয়া পরিচিত এবং রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর হইতে উর্দ্ধে নবম পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধুসূদন অনেক দিন মায়াপুরে বাস করেন। অবশেষে জনৈক মুসলমান ফৌজদারের (সামরিক শাসন কর্ত্তা) অত্যাচারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। যে অবস্থায় ইনি আপন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে অতীব ঔপন্যাসিক রহস্যাত্মক।

তৎকালে বঙ্গদেশ যথেচ্ছারিতায় পূর্ণ ছিল। ধন প্রাণ লইয়া নিরাপদে বাস কি প্রকার, অনেকেরই তাহা অজ্ঞাত ছিল। ধন, মান, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং আরও যাহা কিছু মনুষ্যের আপন ও প্রিয় বলিতে আছে, তৎসমুদায়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মুসলমান শাসনকর্ত্তা অথবা তাহাদিগের প্রিয়পাত্রদিগের করায়ত্ত ছিল। অশুভক্ষণে তাৎকালিক জাহানাবাদ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মুসলমান ফৌজদার মায়াপুর নিবাসিনী একটি সুন্দরী তাম্বূলী যুবতীর রূপ মাধুরীর বিষয় শুনিয়াছিলেন। এবং কামান্ধ হইয়া যে কোন প্রকারে তাহাকে হস্তগত করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধি—ধন অথবা ক্ষমতা কিছুরই অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে সাহস করে নাই।

গ্রামস্থ অষ্টগ্রামী তাম্বূলীদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা কুলমর্য্যাদার উপর অচিন্তনীয় আঘাতের প্রতীকারে চিন্তাকুল হইলেন। নিঃসহায় অভাগাগণ হতবুদ্ধি হইয়া কি প্রকারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে অব্যাহতি পান, তন্নিরাকরণে অশক্ত হইলেন। ইঁহারা সানুনয়ে যথেষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যাহার প্রতি তিনি অন্তঃকরণ নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই যুবতী ভিন্ন তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। অতঃপর যখন তাঁহারা দেখিলেন, এত অনুনয় বিনয় সমস্তই বৃথা হইল, তখন একটী কুটিল উপায়াবলম্বনে মর্য্যাদা রক্ষার এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন ও

ফৌজদারের কপট সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মধুসূদন দত্তের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ফৌজদারের হৃদয়-গ্রাহিণী কামিনীও ঐ বাটীতে ছিল। ফৌজদার মধুসূদনের গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রমণীর সন্নিকটে স্থাপিত জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অতঃপর যখন এই আনন্দের উৎস ছুটিতে ছিল, সেই সময় গৃহস্বামীর জনৈক ভৃত্য স্ত্রীবেশ ধারণ করতঃ গোপনে এক খানি শাণিত ছোরা দ্বারা ফৌজদারের জীবলীলা শেষ করে। এই প্রকারে তৎকালে তাঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা হয়। যাহাহউক, এই কার্য্যটী নীতির অনুমোদিত কি না- বিবেচ্য। এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান নায়ক মধুসূদন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তিনি স্বজাতির নিকট অত্যধিক প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ "সারদে" সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই সম্মানের আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বংশপরম্পরায় অদ্যাবধি ঐ আখ্যা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধির কুঅভিপ্রায়ের প্রতিশোধ দিয়া তাম্বূলীগণ স্বদলে ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, সেই পর্য্যন্ত এই মায়াপুর গ্রাম অষ্টগ্রামী তাম্বূলীদিগের নিকট অভিশপ্ত। এখন পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের তাম্বূলীদিগকে এখানে বাস করিতে দেখা যায় না। ঘটনাক্রমে যদি কেহ কোন সূত্রে এই গ্রামের নিকট দিয়াও গমন করেন, তিনি কদাচ বিশ্রামার্থ এস্থানে উপবেশন বা জল গ্রহণ করেন না। অতঃপর তাম্বূলীগণ আপনাপন জীবিকার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্বেষণে পৃথক হইয়া পড়িলেন। কতকগুলি কলিকাতা, কতকগুলি মেদিনীপুর সহরে, কেহ কেহবা গয়েশপুর, কতকগুলি তমলুকে, আরও কতকগুলি বালেশ্বর এবং পিপলীতে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। মধুসূদন দে অথবা সারদে ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত বাড়দা গ্রামে আপন বাসস্থান নিরূপণ করেন। অত্যধিক দূরতা হেতু তথায় মুসলমান শাসনকর্তার প্রতি-হিংসার আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। এই স্থানে তিনি ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইংরাজেরা সাধারণতঃ টুপিওয়ালা নামেই অভিহিত হইতেন। যাহাহউক, ইনি জীবনের অবশিষ্ট দিন ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মধুসূদন এক মাত্র পুত্র ঈশ্বর দেকে রাখিয়া প্রাচীন বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

• ঈশ্বর দে হইতে হৃদয়রাম দে পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের মধ্যে কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। তবে ইঁহারা ইংরাজ কুঠিওয়ালার আশ্রয়ে পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখ শান্তি উপভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর হৃদয়রামের পুত্র জয়কৃষ্ণরাম ব্যবসায় অধিকতর সুবিধা-জনক স্থানের জন্য ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তাঁহার অবস্থা তাদৃশ সুপ্রসন্ন ছিল না। জয়কৃষ্ণ রামের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি প্রবল ছিল। বাড়্দা গ্রাম ব্যবসায় অনুপযোগী বিবেচনায়, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্রের জন্য এই উদ্যমশীল বণিক বালেশ্বর নগর বাসস্থানের উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে ইহা একটি উন্নতশিল বন্দর ছিল। এই কারণে অনুমান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণরাম তাঁহার তিনটী পুত্র লইয়া পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করতঃ এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই বংশের ইতিবৃত্ত এখান হইতে পরি-বর্ত্তিত দেখা যায়। এই সময় মিশরের সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তদ্ধেতু এই প্রদেশের বাণিজ্য ব্যবসায় একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। জয়কৃষ্ণরাম ভাগ্যপরীক্ষার্থ দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। যাহাহউক, তাঁহার এই উদ্যোগ বিফল হয় নাই। এতদ্দ্বারা কেবল মাত্র যে তিনি প্রচুর লাভবান্ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, এই সূত্রে কিছু ভূসম্পত্তিও ক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক দিন তিনি এই সম্পত্তি উপভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মাণিকরাম দে অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উড়িয়া ও বাঙ্গালা জানিতেন। সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতেও কথঞ্চিৎ অধিকার ছিল। পিতার ন্যায় ইনিও বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। অনুমান ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর-নিবাসী খ্যাতনামা অষ্টগ্রামী তাম্বূলী বাবু লাল বিহারী কর মহাশয় মাণিকরামের সুবুদ্ধি অবলো-কনে তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর শ্বশুরের সাহায্যে মাণিকরামের ব্যবসায় আরও প্রসারিত হয় ও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ উন্নতি হয়। সততা ও ধর্ম্মের সহিত কার্য্য করায়, আপন সুনাম প্রচারিত ও প্রভূত ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল। ইনিও বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মাণিকরাম তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দয়ারাম, মধ্যম জগন্নাথ ও কনিষ্ঠ রঘুনাথ। দয়ারাম আপন মাতুল বাবু,

জগন্নাথ প্রসাদ কর মহাশয়ের প্রশস্ত কারবার পরিচালন করেন। সৎবুদ্ধি ও সততার জন্য ইঁহার মাতুল ইঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন এবং সাধারণ লোকেও ইঁহাকে সম্মান করিত। ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

মাণিকরামের মধ্যম পুত্র জগন্নাথ আপন পিতার বিষয়কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ সময় বালেশ্বর ইংরাজাধিকারে ছিল, কিন্তু তৎকালে ইহা একটী স্বতন্ত্র জেলা ছিল না; তখন বালেশ্বর কটক জেলায় অন্তর্গত একটি মহকুমা মাত্র ছিল এবং তথায় একটি ছোট খাজনাখানা ছিল, একজন খাজাঞ্জিও নিযুক্ত থাকিত। গভর্ণমেণ্ট এই পদের উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া না পাওয়ায়, জগন্নাথ দেকে মনোনীত করেন। জগন্নাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথের সাহায্যে খাজনাখানার কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। কারণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে তিনি কিছু অধিক শিক্ষিত ছিলেন। যাহাহউক, বর্ষত্রয়কাল পারকতা ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া জগন্নাথ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথ ব্যবসায় বাণিজ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রীতিমত ব্যবসার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সান নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাপড় ছিল, ঐ কাপড় বালেশ্বরেই প্রস্তুত হইত। তিনি ঐ কাপড় প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ড, পর্টুগাল, ডেনমার্ক এবং হলাণ্ডে রপ্তানি করিতেন। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে চাউল ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত এবং কড়ি পাঠাইতেন। এই সকল কার্য্যে তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। রঘুনাথ এক জন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইনি লভ্যাংশের অধিকাংশই দান ধর্ম্মে ব্যয় করিতেন। ইনি কূপ ও পুষ্করিণী খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ ও অপরাপর অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি ব্রজমোহন, রূপচরণ, সনাতন এবং শ্যামানন্দ নামক চারিটী পুত্র রাখিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পিতার জীবিতাবস্থায় সময়েই ব্রজমোহন ও রূপচরণ অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় পুত্র সনাতনও পিতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইনিও অপুত্রক অবস্থায় জীবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার রাধানাথ নামক দত্তক পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাল-

কবলিত হন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ শ্যামানন্দই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন।

সন ১২২৫ সালে ২৫শে ফাল্গুন তারিখে শ্যামানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। এই হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায়, যৎকালে শ্যামানন্দের উপর বিষয় কর্ম্মের ভার ও সাংসারিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন ইঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। ইনি সম্পূর্ণরূপে আপন পদের গুরুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। ধনবান পরিবারের যুবকগণ যেরূপ যৌবন সুলভ প্রলোভনে সদা রত থাকেন, ইনি সে প্রকার প্রলোভনে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া একমাত্র কর্ম্মেতেই মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরাধিকারী-সূত্রে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আপন পারদর্শিতা ও সতর্কতার সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করায় ও তৎসহ সততা ও পরিমিতাচার, থাকায়, কেবল যে ঐ সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নহে, অসংখ্য ধর্ম্মকার্য্যে ও দানশীলতায় বংশ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া রাজা ও সাধারণের সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও পথকর বিভাগের এবং মিউনিশিপাল সদস্য থাকিয়া শ্যামানন্দ অনেক লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া যান। তাঁহার অসংখ্য প্রকাশ্য ও গুপ্ত দানের মধ্যে একটীতেই নামের মহত্ব প্রতিপন্ন হয়। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে (যাহা স্মরণ করিলে এখনও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে) তাঁহার মহত্ব ও অন্তরের স্বদেশানুরাগ প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকস্থ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া নগরে অন্ন ছত্র খুলিয়া ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিমিতরূপে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ম্মা ও আরাকান হইতে বিস্তর চাউল আমদানী করিয়া সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী ও প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রজাদিগকে প্রায় লক্ষ টাকা খাজনা ছাড় দিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা বলা বাহুল্য নহে যে, তাঁহার মনের মহত্ব ও মানবের দুঃখ-মোচনের অশ্রান্ত চেষ্টা না থাকিলে, সেই স্থানীয় খ্যাত দুর্ভিক্ষে মৃত্যু-সংখ্যা সম্ভবতঃ অনেক অধিক হইত। ঐ সময় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার মহৎ কার্য্য স্বীকৃত হয়।

ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক ঔদার্য্য ও ব্যগ্রতা ছিল। তিনি এই সহরে নিমাকালী ও ঝাড়েশ্বরের মন্দির এবং রেমুনা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রাচীনত্বের নিদর্শন পুরীর জগন্নাথের যে গণ্ডিচা মন্দির, যাহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও তাঁহার গৌরব প্রকাশার্থ অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান, অনেক দিন সংস্কারাভাবে সম্পূর্ণরূপে ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্যামানন্দ দে ইহারই সংস্কার কার্য্যে অন্যূন অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপন নাম অজর ও অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, এই অপরিসীম ব্যয়ের বিষয় জীবিতাবস্থায় তাঁহার সন্তানেরা পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। বাস্তবিক ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মহৎ এবং সৎব্যক্তির অন্যান্য গুপ্ত দান আত্মশ্লাঘা ও আড়ম্বর শূন্য ছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি দিল, বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইনি গরীব দুঃখীদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। কি সহরে, কি মফস্বলে যেথানে উত্তম পানীয় জলের অভাব বোধ হইয়াছে, সেই থানেই ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপরাপর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও দানের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

(১) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আপন নামে নামকরণ করিয়া সহরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। (২) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রেমুনার মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ নির্ম্মাণ করেন। (৩) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই সহরে ভিক্টোরিয়া জুবিলি নামক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ নির্ম্মাণ। (৪) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলসের ছাত্র-বৃত্তি ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ৫০০০ হাজার টাকা দান। ঐ টাকা হইতে বালেশ্বর জিলা স্কুলের একটি প্রশংসেয় নিম্ন ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে প্রদত্ত হইত। কিছুদিন হইতে ঐ বৃত্তি-ভাণ্ডার ভদ্রকের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের পোষনার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে। (৫) বালেশ্বর রাজবাটীর ঠিক সম্মুখ ভাগে একটি সুবৃহৎ সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ এবং ইহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে (অর্থাৎ যখন কুলদেবতা রাধা গোবিন্দ জিউ এই মন্দিরে স্থাপিত হয়েন) প্রচুর ব্যয় ও এতৎসহ শিবের

সেবার জন্য চিরস্থায়ী রাজকীয় বন্দোবস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ। এখানে প্রত্যহ গরীবদিগকে ভোজন করান হয়। এবং (৬) সাধু, সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী ও অপরাপর দানপ্রার্থী ব্যক্তিগণের আতিথ্য সৎকারের জন্য সদাব্রত স্থাপন। এবং ১৮৭৪ সালে দেশীয় শিল্পকর্ম্মের উৎসাহ দানার্থে পারুয়াপদ গ্রামে তাঁহার উদ্যান বাটিকায় স্বদেশ জাত দ্রব্যের প্রদর্শনী উন্মোচন।

তাঁহার রাজভক্তি, দেশ হিতকর কার্য্যে উৎসাহ এবং দানশীলতা স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বংশ পরম্পরায় "রায় বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৮৭৫ সালে "রাজা" (১৮৮৭) "রাজা বাহাদুর।" কিন্তু তিনি শেষোক্ত সম্মান অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই। ১৮৮৮ সালে অক্টোবর (১২৯৬ কার্ত্তিক) মাসে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্যামানন্দ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার দয়া ও দানশীলতা উড়িষ্যার লোক সহজে কখন ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার পত্নী শ্রীমতি রাণীকে অধিক দিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। ইনি ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে কালকবলিতা হন।

রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর চারি কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (এক্ষণে রাজা বাহাদুর) এবং কনিষ্ঠ কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে। পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কুমারদ্বয়ের প্রথম কার্য্য মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ। ধরিতে গেলে ঐ অনুষ্ঠান জেলার মধ্যে অদ্বিতীয় এবং ইহাতে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল কুমারগণের মিতাচার ও সৎকারে এতাদৃশ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহারা ইঁহাদিগকে বংশ পরম্পরায় "দেব" উপাধিতে ভূষিত করিয়া যান।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ইনি দ্বাদশ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে লেখাপড়া সমাপন করত বিদ্যালয় ছাড়িয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগ দান করেন। পিতার জীবিতকালে তাঁহার সহিত সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যে ও স্থানীয় সভাসমিতিতে ইনি প্রধান সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন।

১৮৭৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯০১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ইনি

স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং ঐ সময়েই সভাপতি পদে উন্নীত হন। পরে সুখ্যাতি ও পারদর্শিতার সহিত তিন বৎসর কাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত ইনি বালেশ্বর পথকর সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৫ সালে অর্থাৎ জেলা বোর্ডস্থাপনের প্রারম্ভ হইতে ইনি সুখ্যাতি ও পারকতার সহিত বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতির কার্য্য চালাইয়া গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি বিশেষ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত হন ও ইঁহার প্রতি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পিত হয়। ঐ কার্য্যও তিনি বিশেষ পারগতা ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মহা প্রদর্শনীতে ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানীয় কৃষি শিল্পের নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কারণে এবং সর্ব্ব প্রথমে এই বিভাগে উড়িষ্যা ভাষায় "রিপণ ভূচিত্রাবলী" "Ripon Atlas" প্রকাশ করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি প্রশংসাপত্র ও তৎসহ "ব্রোঞ্জ" "Bronze" ধাতু নির্ম্মিত একটি পদক তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। তাঁহার রাজভক্তি, মিতব্যয়িতা, সাধারণ লোক হিতকর কার্য্যে যোগদান এবং সুখ্যাতির সহিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য নির্ব্বাহ ইত্যাদি স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক খানি প্রশংসা পত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ছোট লাট বাহাদুরের মন্ত্রী সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। উড়িষ্যা হইতে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি বর্ষত্রয়কাল পর্য্যন্ত (১৮৮৩—৮৬) এই দায়িত্ব পূর্ণ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সহিত উপরোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ সময় মন্ত্রী সভায় ১৮৮৪ সালের ৩ আইন অর্থাৎ বাঙ্গালার মিউনিশিপাল বিল লইয়া বিশেষ রূপ বাদানুবাদ চলিতে ছিল। ঐ আন্দোলনে মিউনিশিপাল কার্য্য সম্বন্ধে ইনি অনেক অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা প্রকাশ করেন।

লোক হিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও তাঁহার দানশীলতায় গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিশেষ রূপে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত করেন।

এক্ষণে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর যে সকল অবৈতনিক কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সহকারী সভাপতি।

(২) প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত বিশেষ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সভাপতি।

(৩) স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর কমিশনর।

(৪) ১৮৮৫ সাল হইতে বাঙ্গালার রাজকীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য।

(৫) বৌদ্ধদিগের টেক্সট্ সোসাইটীর সদস্য। (১৮৯২ সাল হইতে)।

(৬) কলিকাতার পশুশালার জীবিত বা চিরসদস্য (১৮৭৯ সাল হইতে)।

(৭) লেডি ডফারিণ ভাণ্ডারের জীবিত বা চির সদস্য। (১৮৯২)।

(৮) স্থানীয় জেলের অরাজকীয় পরিদর্শক। (১৮৯২)

(৯) বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য। (১৮৮৩) ইহাঁর মধ্যে ১৮৯৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত বর্ষত্রয়কাল সহকারী সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

(১০) বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির সভাপতি।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্থানীয় জেলা স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৮ সালের মে মাসে ইনি বালেশ্বর স্থানীয় বোর্ডের সদস্য রূপে নিয়োজিত হয়েন এবং ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হয়েন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কুমার সত্যেন্দ্রনাথ মিউনিশিপাল কমিশনর রূপে নির্ব্বাচিত হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বিশেষ পারকতা ও সুখ্যাতির সহিত ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য ভাণ্ডারের স্থানীয় শাখার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি হীরক জুবিলি সভার সভাপতিত্বে নিয়োজিত হয়েন এবং মহাসমারোহে

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনের উৎসবে ইনি অর্থ বা সামর্থ্যে কোন বিষয়েই ক্রটি প্রদর্শন করেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহার লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও মিতব্যয়িতার জন্য ইহার সম্মানার্থ মহারাণী ভারতেশ্বরীর নামে এক খানি প্রশংসা পত্র অর্পিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্থানীয় মিউনিশিপালিটীর অধীনে আদম সুমারির পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বালেশ্বরের প্লেগ ভিজিল্যান্স কমিটির সদস্যরূপে কার্য্য করেন। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতির যুক্ত সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন।

উপস্থিত ইনি নিম্নলিখিত সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ;—

(১) বালেশ্বর জেলা বোর্ডের সদস্য।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের "এ" বেঞ্চের সভাপতি।

(৩) স্থানীয় মিউনিশিপাল কমিশনর।

(৪) বৌদ্ধ টেক্সট্ সোসাইটীর সদস্য।

(৫) জীবিত বা চিরসদস্য পাইকপাড়া বৃক্ষ বাটীকা উদ্যান।

এই দুই সহোদরের মধ্যে রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর নিঃসন্তান। কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দের মন্মথ নামধেয় এক পুত্র ও তিন কন্যা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মন্মথ নাথের জন্ম হয়।

ইহাদিগের স্বর্গীয় পিতা যে সকল দানাদি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, ইহারা উভয় ভ্রাতায় ঐ সকল ক্রিয়া কলাপ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বরং তদপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই সাধারণ হিতকর কার্য্যে উদ্যুক্ত এবং কি প্রকাশ্য বা গুপ্ত কতকগুলি দানাদি সৎকর্ম্মে ইহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

(১) ইহাদিগের স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ জেলবাসীদিগের পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য "শ্যামসাগর ভাণ্ডার" স্থাপন। (১৮৮৮)

(২) চাঁদবালী হাঁসপাতালে রোগীদিগের ঔষধ বিতরণার্থ "রাণী শ্রীমতি ভাণ্ডার" স্থাপন। (১৮৮৮)

(৩) "বেলী মেডাল" স্থাপন (১৮৮৮)। তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলী যে সময় বালেশ্বর পরিদর্শনে আইসেন, ঐ সময়েই ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং বালেশ্বর জেলা স্কুলের মধ্যে প্রতি বৎসর যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাকেই উপরোক্ত মেডেল প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৪) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে নালকুল রাস্তা নির্ম্মাণ। এই রাস্তা বালেশ্বর সহর হইতে নালকুল খাল ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৫) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলায় অনন্তপুর মধ্য বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৬) ১৮৯১ সালে নভেম্বর মাসে তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর সার চারল্‌স্ ইলিয়ট বাহাদুরের বালেশ্বর আগমন উপলক্ষে সোরোগ্রামে "ইলিয়ট দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন ও পরিচালন। উপরোক্ত গ্রাম জগন্নাথ ট্রঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। সুতরাং ইহাতে সন্নিহিত গ্রামবাসী ও তীর্থযাত্রীগণের সমূহ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

(৭) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহাদের পূজনীয়া মাতার সম্মানার্থ "রাণী শ্রীমতি স্ত্রীলোকদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন। ইহা নগরের ঠিক মধ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত। যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষদিগের সহিত চিকিৎসিত হইতে অভিলাসী নহে, ইহা তাহাদিগের জন্য স্থাপিত।

(৮) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অসাময়িক শোচনীয় মৃত্যুর স্মরণার্থ জলেশ্বরে "আলবার্ট ভিক্টর দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন।

(৯) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সাধারণের হিতার্থ নগর মধ্যস্থিত "রাণী সাগর" নামধেয় বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার।

(১০) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "মিসট্রেস্ স্মিথ পুরস্কার ভাণ্ডার" স্থাপন। জেলার মধ্যে মধ্যবঙ্গ পরীক্ষায় যে বালিকা উত্তীর্ণ হয়, ইহা তাহাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(১১) ১৮৯৩ সালে "রাজা শ্যামানন্দ বৃত্তি ভাণ্ডার" স্থাপন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় যে বালক কৃতকার্য্য হয়, তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে।

(১২) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ "বিদ্যা-

সাগর বৃত্তি” স্থাপন। এই বৃত্তি মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ প্রকৃত নিঃস্ব বালকগণকে স্থানীয় জেলা স্কুলে পাঠ সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(১৩) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নগরের কয়েকটী বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের উৎসাহার্থ “রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যায়াম পুরস্কার” স্থাপন।

(১৪) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রাপাড়া সাধারণ পুস্তকাগারের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ।

(১৫) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের এবং রাণী শ্রীমতি দাতব্য ঔষধালয়ের স্ত্রী চিকিৎসক ও রাজকীয় হাঁসপাতালের সহকারী চিকিৎসকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ।

(১৬) বালিপাল বাসতা রোডের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ। ইহার দূরত্ব তিন মাইলের অধিক হইবে।

(১৭) উড়িষ্যা ভাষায় কতকগুলি আবশ্যকীয় স্কুল পাঠ্য পুস্তক ও এক খানি মানচিত্র সঙ্কলন। অল্প মূল্য প্রযুক্ত গরীবদিগের ইহা দ্বারা সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে।

(১৮) জেলার চতুর্দ্দিকে জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ৪৯টী কূপের পঙ্কোদ্ধার এবং চাঁদবালী ও অন্যান্য স্থানে কূপ খনন।

(১৯) বালেশ্বরে কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ হল নির্ম্মাণ ও মেদিনীপুরে বেলী হল নির্ম্মাণার্থে এককালীন দান।

(২০) নিম্নলিখিত কয়েকটী দুর্ভিক্ষ দাতব্য ভাণ্ডারে প্রচুররূপে মাসিক চাঁদা বা দান।

(ক) মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৩

(খ) পুরী দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৭

(গ) আইরিশ দুর্ভিক্ষ। ১৮৮০

(ঘ) নয়ানন্দ দুর্ভিক্ষ। ১৮৮৯

(ঙ) তালপদ দুর্ভিক্ষ। ১৮৯০

(চ) ভোগরাই দুর্ভিক্ষ। ১৮৯১

(ছ) কামারদা দুর্ভিক্ষ। ১৮৯১

(জ) ভারত দুর্ভিক্ষ বা ইণ্ডিয়ান ফেমিন ১৯০০

বালেশ্বর রাজবংশের ধর্ম্মার্থ ও সাধারণ দানের তালিকা।

মন্দির	কোন সালে প্রস্তুত		আনুমানিক ব্যয়।
১। স্বপ্নেশ্বর, বালেশ্বর	১৮৩৫	...	৬০০৲
২। নিমাকালী ঐ	১৮৩৬	...	৫০০৲
৩। শ্রীমন্দির গোপীনাথ, রেমুনা	১৮৩৮	...	২০০০৲
৪। ঝাড়েশ্বর, বালেশ্বর	১৮৪০	...	২৮০০৲
৫। ধর্ম্মশালা ঐ	১৮৪১	...	২৫০০
৬। রামেশ্বর ঐ	১৮৪৪	...	১০০০৲
৭। জগন্নাথ গুণ্ডিচা পুরী (সংস্কার)	১৮৫৯	...	৮০,০০০৲
৮। রাধাগোবিন্দ জিউ, বালেশ্বর	১৮৬৮	...	২২.০০০
৯। শ্যামেশ্বর, বালেশ্বর	১৮৯৫	...	২০০০৲

বিদ্যালয়।

			বাৎসরিক চাঁদা
১। রেমুনা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়	১৮৬৪	...	২০০৲
২। বালেশ্বর হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়	১৮৭২	...	২০০৲
৩। বালেশ্বর ভিক্টোরিয়া জুবিলি মধ্য ইংরাজি স্কুল	১৮৮৭		৮০০৲
৪। অনন্তপুর মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়	১৮৯১	...	২০০৲
৫। বালেশ্বর সংস্কৃত সমিতি	১৮৯৩	...	১৫০৲

এককালীন দান।

১। রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ	...	১৮৭৪	২০০০৲
২। রেমুনায় স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ	১৮৬৮ এবং	১৮৯৩	
৩। অনন্তপুরের স্কুল গৃহ „	...	১৮৯১	১৮৫৲
৪। জলেশ্বরে "আলবার্ট ভিক্টর" নামীয় দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয়		১৮৯১	১৬৫৫৲

৫।	সোরো গ্রামে "ইলিয়ট" নামধেয় দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয় ...	১৮৯১	১২০০৲
৬।	রাণী শ্রীমতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীলোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয়	১৮৯১	২৫০০৲
৭।	উপরোক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাকালীন ঔষধ, যন্ত্রাদি ও আসবাব আদির ব্যয়	১৮৯১	১৫০০৲
৮।	ঐ চিকিৎসালয়ে বিশেষ যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ ব্যয়	১৮৯১	৫৪০৲
৯।	রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের বাটী সংলগ্ন রাণী শ্রীমতীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ চিকিৎসকের বাস স্থান নির্ম্মাণ	১৮৯৮	৬৫০০৲
১০।	কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোটেলে সাহায্য প্রদান	১৮৭৭	৫০০৲

পুস্তকালয় এবং সমিতি।

১।	বালেশ্বরে কৃষ্ণদাস পাল হল	১৮৮৪	২০০০৲
২।	মেদিনীপুরে বেলী হল এবং সাধারণ পুস্তকালয়	১৮৯৬	২৫০৲
৩।	বি, দে, সাধারণ সমিতি পুস্তকালয়	১৮৯৬	২৫০৲
৪।	কেন্দ্রাপাড়া সাধারণ পুস্তকালয় গৃহ	১৮৯৭	৩০০৲
৫।	বালেশ্বর জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ব্যয়	১৮৭৪	১০০০৲
৬।	কটকে র‍্যাভেনসা কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ	১৮৭৫	১০০০৲

পথ।

১।	নালকুল রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যয়	১৮৮৯ ...	৪১০০৲

বৃক্ষাদি দ্বারা পথ সুসজ্জিত করণ।

১।	বাস্তা বালিপাল রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণের ব্যয় ১৮৭৭ ...	...	১২০০৲
১।	বালেশ্বরে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ভূমি দান ১৮৭৪ বাৎসরিক আয়		৫১৭৲
২।	প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বৃত্তি জন্য এককালীন মোট দান প্রতি বৎসরে ২০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে ১৮৭৫		৬০০০৲

৩। "শ্যামসাগর" বা "শ্যাম কিপ" যৌতুক ভাণ্ডারে ১৮৮৮ সালে ভূসম্পত্তি দান। প্রত্যেক বৎসর জেলাতে একটি করিয়া পুষ্করিণী খননার্থ ২০০৲ শত টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

৪। "রাণী শ্রীমতি যৌতুক" ভাণ্ডারে ১৮৮৮ সালে ভূসম্পত্তি দান। বাৎসরিক ১০৬৲ টাকা চাঁদবালী হাঁসপাতালের ঔষধ ক্রয়ার্থ ব্যয়িত হয়।

৫। সোরো, ইলিয়ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদিগের ভরণ পোষণার্থ ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... ৩০০৲

৬। জলেশ্বরের আলবার্ট ভিক্টর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... ... ২৪০৲

৭। রাণী শ্রীমতি স্ত্রীলোকদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভূসম্পত্তি দান, ১৮৯১, বাৎসরিক আয় ... ... ৬০০৲

৮। বালেশ্বর জেলা স্কুলে "সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মেডেল" প্রদানার্থ এককালীন নোট দান, ১৮৮৮ .. ... ৫০০৲

৯। শ্রীমতি স্মিথ্ পুরস্কার ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, যে সকল বালিকা মধ্যবঙ্গ পরীক্ষায় জেলা হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের প্রদানার্থ, ১৮৯২ ... ... ৫০০৲

১০। বিদ্যাসাগর নিঃস্ব ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, যে সকল বালক অর্থাভাবে স্থানীয় জেলা স্কুলে পড়িতে অক্ষম, তাহাদের জন্য, ১৮৯৪ ... ... ৬০০৲

১১। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরস্কার ভাণ্ডারে এককালীন নোট দান, ১৮৯৪, ইহা ব্যায়ামের পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ৫০০৲

১২। "রাজা শ্যামানন্দ বৃত্তি" উড়িষ্যার সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের জন্য, বৎসরে ৪০ টাকা প্রদত্ত হয়।

দুর্ভিক্ষ

১।	উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ	...	১৮৬৬	...	১০০০০০৲
২।	মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ	...	১৮৭৩	...	১০০০৲
৩।	পুরী দুর্ভিক্ষ	..	১৮৭৭	...	১২৫০৲

৪। আইরিস্ দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৮০ ... ৫০০৲
৫। নয়ানন্দ দাতব্য সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৮৯ ... ৫০০৲
৬। তালপদ দুর্ভিক্ষ .. ১৮৯০ ... ৭০০৲
৭। ভোগরাই সাহায্য ভাণ্ডার ১৮৯০ .. ৫০০৲
৮। ভোগরাই গ্রামে দুঃখী লোকদিগকে বস্ত্র প্রদান ১৮৯০ ৫০০৲
৯। কামার দা সাহায্য ভাণ্ডার ... ১৮৯১ ... ৫০০৲
১০। ভারতবর্ষীয় দাতব্য সাহায্য ভাণ্ডার ... ১৯০০ ... ১০০০৲

বিবিধ।

১। বালেশ্বর মিউনিশিপালিটী হইতে দুইটী অপরিষ্কার বস্তি উঠাইবার ব্যয় ... ... ১৭৯১ ... ২০০০৲

২। বালেশ্বর সহরে পয়ঃপ্রণালী ও আলোকের উন্নতি কল্পে দান, ... ১৮৯০—৯১—৯২ ৫৭৪৲

৩। লণ্ডন নগরে রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় এককালীন দান ... ... ১৮৮৮ ... ৫০০৲

৪। কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য দান ... ৫০৲

৫। পাস্তুর চিকিৎসালয়ে এককালীন দান ... ১০০৲

৬। যাজপুর শিল্প প্রদর্শনীতে এককালীন দান ... ২৫০৲

৭। সহকারী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার বাবু ছকুলাল সরকারের বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ সাহায্য দান ... ২০০৲

(১৮৯৭ সালে ইনি হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন।)

৮। হীরক জুবিলি ভাণ্ডারের চাঁদা দান ১৮৯৭ ৫০০৲

পুষ্করিণী খনন এবং পঙ্কোদ্ধার।

১। পানি কৈলি পুষ্করিণী কটক ... ৫০০৲
১। পুষ্করিণী মণিপুর ... ৭৮০৲
১। ঐ আনকুরা, বালেশ্বর ব্রাহ্মণ গাঁ ... ১২০৲
১। „ ইন্দ্রম আনকুরা বালেশ্বর ... ৬৪০৲
১। „ অনন্তপুর কাইডা বালেশ্বর ... ৩১০৲

১।	„	আনিরি ঐ ঐ		...	৬০০৲
১।	„	পুরুষোত্তমপুর, ঐ ঐ		...	৩০০৲
১।	„	সাহুর, সোরো		...	২৫০৲
১।	„	ছত্রপুর ঐ		...	৫০০৲
১।	„	মাছাদা ঐ		...	৪৫০৲
১।	„	তুরিগারিয়া ঐ		...	২৫০৲
১।	পুষ্করিণী	গণ্ডীবার	সোরো	...	৩০৪০৲
১।	„	নায়েক বাঁদ	ঐ	...	৪৫০৲
১।	„	রঘুনাথ সাগর	বালেশ্বর	...	৬০০০৲
১।	„	রাণী সাগর	ঐ	...	৪০০০৲
১।	„	বানাস্তা	সোরো	...	২০০৲
২।	„	গোপালপুর	ঐ	...	৯০০৲
২।	„	গ্রোয়াপদ	বালেশ্বর	...	৬০০৲
১।	„	সুনহাট	ঐ	...	৬০০৲
১।	„	কামারসাহী	ঐ	...	৫০০৲
১।	„	সুর্গা	আনকুরা	...	৯০০৲
৫।	„	রাজনগর	বালেশ্বর	...	৩০০০৲
১।	„	সিন্ধিয়া	ঐ	...	৭০০৲
১।	„	গান্ধারপুর		...	৪০০৲
১।	„	গাবগান		...	৫০০৲
১।	„	বীরকুল	...	...	৩০০৲
১।	„	রহিম নগর	...	...	৪০০৲
১।	„	বারপদ	...	...	৩০০৲
১।	„	জেলা স্কুলের মধ্যে		...	২৫০৲
১।	„	বক্সিবাজার, মেদিনীপুর		...	৩০০৲
১।	„	বেলুড়, হাওড়া	...	...	২৮০০৲

কূপ খনন ও পঙ্কোদ্ধার।

কাছারি বাটীর কূপে জল উত্তোলনের জন্য পম্প ১৮৭৭ ৩৫০৲

৪৯ কূপ জেলার চতুর্দ্দিকের ট্রাঙ্ক রাস্তার পার্শ্বে			১৮৭৯	৮০০৲
১। " "	চাঁদবালী	...	১৮৭৮	৩০০৲
১। " "	তাম্রিপাল, কটক	...	...	৩০০৲
১। " "	বারি ঐ	...	...	২০৲
১। " "	বারপদ	...	...	২০৲
১। " "	ছত্রপুর	...	...	১৭০৲
৪। " "	রাজনগর, বালেশ্বর		...	১২০০৲
১। " "	বারোবাটী ঐ		...	৩০০৲
১। " "	দামোদরপুর ঐ		...	৩৫০৲

সদাব্রত।

১৮৬৩ সালে সদাব্রত স্থাপন হয় বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১২০০৲

১৮৭২ সালে একটি মুদ্রা যন্ত্র স্থাপিত হয় বাৎসরিক ব্যয় ১০০০৲

এই রাজবংশের জমিদারী প্রায় ৬২টী অধিকারে বিভক্ত। কটক বালেশ্বর এবং মেদিনীপুরে স্থিত। সমস্ত জমিদারীতে তিন লক্ষ বিঘা ভূমি এবং এক লক্ষের উপর প্রজা আছে।

রাজকীয় চিহ্ন।

ভৃত্যাদিগের পরিচ্ছদ সাদা ইজার, বেগুনিয়া চাপকান তাহাতে লাল ডোরা এবং লাল পাগড়ি।

"সতেন বর্ত্ততে ধর্ম্মঃ
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"

ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যথায় ধর্ম্ম তথায় জয়।

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্যসূচক উপাধি বালেশ্বরের
রাজা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর	বালেশ্বর	জমিদারী	দে	চাকুলে	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সাত বা সারদে
শ্রীরামচরণ দে	গয়েশপুর	„	দে	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সাত দে
শ্রীশিবচন্দ্র মল্লিক	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দে	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	বামন দে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	মেদিনীপুর	জমিদারী	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	কুলিন	তেলান মল্লিক
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সেব্যরাজ সেন
শ্রীমহেশচন্দ্র সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	কুলিন	সেনপুরের সেন
শ্রীতিনকড়ি গুঁই	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	গুঁই	„	কাশ্যপ	কুলিন	কুশমাতার গুঁই
শ্রীরমানাথ নন্দী	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	নন্দী	„	„	কুলিন	বাগড়ার নন্দী
শ্রীচিন্তামণি লাহা	ঘাঁটাল	ব্যবসায়	লাহা	„	„	কুলিন	বড়ামের লাহা
শ্রীমহেশচন্দ্র আশ	প্রতাপপুর	চাকরী	আশ	„	„	(মজকুরি)	„
শ্রীশশীলাল কর	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	কর	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীশিবপ্রসাদ কর	কলিকাতা	ব্যবসায়	কর	তেলকুপি	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	তেলকুপি কর
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দত্ত	„	„	মৌলিক	বামনদে ম্যলিকের পাত্র
শ্রীহারাধন দে	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	দে	দেপুর	„	মৌলিক	দেয়ের দে

শ্রীগোপালচন্দ্র মাল	মেদিনীপুর	চাকরি	মাল	„	„	মৌলিক	„
শ্রীফকিরচন্দ্র সিংহ	চন্দ্রকোনা	ব্যবসায়	সিংহ	„	„	মৌলিক	বামনদে মাঁলিকের পাত্র
শ্রীপ্রসন্নকুমার কুণ্ডু	চন্দ্রকোনা	ব্যবসায়	কুণ্ডু	„	„	মৌলিক	„
শ্রীশশীভূষণ দাস	তমলুক	ঔষধ বিক্রয়	দাস	„	„	মৌলিক	„
শ্রীউমাচরণ নাদ	থানাকুল	ব্যবসায়	নাদ	„	„	মৌলিক	বামনদের পাত্র
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	মেদিনীপুর	ব্যবসায়	সেন	„	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	„
শ্রীদুর্গাদাস রক্ষিত	মেদিনীপুর	জমিদারী	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	মৌলিক	লুপ্তপোলের পাত্র
শ্রীজ্ঞানদাকুমার পাল	থানাকুল	ব্যবসায়	পাল	„	„	মৌলিক	„
শ্রীউমাচরণ লাহা	থানাকুল	বস্ত্র বিক্রয়	লাহা	„	„	মৌলিক	বড়ামের লাহা মালিকের পাত্র।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্দ্ধন	বালেশ্বর	ব্যবসায়	বর্দ্ধন	„	„	মৌলিক	„
৺ পেলারাম গণ	মেদিনীপুর	„	গণ	„	„	মৌলিক	লুপ্ত
শ্রীবলরাম মল্লিক	কলিকাতা	লৌহ ব্যবসায়	রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	„	দয়াল রক্ষিত

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী।

এই সমাজে সেন, কুণ্ডু, গণ, ও দে পদবীধারীগণই কুলীন। চারি খানি গ্রামে বাস নিবন্ধন গ্রামের নামানুসারে ঐ কুলিনগণ আপনাদিগকে সেনপুরের সেন, বিষ্ণুপুরের কুণ্ডু, পাতুল সাঁড়ার গণ ও দে গ্রামের দে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল গ্রামে অনুমান ২০০৲ দুই শত বৎসর ইঁহাদের বাস। আদি বাস স্থান সম্বন্ধে অষ্টগ্রামীদিগের সহিত ইঁহাদের অনেক একতা পরিলক্ষিত হয়। ইঁহারাও বলেন যে, আমাদের আদি বাসস্থান মায়াপুর গ্রামে। মুসলমানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা মায়াপুর ত্যাগ করিয়াছিলাম। যাহাহউক, কয়েকটী বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়েই অষ্টগ্রামী দিগের সহিত ইঁহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। তবে ক্রিয়াকলাপে দেবতা স্থানে "সন্দেশের কড়ি" ইঁহারা মেদিনীপুরস্থ জগন্নাথ দেবকে না দিয়া ঐ স্থানের শীতলা দেবীকে দিয়া থাকেন। দূরস্থ গ্রামবাসীগণ তত্রস্থ গ্রাম্য দেবতার নিকট উপরোক্ত "কড়ি" দিয়া থাকেন। অন্যান্য সমাজের তুলনায় এই সম্প্রদায়ে বিদ্বানলোক অল্প। মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীনটবর দত্ত এবং হুগলী জেলাস্থ কামারপুকুর নিবাসী শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা—ইঁহারা উভয়েই অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং সমাজ মধ্যে শিক্ষিত ধরিতে গেলে ইঁহারাই সেই আসনের অধিকারী। বিদ্বান অপেক্ষা এই সমাজে জমিদারের সংখ্যা কিছু পরিমাণে অধিক। জমিদারের মধ্যে দত্ত বংশ ও লাহা বংশই উল্লেখ যোগ্য। চতুর্গ্রামী সমাজের মধ্যে ৺ গঙ্গারাম দত্ত এক জন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ রাধাকৃষ্ণ দত্ত। আমুর ভূরসুবা গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাস ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে ইঁহার পিতা মেদিনীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। প্রথমে ইঁহাদের অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। ৺ রাধাকৃষ্ণ দত্ত সামান্য মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাধাকৃষ্ণ দত্তের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ রামচাঁদ দত্ত। সামান্য ব্যবসায় হেতু রাধাকৃষ্ণ কিছু ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাল সহকারে গঙ্গারামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ায়, ইনি প্রভূত

ধনের অধিকারী ও সমাজের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ ও খ্যাতাপন্ন হয়েন। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত, শ্রীনটবর দত্ত ও শ্রীরামচাঁদ দত্ত ইঁহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। ইঁহাদের সমবেত জমীদারীর আয় অনুমান ৫২০০৲ টাকা। রামচাঁদ দত্ত এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক হীন। ইনি বার্দ্ধক্যতা নিবন্ধন চক্ষে অল্প দেখেন ও তৎসহ শ্রবণ শক্তিরও হ্রাস হইয়াছে। রামচন্দ্র পূর্ব্বে কিছুকাল কমিশারিয়েটে কর্ম্ম করেন। অতঃপর ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া এক্ষণে বাটীতে থাকিয়াই বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কামারপুকুর নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র লাহা ও শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা ইঁহারাও উভয়ে জমীদার শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের জমীদারীর আয় উভয়ের স্বতন্ত্র।

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীপীতাম্বর দে	মেদিনীপুর	"	দে	দেপুর	কপিলর্ষি	কুলিন	দেয়ের দে
শ্রীঅভয়চরণ কুণ্ডু	মেদিনীপুর	"	কুণ্ডু	"	সপ্তর্ষি	কুলিন	"
শ্রীহেমচন্দ্র সেন	চন্দ্রকোনা	"	সেন	"	"	কুলিন	"
শ্রীশ্রীনাথ গণ	লাহিরগঞ্জ	"	গণ	"	"	কুলিন	"
শ্রীরামচাঁদ দত্ত	মেদিনীপুর	জমিদারী	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ লাহা	মেদিনীপুর	"	লাহা	"	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীনবীনচন্দ্র পিরি	মেদিনীপুর	"	পিরি	"	মধুকোল্য	মৌলিক	"
শ্রীমাহাতাব চন্দ্র নাদ	সিলদা	"	নাদ	"	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"
শ্রীভূতনাথ সিংহ	খানাকুল	"	সিংহ	"	"	মৌলিক	"
শ্রীআশুতোষ গুঁই	খানাকুল	"	গুঁই	"	কাশ্যপ	মৌলিক	"
শ্রীসত্যচরণ কর	মেদিনীপুর	"	কর	"	মধুকোল্য	মৌলিক	"
শ্রীযজ্ঞেশ্বর নাগ	চন্দ্রকোনা	"	নাগ	"	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	"

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী।

মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিত।

দক্ষিণদাঁড়া সমাজ সপ্তগ্রাম প্রদেশে গঠিত হইয়াছিল, অতএব কুশদহবাসী সপ্তগ্রামী সমাজের সন্ততিগণের দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজকে পিতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বনামধন্য পুরুষ ৺ গোবর্দ্ধন রক্ষিত এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাম্বূলী কুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাত্রা করিবার সময় তাঁহার দেশবাসী গোবর্দ্ধনের নাম করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে। তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির গোবর্দ্ধন রক্ষিত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে গোবর্দ্ধনের নাম কেবল মাত্র তাম্বূলী কেন, হিন্দু মাত্রের নিকট প্রসিদ্ধ ও গণনীয় হইয়াছে। কলিকাতার মাড়ওয়ারী বণিকগণ ঐ মন্দিরের পরিবর্ত্তে অধিকতর সৌষ্ঠবশালী দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। দেবস্ব রক্ষক মোহান্ত মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করেন। আমরা গোবর্দ্ধন রক্ষিতের জীবনী তদ্বংশীয় শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রক্ষিতের নিকট যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন ১০৯৮ সালে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কর্জ্জনা গ্রামে তাম্বূলী বংশে গোবর্দ্ধনের জন্ম হয়। গোবর্দ্ধনের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গোবর্দ্ধনের জন্মের দুই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জননী দীনহীনা কাঙ্গালিনীর ন্যায় অতি কষ্টে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সাহায্যে কুমারের লালন পালন করেন। ক্রমে অন্নাশনের কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অতি সামান্যভাবে অন্নপ্রাশন সমাধা করিলেন। তিনি কাট্‌না কাটিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য যে সাদা গড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বস্ত্র ও অপরাংশ চাদর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু আমাদিগের বংশে অন্নপ্রাশনকালীন বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে চেলী কিম্বা গরদের জোড় বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্ব প্রথা আমরা অদ্যাপি অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ক্রমে গোবর্দ্ধনের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম দেখিয়া তাঁহার জননী বিদ্যাশিক্ষার্থ গ্রাম্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বৎ-

সামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, জননীর কষ্ট দেখিয়া তিনি লেখা পড়া পরিত্যাগ করতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কোন এক আত্মীয়ের কারবারে সামান্য বেতনে প্রবিষ্ট হন। গোবর্দ্ধনের এত অল্প বয়সে ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কার্য্যপটুতা দেখিয়া ধনী তাঁহাকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহ্লাদে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের কিছুদিন পরে গোবর্দ্ধন চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, সংসারের ভার ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইতেছে, সুতরাং চাকরি করিয়া এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। এই সিদ্ধান্তে তিনি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের আশয়ে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলীর অন্তঃপাতি সন্ধিপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে কতকগুলি জোলা ও ইতর শ্রেণীর লোকের বাস। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সামান্য ব্যবসায়ের পক্ষে এই স্থান বিশেষ উপযুক্ত। তাঁহার জীবনের উন্নতির এই প্রথম সোপান। ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া জননী ও পত্নীকে কর্জ্জনা হইতে সন্ধিপুর গ্রামে লইয়া আসিলেন। ব্যবসায় সূত্রে গোবর্দ্ধনের সন্ধিপুরে বাস। ক্রমশঃ ঐ ব্যবসায় হইতে উন্নতি করিয়া পরিশেষে রীতিমত দোলোচিনি ও সুপারির ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন। সন ১১২৮ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামনারায়ণের জন্ম হয়। ক্রমে তাঁহার আরও চারিটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম রামনিধি, কালীচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় ও বিদেশীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ সময় গোবর্দ্ধন ধর্ম্ম ব্যবসায়ের দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সন্ধিপুর গ্রামে তাঁহার প্রসিদ্ধ অতিথিশালা ছিল। অনাথ আশ্রম কার্য্যক্ষম সুযোগ্য কর্ম্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। অতঃপর একদিন দৈবঘটনায় তাঁহার সন্ধিপুর গ্রামের দোকানাদি ও বাসস্থান অগ্নি লাগিয়া ভস্মসাৎ হয়; কেবল মাত্র একখানি সুপারির গোলা অবশিষ্ট থাকে। ঘটনার দিবস গোবর্দ্ধন ঘরগইল গ্রামের কারখানা হইতে সন্ধিপুরে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিলেন এবং কহিলেন, অদ্য তোমার বাটীতে বিশেষ পরিতোষের সহিত আহার করিয়াছি—কিন্তু মুখশুদ্ধি হয় নাই। এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন এই বিষয়

ভাবিতে ভাবিতে গ্রামের প্রান্ত সীমায় আসিয়া শুনিলেন, অগ্নিদাহে 'গৃহ বাটী এবং দোকান পাট প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি হায় কি করিলাম, চিনিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুপারির গোলা ব্যতীত সমস্তই সর্ব্বভূকের উদরসাৎ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকাইয়া যথাশাস্ত্র সুপারির গোলা অগ্নিদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অগ্নিদাহে তাঁহার ব্যবসায় কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই বরং বিপুল অর্থ উপার্জ্জিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন কালীভক্ত ছিলেন। সন্ধিপুরের নিকটবর্ত্তী কাপড়পুর বাগাণ্ডা নামক গ্রামে কালীপূজার দিন উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও দানাদি করিয়া আসিতেন। কথিত আছে যে, উক্ত কালিকাদেবী গোবর্দ্ধনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার মন্দিরের পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা লইয়া দেবী মূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিষ্ঠা করিলে আমি তাহাতে আবির্ভূত হইব। গোবর্দ্ধন দেবীর আদেশমত মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শিব ও বিষ্ণু স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল দেবদেবীর দৈনিক সেবা ও অতিথিশালার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। গোবর্দ্ধন ধর্ম্মপরায়ণ, উদারচেতা ও সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন। লোক মুখে শুনা যায় যে, এখন যথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত, ঐ স্থান টাউড়কাঁটার জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও রামনগর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ গ্রামে মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ বাস করিত। সে দধি দুগ্ধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার ভৃত্যেরা মাঠে গরু চরাইতে লইয়া যাইত। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটি দুগ্ধবতী গাভি ঐ টাউড়কাঁটার বনে প্রবেশ করিয়া তারকনাথ দেবের মস্তকে দুগ্ধ বর্ষণ করিত। মুকুন্দ ঘোষ গাভির দুগ্ধ না দিবার কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া রাখাল বালকগণকে তিরস্কার করিত। মুকুন্দের তাড়নায় রাখাল বালকগণ প্রপীড়িত হইয়া কে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাখালগণ কতিপয় দুগ্ধবতী গাভির অনুসরণ করিয়া দেখিল যে, টাউড়কাঁটার বনমধ্যস্থ প্রস্তর খণ্ডের উপর এক এক করিয়া দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে। এই সংবাদ রাখালেরা মুকুন্দ ঘোষকে জ্ঞাপন করিল এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করাইল। মুকুন্দরাম ঐ প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা

ভাবিয়া সেই স্থান পরিষ্কার করতঃ ক্ষমতা মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে তারকনাথ দেব গোবর্দ্ধনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দাও। গোবর্দ্ধন আদেশমত সত্বর উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোবর্দ্ধন কলিকাতার কোন এক মহাজনকে এক শত বস্তা চিনি নমুনা দৃষ্টে ধার্য্য দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মহাজন নমুনামত চিনি নয় বলিয়া গোল-যোগ উপস্থিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল, দরে বাট্টা করিবে; গোবর্দ্ধন তাহাতে অস্বীকার করিয়া ঐ বস্তা গুলি অন্যকেও বিক্রয় না করিয়া গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইনি নানা স্থান হইতে স্বজাতি কুটুম্বকে আনাইয়া নিজ অর্থে তাহাদিগের বসবাস নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্থাপনাও করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তিনি বেশ ভূষা ও আবাসবাটীর চাকচিক্যে লক্ষ্য রাখিতেন না। তাঁহার পরিধেয় বসন পাঁচি ধুতির বন্দোবস্ত ছিল। তিনি দীন দরিদ্র লোকদিগকে অর্থ দান করিতেন। কোন ভদ্র লোকের অবস্থান্তরিত দেখিলে ছলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক, অর্থ দানে তাঁহার অভাব মোচন করিতেন। তিনি এইরূপ ব্রতে ব্রতী থাকিয়া ক্রমে হুগলী ও বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন দ্বারা সাধারণের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন। নিজের স্বার্থ বা নামের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া ঐ সকল দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন এবং তাঁহাদের নামেই উৎসর্গ করিতেন।

বর্ত্তমান তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ ষ্টেশনের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্ত সীমায় ঐ সময় গোবর্দ্ধন একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং সেই কারণ কয়েক দিন তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তথায় অবস্থানকালে কি ভদ্র, কি ছোট, সর্ব্বশ্রেণীর লোক সকল সমবেত হইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হয় এবং বরিষাকালে ডানকুনির মাঠ অতিক্রম করিয়া বৈদ্যবাটী পৌঁছনার কষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল। ইহা অবগত হইয়া গোবর্দ্ধন উক্ত পুষ্করিণীর নিকট হইতে মল্লা সীমূলা গ্রাম পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ পথের নাম রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। গোবর্দ্ধনের এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া কতকগুলি

দুষ্ট লোক ষড়যন্ত্র করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি ঐ সকল কার্য্য সাধারণের ভাবিয়া রাজাকে না জানাইয়া বিনা সনন্দে অবাধে করিয়া আসিতেছিলেন, দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ঐ সময় তারকেশ্বরের সন্নিকট মোড়া নামক স্থানে একটি জলাশয় খনন করান। এই জলাশয় এরূপ স্থানে হইয়াছিল যে, এই গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের লোক সমূহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

বারম্বার এইরূপ অভিযোগ হওয়ায়, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর গোবর্দ্ধনকে অত্যাচারী ও রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্রি ও তৎসঙ্গে একটি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী সন্ধিপুর গ্রামে পাঠাইয়া দেন। যৎকালে মহারাজপ্রেরিত আমলাগণ সন্ধিপুর পৌঁছিয়াছিলেন, সেই সময় গোবর্দ্ধন বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। ঘরগোয়াল গ্রামে আপনার চিনির কারখানায় ছিলেন। রাজকর্ম্মচারী গোবর্দ্ধনকে না পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। গোবর্দ্ধন এই সমাচার পাইবামাত্র বার হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া রাজ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ রামনারায়ণের জবানবন্দি লইতে ছিলেন। গোবর্দ্ধনের কাতর আবেদনে মহারাজ ঐ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহার বাচনিক দরখাস্ত শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? কি জন্য বিনা এত্তেলায় ও সনন্দে যথা তথা পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া আমার ক্ষতি কর? এ ক্ষতির উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না যে, এই রূপ ক্ষতিকারী লোক রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য? ইহা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন, আমার নাম গোবর্দ্ধন রক্ষিত। আমি রাজসংসারের কোনই ক্ষতি করি নাই। বরং রাজকোষের ব্যয় বাহুল্য হ্রাস করিয়াছি। আমি সাধারণের উপকারার্থ ও মহারাজের সুনামের জন্য যথা তথা পুষ্করিণী ও পথাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকি। যে স্থানে মহারাজার প্রজাবৃন্দ জলকষ্টে প্রপীড়িত ও জলের জন্য কুলনারীরা গ্রামান্তরে যাইয়া জীবনানয়নে জীবন রক্ষা করে, আমি তাহাদের অভাবমোচনে সেই সেই স্থানে পুষ্করিণী খনন করাই। এ কার্য্য রাজকীয় ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাজার কার্য্য প্রজার কষ্ট নিবা-

রণী। আর বস্তুতঃ এ কার্য্যে আমার অথবা আমার বংশাবলির কোনই স্বার্থ নাই। সাধারণের যেথানে জলকষ্ট, সেইথানেই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছি ও বেদবিধি মতে ঐ সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া কোন স্থলে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অভাবে মহারাজার নামে উৎসর্গ করিয়াছি। বর্দ্ধমানাধিপতি গোবর্দ্ধনের এই সকল উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, তুমি বিনা এত্তেলায় রাজধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্য করণ অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায়, তোমাকে ১০০১৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা গেল। গোবর্দ্ধন মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বাহকদিগকে রাজসমীপে সমস্ত টাকা আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র বাহকেরা সমস্ত টাকা লইয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ অধিক টাকা দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন, তুমি বিচারে যাহা দণ্ডিত হইয়াছ, তাহাই প্রদান কর। গোবর্দ্ধন ইহা শুনিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, বাটী হইতে আসিবারকালে মহারাজার নামে এই সকল টাকা আনিয়াছি, সুতরাং এই টাকায় আমার আর অধিকার নাই। মহারাজ বলিলেন, দণ্ডিত টাকার অধিক গ্রহণ করিলে আমার দান গ্রহণ করা হয়, সুতরাং দণ্ডিত অর্থের অধিক আমি লইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু গোবর্দ্ধনের একাগ্রতা ও বিনয় দর্শনে মহারাজ অবশেষে ঐ সমস্ত টাকা অর্থাৎ ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এবং কহিলেন, তোমার অসীম রাজভক্তি দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদানে প্রস্তুত আছি। এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাতিশয় প্রীত হইয়া মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, বিনা সনন্দে অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে মহারাজার অধীনস্থ যথা তথা সাধারণের ব্যবহারের জন্য যেন পুষ্করিণী খনন ও পথাদি প্রস্তুত করাইতে পারি। মহারাজা তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম না। তোমার নিজের ও অন্যের ব্যবহারের জন্য আর কিছু প্রার্থনা কর। তাহাতে গোবর্দ্ধন গোচারণের জন্য কিছু জমী প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত এক বন্দে গোবর্দ্ধনকে ৪০০ বিঘা জমী প্রদান করিলেন। অদ্যাপি ঐ জমী গোবর্দ্ধনের বসত বাটীর পশ্চিম মাঠে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবর্দ্ধনের এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব

দেখিয়া তাঁহার বিনা প্রার্থনায় আরও কিছু জমী দিয়াছিলেন। তিনি মনের আনন্দে বর্দ্ধমান হইতে সপুত্রে দেশাগমন করিলেন। এবং রাজার আদেশ মত ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওবার পর, এক দিন তিনি পুত্রগণকে নিকটে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না—তোমরা সকলে আমার নিকট হইতে কিছুদিন স্থানান্তরে যাইও না। পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্রগণ তাঁহার সন্নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য আমাকে কালিকা দেবীর মন্দিরসমীপে লইয়া চল। পুত্রগণ আদেশ মত কার্য্য করিলেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় আসন্নকাল নিকট দেখিয়া গোবর্দ্ধন পুত্রগণকে বলিলেন, অদ্য আমার মৃত্যু হইবে। মৃতদেহ বড় পুষ্করিণীর ঈশান কোণে দাহ করিবে। এই কথা বলিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সন ১১৮৭ সালে কালিকা দেবীর সম্মুখে মহাত্মা গোবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে, দাহাদি কার্য্য শেষ হইলে অকস্মাৎ বড় পুষ্করিণীর জল স্ফীত হইয়া দাহ স্থান প্লাবিত করিয়াছিল।

বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামীর সহিত হুগলীর দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামীর তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে ধরিতে গেলে কেবল আদি ৪২ গ্রামী কেন, অপরাপর যে কয়েকটী সম্প্রদায় আছে,তন্মধ্যে ১৪ গ্রামী ব্যতীত এই সম্প্রদায়ই উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর অসদ্ভাব নাই। অপরাপর সমাজে বিএ, বিএল, পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এ, মে, পর্য্যন্ত আছেন। ইহার নাম শ্রীবিপিনবিহারী দে, নিবাস ভদ্রকালী। এক্ষণে ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন। কলিকাতাস্থ শ্রীচুনীলাল দত্ত, ভদ্রকালী নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে এবং টালা নিবাসী শ্রীবামাচরণ রক্ষিত অকৃতকার্য্য হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দের বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য-সেবী মাত্রেই ইহার নাম অবগত আছেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও অসীম বিদ্যানুরাগের

জন্য ইনি "কাব্যরত্ন" ও "উদ্ভট সাগর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভট কবিতা ও দেবদেবীর লুপ্তপ্রায় স্তব সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচুনীলাল দত্ত চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন। শ্রীরামযাদু রক্ষিত, শ্রীসাধনচন্দ্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীভুবনমোহন দে, শ্রীকুঞ্জবিহারী, শ্রীভোলানাথ দে, শ্রীশীতলচন্দ্র দে, শ্রীযোগীন্দ্র লাহা, শ্রীঅনিলচন্দ্র নন্দী, শ্রীনলিনীকান্ত লাহা ও শ্রীবিপিনবিহারী লাহা—ইহাদের মধ্যে তিন জন মাত্র এফ, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েন। এই সমাজে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা চতুর্দ্দশ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীবিনোদবিহারী নাগ ও শ্রীকেদারনাথ দে—এই তিন জন বৃত্তিভোগী। অবশিষ্ট একাদশ জনের নাম নিম্নে লিখিত হইল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীচুনীলাল রক্ষিত, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীনৃত্যহরি দে, শ্রীক্ষেত্রমোহন দে, শ্রীহেমচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীগিরীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীবিনোদবিহারী নন্দী, শ্রীরজনীকান্ত নন্দী, শ্রীঅনিলচন্দ্র সেন ও শ্রীগোপালচন্দ্র পিরি। ইহাদের অবলম্বন সকলের সমান নহে। কেহ কেহ ব্যবসায়, কেহ কেহ চাকরি ও কতকগুলির এখনও পাঠ্যাবস্থা। এই সমাজে জমীদারের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তন্মধ্যে মক্ষিপুর নিবাসী শ্রীরামযাদু রক্ষিত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, যাদববাটী নিবাসী শ্রীঅনিলচন্দ্র সেন, বোরাইপুর নিবাসী শ্রীক্ষীরদাপ্রসাদ নন্দী, পারভুবুট নিবাসী শ্রীহৃদয়নাথ সেন, পাঁতাসে নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, জয়ন্তী নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লাহা ও গোপালপুর নিবাসী শ্রীহরিচরণ পাল। ইহারাই এক্ষণে জীবিত ও উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি। শ্রীরামযাদু ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত ইহারা দুইজনেই মক্ষিপুর নিবাসী স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা যে কেবল জমীদার বলিয়া খ্যাত তাহা নহে, ব্যবসায়ী মধ্যেও ইহাদের সুনাম আছে। শ্রীরামযাদু রক্ষিত এক জন খ্যাতনামা বস্ত্রব্যবসায়ী। ধনে, কৌলিন্যে, শিক্ষা ও সমাজে সর্ব্বাগ্রেই ইঁহাদের আসন। ধর্ম্ম প্রসঙ্গেও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। মক্ষিপুর হরিসভা তাহার দৃষ্টান্ত। সাহিত্য-সেবীর মধ্যেও ইনি আসন পাইতে পারেন। ইঁহার প্রণীত "ধর্ম্ম সুহৃৎ" তাহার সাক্ষ্য।

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীরামযাদু রক্ষিত	সন্ধিপুর	জমীদারী ও ব্যবসায়	রক্ষিত	”	দধিচি	মৌলিক	রম্ভাবতী রক্ষিত
শ্রীহেমচন্দ্র রক্ষিত	কাশীপুর	”	রক্ষিত	”	কাশ্যপ	কুলিন	দম্পাল রক্ষিত
শ্রীগোপাল চন্দ্র চেল	সন্ধিপুর	”	চেল	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	”
শ্রীকেদারনাথ আশ	বাগুড়ি	”	আশ	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	”
শ্রীঅধরচন্দ্র সেন	সন্ধিপুর	”	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	কুলিন	কন্নসেনী সেন
শ্রীলোকনাথ সেন	কুন্তিরমোড়া	”	সেন	মধুগ্রাম	কাশ্যপ	মৌলিক	মধুগ্রামী সেন
শ্রীরাজারাম পিরি	সন্ধিপুর	”	পিরি	”	কাশ্যপ	মৌলিক	”
শ্রী হরিচরণ লাহা	সন্ধিপুর	”	লাহা	”	শাণ্ডিল্য	কুলিন	বলসিংহ লাহা
শ্রীঠাকুরদাস দাস	সন্ধিপুর	”	দাস	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	”
শ্রীচন্দ্রকান্ত নন্দী	পাতুল	”	নন্দী	”	ব্রহ্মঋষি	মৌলিক	”
শ্রী দীননাথ সোম	যাদববাটী	”	সোঁ	”	কাশ্যপ	মৌলিক	সোমশব্দের রূপান্তর
শ্রী চন্দ্রনাথ গুঁই	সন্ধিপুর	”	গুঁই	”	কাশ্যপ	মৌলিক	”
শ্রীশীতলচন্দ্র দাঁ	সন্ধিপুর	”	দাঁ	”	মধুকোল্য	কুলিন	”
শ্রীখেলারাম কর	সন্ধিপুর	”	কর	”	মধুকোল্য	মৌলিক	”

[illegible]চন্দ্র কোঁচ	[illegible]গঞ্জ	”	কচ	”	মধুকোল্যা	মৌলিক	কচশব্দের রূপান্তর
শ্রীকিশোরলাল কুণ্ডু	মৃজানগর	”	কুণ্ডু	”	সপ্তর্ষি	মৌলিক	”
শ্রীনবকুমার পাল	ফতেপুর	”	পাল	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	”
শ্রীবিপিনবিহারী দে, এম্, এ, ভদ্রকালী	শিক্ষকতা	দে	দেপুর	কপিলঋষি	কুলিন	দেয়ের দে
শ্রীবিনোদবিহারী নাগ	জানবাজার	”	নাগ	”	সপ্তর্ষি	মৌলিক	”
শ্রীহরিচরণ দত্ত	সন্ধিপুর	”	দত্ত	গজস্কন্ধ	ব্যাসঋষি	কুলিন	গজস্কন্ধ দত্ত
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত	ঝিকরা	”	দত্ত	বটগ্রাম	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	বটগ্রামী দত্ত
শ্রীমহেশচন্দ্র খাগ	বাগুড়ি	”	খাগ	”	কাশ্যপ	মৌলিক	গ ও ক উচ্চারণে
							ভেদ মাত্র
শ্রীশ্রীনাথ সরকার	যাদববাটী	”	”	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	আশ্রম লিখিতে
							পারা গেল ন
শ্রীশ্যামাচরণ সায়	নিলারপুর	”	সায়	”	শাণ্ডিল্য	মৌলিক	য় ও র উচ্চারণ
							ভেদ মাত্র।
শ্রীকেদারনাথ দে	ঝিকরা	”	দে	চাকুলে	কাশ্যপ	মৌলিক	চোকালের দে

কুশদহের সপ্তগ্রামী

হুগলীর দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামীর বাস যখন সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে, তখন উপরোক্ত সম্প্রদায় হইতেই সপ্তগ্রামী সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে হইবে।

সপ্তগ্রাম হইতে এই সমাজের নামকরণ, সুতরাং সপ্তগ্রামের ইতিহাস এস্থলে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সপ্তগ্রামের চলিত নাম সাত গাঁ। বস্তুতঃ সপ্তগ্রাম যে সাত খানি গ্রামের সমষ্টি, তাহা নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। বঙ্গদেশের রাজধানী ও সুবৃহৎ বন্দর বিধায় ইউরোপ, ইরান, চীন, তুরান, আরব ও পারস্যের বণিকগন বাণিজ্যার্থ এস্থানে যাতায়াত করিতেন। বর্ত্তমান হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম বন্দর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। পূর্ব্বে এস্থানে এক দুর্গ ছিল। ভাগীরথী যতদিন সপ্তগ্রামকে বক্ষে রাখিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-পোত সপ্তগ্রামে গতায়াত করিত। অনুমান ১৫৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সমভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল। পরে তত্রস্থ সরস্বতী নদী শুষ্কপ্রায়া হওয়ায় ও ভাগিরথীর স্রোত শ্রীরামপুরের পূর্ব্বদিক দিয়া গমন করায়, বঙ্গের এই প্রাচীন রাজধানী নষ্ট হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে হুগলীর উন্নতি হইতে থাকে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বঙ্গেশ্বর জাফর খাঁর অসম্মান করায়, জাফর খাঁ সম্রাটের নিকট হইতে এ স্থানের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যাহা হউক, জাফর খাঁ অতি বিচক্ষণতার সহিত এই স্থান শাসন করেন ও তাঁহার সময়ে এই স্থানের সমূহ উন্নতি হয়। মোগলেরা বিদেশীয়দিগকে এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিতেন না, তবে বাণিজ্যাগার স্থাপনের বিরোধী ছিলেন না। এক দিন যেখান দিয়া সুবৃহৎ অর্ণবযান সকল গতায়াত করিত, আজ তদুপরি বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে। রেলওয়ে কোং তজ্জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই নগরের শাসনকর্ত্তা অত্যাচার আরম্ভ করায়, প্রজাবৃন্দ পলাইয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লয়। তদবধি কলিকাতার উন্নতি হইতে থাকে। পলায়িত-দিগের মধ্যে বাণিজ্য নিরত তাম্বুলীগণ কুশদহের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তাঁহারা যথায় বাসস্থান সন্নিবেশিত করেন, অপর দুই কারণে রাঢ় হইতে অনেকগুলি পরিবারকে স্থানান্তরিত হইয়া কুটুম্বদিগের সহিত নব প্রতিষ্ঠিত পল্লীতে মিলিত হইতে হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের শাসন কর্ত্তার অত্যাচার স্থানীয় মাত্র ছিল। কিন্তু স্থান ত্যাগের অপর কারণ পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামা ও তদপেক্ষা ভীষণ রাজস্ব আদায়ের উৎপীড়নে সকল জাতীয় লোককে বাসস্থান পরিত্যাগ করাইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমরা তৎকালের বঙ্গের অবস্থা গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"১৭৪১ অব্দে প্রতাপশালী আলিবর্দ্দীর রাজ্যকাল। উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা মিরজা বাথর ও তাহার মন্ত্রী মীরহবীব পদচ্যুত ও পরাজিত হইলেন। কিন্তু পদচ্যুত মিরজাবাথর পুনরায় উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া পুনরায় পরাজিত ও দূরীভূত হইলেন। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা শান্ত হইল। আলিবর্দ্দীও উড়িষ্যা হইতে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই ঘোর উপদ্রব। জল প্লাবনের জলের ন্যায় যেন সৃষ্টিনাশ মানসে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নৃত্য করিতে করিতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। নবাব মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে উড়িষ্যার প্রত্যাগত সৈন্যও ছিল। কিন্তু সে সৈন্য সমুদ্রবেগের মুখে তৃণের তুল্য। বর্দ্ধমান রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দী দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন বর্দ্ধমান দগ্ধ হইতেছে। সন্ধিতে হতাশ হইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, তাঁহার অশ্ব, শকট, আহারীয় দ্রব্য ও তাম্বু আদি কিছুই নাই। সমস্তই মহারাষ্ট্রীয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন তিনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণের উপর বিশ্বাসঘাতকতার শঙ্কা হইল। তিনি নিশাকালে সিরাজের সহিত প্রধান সেনাপতি মস্তফার শিবিরে গিয়া কহিলেন, মস্তফা! আমাদের প্রাণবধ কর। মস্তফা লজ্জিত হইয়া নবাবের সহিত কাটোয়া রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাৎগামী হইলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, কাটোয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মুরশিদাবাদ রক্ষার জন্য যত্ন। কিন্তু দেখেন, তাহাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সখা মীরহবীব লুণ্ঠন করিয়াছে। বীরভূমের জন্য প্রয়াস, তাহাও মহারাষ্ট্রীয়েরা বিনষ্ট করিয়াছে।

তখন পরিশ্রান্ত ও পরাভূত নবাব হতাশ হইয়া পরিবার সহ গঙ্গাপার হইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিলেন। ভাগিরথীর দক্ষিণ পার্শ্ব শূন্যময় হইল। সম্রাট এই সময়ে রাজস্বের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দী কর্ণপাত না করিয়া বিপুল সৈন্য সহকারে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, মুরশিদাবাদের নিকট অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ ভাস্করের প্রভু রঘুজী চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতেছেন। তাহার পশ্চাতে সম্রাট প্রেরিত বালাজী বাঙ্গালা রক্ষার ব্যাজে অপর এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত। নবাব বালাজীকে ভূরি অর্থ দিয়া লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বালাজী সেই অর্থ ও রঘুজীর লুণ্ঠিত অর্থ পুনর্লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুজীর বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত। আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কাটোয়ার নিকট গোবড়ার চড়ে ভাস্করের প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই মুস্তফার বিদ্রোহ। মুস্তফা রঘুজীকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান মাত্রেই বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে অগ্নি ক্ষেত্র। গ্রাম দগ্ধ, ক্ষেত্র দগ্ধ ও উদ্যান দগ্ধ হইতে লাগিল। রঘুজী কাটোয়ায় পরাজিত ও মুস্তফা বিহারে হত হইল। পরক্ষণেই সমসেরের বিদ্রোহ ও মীর হবীবের সহ মহারাষ্ট্রীয়দের বাঙ্গালায় পুনঃ প্রবেশ। বিদ্রোহীরা দমন হইল। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। তাহারা অপসৃত হইল, কিন্তু এদিকে সিরাজউদ্দৌলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের পুনর্ব্বার বাঙ্গালা প্রবেশের উপায় হইল। নবাব ক্লান্ত হইয়া কি মহারাষ্ট্রীয়, কি মীরহবীব যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষান্ত করিলেন। মীরহবীব উড়িষ্যার নবাব হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীও পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে দুরন্ত সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার আরম্ভ হইল। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই সিরাজ আপন পিতৃব্য পত্নীর যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ ও সকতজঙ্গকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। এমন পাপই নাই, যাহা এই নরাধম দ্বারা কৃত হয় নাই। এই পাপাত্মার পরই যবন রাজ্য নিঃশেষিত হয়। যবনদিগের শেষ সময়ে প্রজাগণের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দের শব্দ পাইনা-

মাত্রে অতি মাত্র ব্যাকুল হইয়া কেবল দেব বিগ্রহ ও স্ত্রী পুত্রাদি সহ হাহাকার শব্দে সকলে গঙ্গাপারে পলায়ন করিত। পোতবাহীরা মহারাষ্ট্রীদের গঙ্গাপার বন্ধ করিবার জন্য পোত সকল তৎক্ষণাৎ অপরপারে লইয়া যাইত। গঙ্গাপার তখন অরণ্যময় ছিল। নিশাকালে স্ত্রী পুত্র বালক সহ চিন্তায় আকুল হইয়া কত লোক অরণ্যে বিচরণ করিত। ঈদৃশ দুরবস্থাতে ও সর্প দংশনে কাহারও বা স্ত্রীবিয়োগ হইত। কুম্ভীর গ্রাসে কাহারও বা সন্তান নাশ হইত। ব্যাঘ্রের মুখে কাহারও বা প্রাণ বিনষ্ট হইত। কি দুঃখেই পূর্ব্বকাল গত হইয়াছে! যবনদের রাজ্যাপেক্ষা সর্পের বিল, কুম্ভীরের গ্রাস ও ব্যাঘ্রের আবাস নিরাপদ ছিল। তজ্জন্যই তাহারা তথায় আশ্রয় গ্রহন করিতেন। মাতৃভূমির কি মহামায়া! মহারাষ্ট্রীয়েরা বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিলেও সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেন। পরদিনেই ভূম্যধিকারিগণের ভয়ানক করের পীড়ন সহ্য করিতে হইত। লুণ্ঠন করাই তৎকালে কর সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি ছিল। ভূম্যাধিকারিগণ কর সংগ্রহ করিয়া নবাবকে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু প্রেরণের সময় গত হইলে নবাব সৈন্য পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পুনর্ব্বার প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। নবাবও আবার সকল সময় দিল্লীতে কর প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু সম্রাটের লোক আসিবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা রীতিমত সময়ে বর্ষে বর্ষে সগণে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মহারাষ্ট্রীয়দের অত্যাচার অপেক্ষা রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার অধিক ভয়ঙ্কর ছিল। এতকাল গত হইয়াছে, তথাপিও মাতৃগণ প্রায় ভূমিষ্ঠ মাত্রেই শিশুদিগকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের যন্ত্রণা ও রাজস্বের চিন্তা এখনও শ্রবণ করাইয়া থাকেন।"

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?"

এই সমাজের পারিবারিক বৃত্তান্ত কুশদ্বীপকাহিনীতে বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং এই স্থলে আর অধিক বর্ণনায় আবশ্যক নাই।

কুশদ্বীপকাহিনী প্রণেতা ৺ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী তাম্বূলীর ইতিবৃত্ত

যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

কথিত আছে, খাঁটুরার বর্ত্তমান তাম্বূলিগণ খাঁটুরার আদিম নিবাসী নহেন। উহাঁরা পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমান হুগলী সহরের অতি নিকটেই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। তদানীন্তন কালে সপ্তগ্রামের তুল্য বন্দরস্থান বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। বহুকালাবধি ঐ বন্দর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হয়। অনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জাফের খাঁ বঙ্গদেশের নবাবপদে অধিরূঢ় থাকেন, তৎকালে অত্যাচারপীড়িত হইয়া বিস্তর লোক এখান হইতে নানা দিক্‌দেশে গিয়া বসবাস করেন। সেই সময়ে সপ্তগ্রামবাসী ৪২ বেয়াল্লিশ গ্রামী তাম্বূলিগণ কুশদহের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বনগ্রামে, কেহ কেহ শান্তিপুরে, কেহ কেহ বড়া কড়েলা প্রভৃতি স্থানে, কেহ কেহ বাঁকড়ায়, কেহ কেহ মল্লিকপুরে, এবং কেহ কেহ বেড়েলা বৈঁচি প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

খাঁটুরা গ্রামে আজকাল একত্রে যে অধিকাংশ তাম্বুলির বসবাস দেখা যায়, তাহা ইছাপুর গ্রামের জমীদার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের প্রসাদাৎ। তিনি আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাম্বুলিগণকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আনাইয়া খাঁটুরাগ্রামে বসতি প্রদান করেন। তাম্বুলিগণ খাঁটুরাগ্রামে বসবাস আরম্ভ করিলে পর, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণকেও দূরবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে ঐ গ্রামে আসিতে আহ্বান করেন। তদনুসারে আনুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ১০৭০ সালে মহেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেড়েলা বৈঁচি হইতে এখানে আনীত হন। বড়বাড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সময়ে বেড়েলা বৈঁচি হইতে এই গ্রামে উঠিয়া আইসেন।

কেবল যে সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবস্থায় এইরূপে কুশদ্বীপসমাজ তাম্বুলি উপাদানে গঠিত হয়, তাহা নহে। পরন্তু বর্গীর হাঙ্গামা কালেও বিস্তর তাম্বুলি আসিয়া এখানে বাস করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর রাজত্ব। যদিও বর্গীর হাঙ্গামা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবগণের সময় হইতেই মহামারীরূপে বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তথাপি এই দশবৎসরকাল বঙ্গদেশের পক্ষে যে কি কালরাত্রি স্বরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে কত পরিবার গৃহচ্যুত, প্রাণে নষ্ট, অনাহারপীড়িত ও দিক্ বিদেশে পলায়িত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। শুদ্ধ তাম্বুলিগণের কেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণের বর্ত্তমান বসবাসের মূল কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বর্গীর হাঙ্গামা তাহার কারণ। যখন দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রবাহিনী ভীষণ মুখব্যাদান করিতে করিতে যবনকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ভগ্নাবশিষ্ট ধনপ্রাণ গ্রাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া নেপোলিয়ান্ নিপীড়িত ইউরোপবাসীর ন্যায় সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন যে যেদিকে পাইয়াছিল, সে সেই দিকেই পলাইয়াছিল। আজিকালি পেলেগভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতাবাসীগণ যেমন পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী লইয়া দেশদেশান্তরে প্রস্থানপর হইয়াছে, এবং কলিকাতার বহির্ভাগে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ভীতিশূন্য গন্তব্যস্থান অন্বেষণ করিয়া লইতেছে, বর্গীবিধ্বস্ত অথবা বর্গীভয়াকুল বাঙ্গালীও তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া লইয়াছিল। কুশদহ পরগণার মধ্যে খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর, প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম তৎকালে প্রকৃতিদেবী সহজেই দুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। এই কয়েকখানি গ্রামের দক্ষিণ-দিকে বেগবতী স্রোতস্বতী ইছামতীর সঙ্গে যমুনানদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রসন্নসলিলা খরস্রোতা চালুন্দিয়া নাম্নী অপর এক হ্লাদিনী বিপক্ষের বল উপেক্ষা করিয়া ও শত শত পণ্যপোত বক্ষে লইয়া ইহার অপর তিন-দিক্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। কালের কুটিলগতিতে যদিও শেষোক্ত হ্লাদিনী নিয়তির অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়াছে, তথাপি আজিও ইহার কোন কোন অংশ নানাবিধ বিলখালে পরিণত হইয়া দুর্ভাগ্যের কঠোর পরিণাম প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিয়দংশ আজও, "কঙ্কণা" বা "বামোড়" নাম পরিগ্রহ করিয়া খাঁটুরা ও হয়দাদ্‌পুরের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বর্গীর হাঙ্গামাকালে চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বংশবন সমাকীর্ণ দুরাক্রম্য স্থান সকলই সাধারণ ভদ্রমহাশয়গণের বাসোপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইত।

তদনুসারে তাম্বুলিগণ খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গা গ্রামই সমধিক বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা তাম্বুলিগণকে পূর্ব্বোক্ত মল্লিকপুর, বনগ্রাম, বড়া, কড়েলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বর্গীগণের হঠাৎ অনাক্রমণীয় গ্রামে বাস প্রদান করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত কয়েক বংশীয় তাম্বুলির নাম নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম। এই তাম্বুলিগণ যে যে স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের নামানুসারে খাঁটুরা গ্রাম এক এক বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই খাঁটুরার প্রত্যেক পল্লীতে এক এক বংশীয় ভিন্ন অপর বংশীয় তাম্বুলী দৃষ্টিগোচর হয় না। খাঁটুরা প্রধানতঃ আশপাড়া, পালপাড়া, দাঁপাড়া, সেনপাড়া, বাজারপাড়া, রক্ষিতপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তিওরপাড়া, কলুপাড়া, নিকারিপাড়া, কাওরাপাড়া, হাড়িপাড়া, ও কুমারপাড়া, এই কয়েক ভাগে বিভক্ত।

খাঁটুরাতে নিম্নলিখিত কয়েক ঘর তাম্বুলী প্রথমে বাস করেন। যথা:— দত্ত (১); সেন (২); আশ (৩); রক্ষিত (৪); চেল (৫); পাল (৬); দে (৭); কোঁচ (৮); কুণ্ডু (৯) এবং কর (১০)।

* খাঁটুরা গ্রামের যৎকালে সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল, তখন গোবরডাঙ্গা নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। খাঁটুরাতে তৎকালে একটী প্রসিদ্ধ বাজার ও একটী নিমক্ মহল ছিল। ঐ বাজারটী এক্ষণে "পুরাতন বাজার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়াই, তদানীন্তন আর আর সন্নিহিত গ্রামবাসীগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। গোবরডাঙ্গায় যেমন বর্ত্তমান বাজার আছে, খাঁটুরাতে ঐরূপ বাজার ছিল। অনুমান ১২৪৭ বঙ্গাব্দে কমল কর্ম্মকারের দোকানে প্রথমতঃ অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যায়। পরে গোবরডাঙ্গার জমীদার কালীপ্রসন্ন বাবু গোবরডাঙ্গায় বাজার প্রবল করাতে ক্রমে ক্রমে এই বাজার ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া এক্ষণে একেবারে লোকদৃশ্যের অগোচর হইয়াছে। এক্ষণে খাঁটুরা আমতলার হাটে বাজার হয়। সন ১২০৩ সালে ৺ শ্যামাচরণ সেনের দ্বিতীয় পত্নী বিনোদিনী দাসী ঐ স্থানে চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

কমল কর্ম্মকারের অগ্নিদাহের পর হইতে তাম্বুলিগণ দুই এক জন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া বিদেশে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। সর্ব্ব প্রথমে রাজকুমার আশ মহাশয় বরাহনগরে উঠিয়া আসেন। তৎপরে তাঁহার দেখাদেখি শরচ্চন্দ্র সেন, হারাণচন্দ্র পাল, দর্পনারায়ণ প্রভৃতিও বরাহনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

তৎকালে এদেশে, তাম্বুলি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেরূপ সৌহার্দ্দ্য দেখা যাইত, এরূপ আর কুত্রাপিও ছিল না। তখন তাম্বুলিগণই খাঁটুরায় ব্রাহ্মণ-গণের শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাম্বুলিগণের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেন। উভয় পরিবার পরস্পরের এতদূর হিতার্থী ও সুহৃদ্ ছিলেন, যে শুদ্ধ মাত্র পাকপৈতার প্রভেদ ভিন্ন ইঁহাদিগকে অন্য কোন রূপে প্রভেদ বলিয়া বোধ হইত না। উভয়ে উভয়কে এতদূর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, যে একটী সামান্য তাম্বুলিতনয়ের জন্য গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রাণবিসর্জ্জন করিতে ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্তু হায়! এক্ষণে আর সে দিন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ ও তাম্বুলীগণ এক স্থানে আহার, একাসনে শয়ন, এক স্থানে উপবেশন, এক লক্ষ্যে লক্ষ্যবান্, একার্থে অর্থবান্ এবং একের জন্যে অন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, আজি কালি সহানুভূতির অভাবে কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। বর্ত্তমান তাম্বুলিগণের পূর্ব্বপিতামহগণ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, দানে, দীক্ষায়, এমন কি, সামান্য ষষ্ঠী পূজা হইতে বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ডে হোতা, তন্ত্রধার ও সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতেন। সেই জন্যই এখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাম্বুলিগণ বাণিজ্যের অনুসরণ করিয়া যেমন একদিকে লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্ররূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে এখানকার ব্রাহ্মণ মণ্ডলীও নির্ব্বিঘ্নে শাস্ত্রানুশীলন করিয়া সরস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয়জাতির সম্মিলিত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গাও এক সময়ে কুশদহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

এক্ষণে খাঁটুরা গ্রাম তাম্বুলিগণের বাণিজ্য প্রভাবে যেমন মহাধনশালী

হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে উহাঁর অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তাম্বুলিগণ আজন্ম ব্যবসায়-প্রিয়; কিন্তু আজিকালিকার ন্যায় তৎকালে কাহারও কোন নির্দ্ধারিত ব্যবসায় বা আড়তাদি ছিল না। শিমূলপুর, মধুসূদনকাটি, বিষ্ণুপুর, বড়া, কড়েলা, মল্লিকপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান হইতে উহারা ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের যত্নে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা এক একটী গোলাবাড়ী ও খামার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই খানে গিয়া তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য করিতেন।

মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে ফকির চাঁদ দত্তের সময় পর্য্যন্ত খাঁটুরার তাম্বুলিগণ এইরূপে মহাজনী ও তেজারতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে ফকিরচাঁদের সময় হইতেই ইহারা কলিকাতায় দোকান ও আড়তাদি করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করেন ও বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে পরিগণিত হন। আমরা শুনিয়াছি, ফকিরচাঁদ দত্ত প্রথমে বলদে করিয়া চাঁদুড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া খাঁটুরার বাজারে বিক্রয় করিতেন। খাঁটুরার দত্ত পরিবারেরা আজিও বিজয়াদশমী যাত্রার দিনে, ফকিরচাঁদ ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে রক্ষিত কতক গুলি ছালা মাঙ্গল্য দ্রব্যরূপে প্রথমতঃ দর্শন ও প্রণাম করিয়া, পুরোহিত ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের বাটীতে প্রণামাদি করিতে যাত্রা করিয়া থাকেন।

ভিন্ন সমাজের কন্যা গ্রহণ।

গৃহীতা।	দাতার শ্রেণী।	গোত্র।	উপাধি।	বাসস্থান।	নাম।
১। হরিচরণ সেন	৪২ গ্রামী	সপ্তর্ষি	নাগ	সন্ধিপুর	মধুসূদন নাগ
২। ক্ষেত্রমোহন পাল	„	কাশ্যপ	রক্ষিত	উদয়গঞ্জ	রাধানাথ রক্ষিত
৩। রামতারণ আশ	„	শাণ্ডিল্য	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
৪। মঙ্গলচন্দ্র রক্ষিত	„	মধুকৌল্য	সেন	একলকী কোমরগঞ্জ	মানিকচন্দ্র সেন
৫। হরিমোহন সেন	„	কাশ্যপ	রক্ষিত	রামচন্দ্রপুর	গোপালচন্দ্র রক্ষিত
৬। চণ্ডীচরণ রক্ষিত	„	সপ্তর্ষি	কুণ্ডু	বালি দেওয়ান গঞ্জ	গুরুচরণ কুণ্ডু
৭। রাজ্যেশ্বর রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	কুণ্ডু	সাঁড়ুয়া (বর্দ্ধমান)	রামধন কুণ্ডু
৮। যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত	„	„	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
৯। হীরালাল রক্ষিত	„	„	„	„	„
১০। বিষ্ণুপদ রক্ষিত	৮ গ্রামী	„	দে	কলিকাতা, রামবাগান	মাধবচন্দ্র দে
১১। বেণীমাধব দাঁ	৪২ গ্রামী	„	রক্ষিত	রামকৃষ্ণপুর	কেনারাম রক্ষিত
১২। গোপালচন্দ্র রক্ষিত	„	পরাশর	দত্ত	সিলুট নবগ্রাম	রাসবিহারী দত্ত
১৩। ৺ আদাড় সেন	„	„	সিংহ	কল্মীঘোড়	যজ্ঞেশ্বর সিংহ
১৪। ৺ ষষ্টিচরণ রক্ষিত	৪২ গ্রামী	কপিলর্ষি	দে	জাড়া (মেদিনীপুর)	শ্রীমহচন্দ্র দে
১৫। ৺ নৃত্যগোপাল দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	সেন	কল্মীঘোড়	গোলকচন্দ্র সেন

১৬। ৺ গোপালচন্দ্র পাল	”	”	”	”		”
১৭। ৺ বঙ্কুবিহারী সেন	...	...	...	...	...	...
১৮। ৺ রামকৃষ্ণ চেল	...	...	...	...	...	...
১৯। ৺ উমাচরণ রক্ষিত	...	...	...	...	...	..
২০। ভগবানচন্দ্র দাঁ	...	...	..	...	...	...
২১। ৺ গোপীমোহন রক্ষিত	...	...	...	...	...	...
২২। চন্দ্রনাথ রক্ষিত	৪২ গ্রামী	মধুকোগ্যা	দত্ত	থানাকুল কৃষ্ণনগর	...	মধুসূদন দত্ত

১৪ গ্রামী সমাজের ন্যায় সপ্তগ্রামী সমাজে ভিন্ন শ্রেণীর কন্যা গ্রহণকারীকে কিয়দ্দিন পতিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। সন্তানাদি হইলে ক্রমশঃ সমাজে তাহাদের অন্ন ও বালক বালিকার পরিণয় চলিত হইতে দেখা যায়।

কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজের পরিচয়।

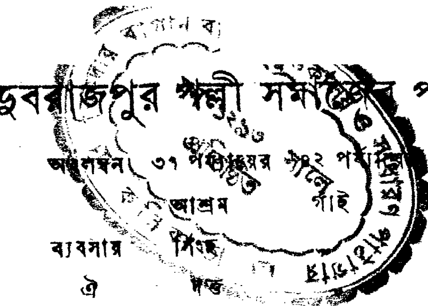
প্রত্যেক বংশের জনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীরামগোপাল আশ	খাঁটুরা	জমিদারী	আশ	„	শাণ্ডিল্য	„	প্রামাণিক আশ
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	খাঁটুরা	জমিদারী ও পাটের বেলারি	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীবিহারিলাল দত্ত	খাঁটুরা	চাকরী	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীসত্যপ্রিয় কোঁচ	হয়দাদপুর,	ভূসম্পত্তি ও ব্যবসায়	কচ	„	মধুকৌল্য	কচ শব্দের রূপান্তর কোঁচ	
শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ,	খাঁটুরা	পাটের ব্যবসায়	পাল	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীসহায় নারায়ণ পাল	খাঁটুরা	লৌহের ব্যবসায়	পাল	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীগোপালচন্দ্র পাল	খাঁটুরা	চিনির ব্যবসায়	পাল	„	কাশ্যপ	„	„
শ্রীউমেশচন্দ্র রক্ষিত	কাশী	ভূসম্পত্তি	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	দামপাল রক্ষিত
শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত	খাঁটুরা	চিকিৎসা	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	বড় রক্ষিত
শ্রীশরৎচন্দ্র রক্ষিত	খাঁটুরা	দেশী চিনির ব্যবসায়	রক্ষিত	„	কাশ্যপ	„	প্রামাণিক রক্ষিত
শ্রীহরিপদ রক্ষিত	খাঁটুরা	ঘৃতের ব্যবসায়	রক্ষিত	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীদিননাথ দাঁ	বরাহনগর	চিনির ব্যবসায়	দাঁ	„	মধুকৌল্য	„	„
শ্রীপাঁচকড়ি সেন	বরাহনগর	সৈনিক চুক্তি	সেন	কর্ণপুর	শাণ্ডিল্য	„	কর্ণমুনী সেন

শ্রীঅবলাকান্ত সেন	খাঁটুরা	সাহিত্য সেবা	সেন	„	কাশ্যপ	„	„
শ্রীশশীভূষণ কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা	ব্যবসায়	কুণ্ডু	„	সপ্তর্ষি	„	„
শ্রীপ্রসন্নকুমার দে	শান্তিপুর	বৈদেশিক চিনির যোজকতা	দে	„	কপিলর্ষি	„	„
শ্রীহরিদাস দে	শান্তিপুর	পুস্তকের ব্যবসায়	দে	চাকুলে	কাশ্যপ	„	চাকুলের দে
শ্রীমহানন্দ দত্ত	খাঁটুরা	ঘৃতের ব্যবসায়	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	„	„

দুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী।

দুবরাজপুরে এই সম্প্রদায়ের কত দিনের বাস, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহারা আপনাদিগের সমাজকে পল্লীগ্রামী সমাজ কহেন। এদিকে আবার বলিয়া থাকেন বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই স্থানে বসবাস হইয়াছে। বীরভূম ও ময়ূরেশ্বর/নয়াদুমকার অন্তর্গত নানা স্থানে ইহাদিগের কুটুম্ব দৃষ্ট হয়। ৭০।৮০ বৎসর গত হইল, জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় জীবিকার প্রশস্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধানার্থ দুবরাজপুর হইতে কয়েকটী দল নয়াদুমকায় বাস পরিবর্ত্তন করেন। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈশাখী পূর্ণিমায় কুল পূজার সময় ইহারা জাতীয় বৃত্তির সহায় স্বরূপ জাঁতি, কাতারি, চূণের ঘট প্রভৃতি কুলদেবতার নিকট রক্ষা করেন। ঐ দিন আবাল বৃদ্ধ কেহ পান বা সুপারি ব্যবহার করেন না। পুরোহিতের দ্বারাই ঐ পূজা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

নয়াদুমকার অন্তর্গত রসিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমঙ্গলাল দে এই সমাজের এক জন বিশিষ্ট জমীদার। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহারাণচন্দ্র দে বি, এল, এক জন উৎসাহী যুবক। দুমকায় ইনি ব্যবহারাজীবের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই সমাজের মধ্যে দে বংশই বিদ্যা ও ধনে আদর্শ পরিবার। এই সমাজ ৬৪৮ ঘরে নামেও কথিত। উপরোক্ত ৬৪৮ ঘর আবার তিন অংশে বিভক্ত। দুবরাজপুর, যশপুর ও হেতমপুর সমাজ। বিবাহ বা অন্য কোন ক্রিয়া উপলক্ষে যাঁহারা ৬৪৮ ঘর কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিতে অশক্ত, তাঁহারা উপরোক্ত তিন সমাজের মধ্যে যে কোন একটি সমাজ লইয়া ক্রিয়া সমাধা করিতে পারেন।



ডুবরাজপুর পল্লী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের অনেক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৩৮২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীউদয়চন্দ্র সিংহ	ডুবরাজপুর	ব্যবসায়	সিংহ		ভরদ্বাজ	মৌলিক	„
শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত	ঐ	ঐ	দত্ত		শাণ্ডিল্য	কুলীন	„
শ্রীরাখালচন্দ্র দে	ঐ	ঐ	দে	„	কপিলর্ষি	ঐ	„
শ্রীখুদীরাম খাগ	ঐ	ঐ	খাগ	„	মধুকোল্য	মৌলিক	„
শ্রীরামরঞ্জন গণ	„	চাকরী	গণ	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ভদ্র	„	„	ভদ্র	„	„	„	„
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন	„	কৃষি	সেন	„	„	কুলিন	„
শ্রীরাখাল দাস ভুঞি	হেতমপুর	ব্যবসায়	ভুঁঞি	„	„	„	„
শ্রীবাগালচন্দ্র ঘোষ	„	„	ঘোষ	„	„	„	„
শ্রীরামসুন্দর কুণ্ডু	„	„	কুণ্ডু	„	„	„	„
শ্রীমহানন্দ আশ	যশপুর	মহাজনী	আশ	„	„	„	„
শ্রীদিনবন্ধু পাল	„	কৃষি	পাল	„	„	কুলিন	„
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রক্ষিত	„	তাম্বূল ব্যবসায়	রক্ষিত	„	„	„	

শ্রীকৈলাশনাথ শীল	নয়াচুমকা	„	শীল	„	„	„	„
শ্রীমহেশ্বর কর	„	„	কর	„	„	„	„
শ্রীঅচিন্তলাল বৰ্দ্ধন	„	„	বৰ্দ্ধন	„	„	„	„

বনকাটীর "গোয়ালপেড়ে" অষ্টগ্রামী।

তাম্বূলী সমাজ মাসিক পত্রে এই সমাজের পরিচয় যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বোলপুর নিবাসী বাবু রাখালদাস ভদ্র মহাশয় বলেন, "আমরা বীরভূম অষ্টগ্রামী সমাজভুক্ত"। আমার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের অনেকেই মেদিনীপুরে আছেন। কিন্তু দূরতা পরিহার জন্য আমরা এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানেই পুত্র-কন্যার বিবাহ আদি দিয়া থাকি। মেদিনীপুরবাসী অষ্টগ্রামী তাম্বূলি মহাশয়েরা, বোধ হয়, এক্ষণে আমাদের চিনিতে পারিবেন না। আমরাও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত। সভা না হইলে, যেমন পুরুষানুক্রমে আমরা অপরিচিতভাবে রহিয়াছি, সেইরূপই থাকিতাম। অতএব সভা এবং আমাদের পত্রিকা পথপ্রদর্শক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ আমাদের সভাকে জীবিত রাখুন। বিবাহ আদি আদান প্রদান কুসংস্কার কাটিলেই ক্রমে হইবে। উপস্থিত আমরা যে কত নূতন নূতন স্বজাতির সহিত পরিচিত হইতেছি, ইহাও কম লাভ কি? অবশ্য ইহাকে আমরা সৌভাগ্য মনে করিতেছি।

"আমাদের দলের কুলচি আছে, কি না, জানি না। কৈ কাহার কাছেও শুনি নাই। কি জন্য, কেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি না। অবশ্য অন্যের জানা থাকিলে বলিবেন। বর্ত্তমানে আমরা বোলপুরে কয়েক ঘর, সিরশায় আন্দাজ ৫ ঘর, ইলামবাজারে অনুমান ২৫ ঘর, বনকাটি অযোধ্যায় অন্যূন ৪০ ঘর এবং সাতকাহুনায় অনুমান ৫ ঘর, এই হইল আমাদের সমাজের পরিমাণ। ইহার মধ্যেই আমরা পুত্র-কন্যার বিবাহ আদি দিয়া পুরুষানুক্রমে সুখ-দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি। আমরা কেহই কৃষক নহি; অতএব আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম এবং তাঁহাদের ঠিকানা নিম্নে লিখিলাম।

পোষ্ট বোলপুর (লুপলাইন) শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর হালদার বি, এ, বি, এল, উকিল বোলপুর এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দে প্রভৃতি।

পোষ্ট—হাতেমপুর, গ্রাম সিরশা, জেলা বীরভূম। শ্রীযুক্ত রামকমল নায়ক। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নায়ক। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নায়ক।

পোষ্ট—ইলামবাজার, উক্ত গ্রাম, জেলা বীরভূম। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ আশ। শ্রীযুক্ত হেলারাম দে। শ্রীযুক্ত রাখাল-চন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে।

পোষ্ট—বনকাটি, গ্রাম অযোধ্যা, জেলা বর্দ্ধমান। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রক্ষিত। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব হালদার। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভদ্র। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রক্ষিত।

পোষ্ট—বনকাটি, গ্রাম সাতকাহনা, জেলা বর্দ্ধমান। শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র হালদার। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত হালদার। শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ শীল। ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম অধিবেশনে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের কুলীন—আশ, দাস, দে, দত্ত, পাল, ভদ্র. শীল, রক্ষিত এই আট ঘর। পূর্ব্বে কুলীনদিগের কি প্রাপ্য ছিল জানি না, এখন কিছুই দিতে হয় না। ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করা অথবা যিনি দশজনকে প্রতিপালন করেন, এখন তিনিই কুলীন।"

কোতরাপুরের উৎকল অষ্টগ্রামী।

এই সমাজে কৌলিন্য প্রথা নাই। ইহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ। কৌলিন্যের বিশেষ পক্ষপাতী অষ্টগ্রামীর এই শাখা সাম্য-বাদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বৃত্তাকারে আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করিয়া মর্য্যাদার তুল্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই নিদর্শন পত্রের নাম চাঁদ। ইহাতে এক জনের নিম্নে অপরের নাম নাই। আমরা স্থানাভাব বশতঃ (চাঁদের) অবিকল নামের পদ্মবন্ধবৎ চিত্র দিতে পারিলাম না, তবে সাধারণের বিদিতার্থ যথা সম্ভব স্থূল প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল।

তাম্বুলী সমাজ মাসিক পত্রে প্রকাশিত কটক শাখা সমিতির কার্য্য বিবরণ হইতে সভাস্থলে উপস্থিত এই সমাজের ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিশেষে সভা সংক্রান্ত দুই একটি কথা উদ্ধৃত হইল।

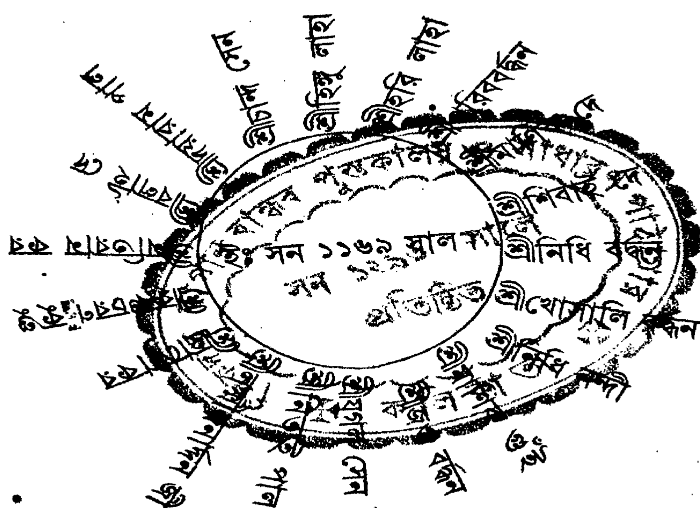
"নাম যথা;—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত বংশীধর লাহা, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুমোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত রাধামোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন মল্লিক, শ্রীযুক্ত মদনমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত নাকফুড়ি মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিদাস মল্লিক, শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি।

সভায় প্রস্তাব্য ছিল (১) সম্মিলন এবং (২) শাখাসমিতির গঠন। সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধিকালাল সিংহ মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে, সম্মিলন হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইয়াছে। আর শাখা-সমিতিও খোলা হইয়াছে। শাখা-সমিতির স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুঁই দাস। সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নন্দী। অবশিষ্ট তথাকার অপরাপর কুটুম্ববর্গ মাত্রেই এই সভার সভ্য হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছিল।

কটকে ৭০ ঘর আমাদের স্বজাতি আছেন। ইহা ভিন্ন জাজপুর জেলার অন্তর্গত কোত্‌রাপুর গ্রামে আন্দাজ ৩ শত ঘর আমাদের কুটুম্ব বাস করেন। এই সকল স্থানের কার্য্য কটক এবং ভদ্রকের শাখা-সমিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে। এই দুই স্থানের স্বজাতিবর্গই "কোত্‌রাপুরের অষ্টগ্রামী সমাজের অন্তর্গত।"

খড়্গাপুরের "সংসেরে" ৪২ গ্রামী।

জাতিভেদের অপূর্ব্ব নিয়মের ফলে মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে কয়েক জন কৃষিজীবি একত্রিত হইয়া এক নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনসংগ্রাম সংসারের অতি চমৎকার সামগ্রী। মেদিনীপুরের অষ্টগ্রামী বীরভূমের বনকাটিতে, বাঁকুড়ার সংসেরে ৪২ গ্রামী খড়্গাপুরে, পরস্পর বাস স্থান বিনিময় করিয়া লইয়াছেন। শাওড়া গ্রাম মেদিনীপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত। এই সমাজের জনৈক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ কুণ্ডু তথায় বাস করেন।


সন ১১৬৯ সাল
প্রতিষ্ঠিত
শ্রীনিধি বর্দ্ধন
শ্রীখোসালি

সমাজভেদ।

তাম্বূলীর এ পর্য্যন্ত ১২টী সমাজ নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টী গঙ্গার পশ্চিমপারে ও ১টী মাত্র কুশদহ সমাজ গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। সিংহ-ভূমে এক দল তাম্বূলী আছেন, তাঁহারা ৪২ গ্রামী নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে একটি ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশিত হইতেছে। সিংহভূম যেমন বেহার ও বাঙ্গালার মধ্যপথে অবস্থিত, তদ্রূপ সিংহভূমের তাম্বুলী হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্য পথে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের আচার ব্যবহারে হিন্দুস্থানী ভাব আছে। তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া বঙ্গীয় তাম্বূলীর ৪২ গ্রামী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া সিংহভূমে বাস করিলে বঙ্গীয় তাম্বূলীর ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। চাঁইবাসার তাম্বূলী দল যদি আকারে আর্য্য না হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে আর্য্যীকরণে গৃহীত মুণ্ডা কহিতাম। ছোটনাগপুরে অনার্য্য মুণ্ডা জাতি হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুর ভাষা গ্রহণ করিতে বিশেষ তৎপর। তাহারা স্বদেশ হইতে জীবিকান্বেষণে অন্যত্র গমন করিয়া তথায় পুরুষানুক্রমে বাস করিলে মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাষা গ্রহণ করিতে সচরাচর বাধ্য হইতে দেখা যায়। মাতৃভাষা পরিত্যাগ না করিলেও মুণ্ডাদিগকে লোহার, মালি তাঁতি প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় জাতির নাম গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে। ভূমিজ মুণ্ডা জাতির মধ্যে সিংহভূমে তামুলিয়া নামে একটী শ্রেণী আছে। সিংহভূমের ৪২ গ্রামী তাম্বূলী সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত তামুলিয়া শ্রেণীর সংস্থাপক, একথা বলা সংগত হইবে না। বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী, ভুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী, খড়্গাপুরের সংসেরে ৪২ গ্রামী, বাঁকুড়ার রাজহাটী, ও অষ্টগ্রামী প্রভৃতি তাবৎ সমাজের লোক বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছেন, ইহা অসম্ভব। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঁকুড়া অঞ্চলে হিন্দুস্থানী তাম্বূলীরা বাস করিয়া বাঙ্গালিত্ব প্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে আগত স্বজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য বঙ্গীয় শ্রেণী দ্যোতক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। নহিলে স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে সংখ্যাধিক্য হইবার অন্য কোন কারণ অনুমিত হয় না।

তাম্বুলীকুলের দ্বাদশটী সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কৌলিন্য সম্পন্ন, কৌলিন্য বর্জ্জিত। সম্বন্ধ নির্ণয় স্থলে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাবৎ সমাজ এক মূল হইতে উৎপন্ন। পরস্পরের নিকট যখন পরিচিত হইলাম, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করা আর কঠিন হইবে না। সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে হইলে কৌলিন্য সম্পন্ন ও কৌলিন্য-বর্জ্জিত সমাজে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইবে। এতৎ নিরাকরণার্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাম্বুলি সমাজ মাসিক পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। বিভিন্ন সমাজের বিবাহ পদ্ধতি একরূপ নহে। তৎপ্রদর্শনের জন্য উপযোক্ত পত্র হইতে বৈবাহিক লিপি গৃহীত হইয়াছে।

"কৌলীন্য প্রথা ভদ্র-সমাজ মাত্রেরই অঙ্গবিশেষ, এবং পূর্ব্বাবধি সকল ভদ্র সমাজে কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে ইহার মূলোচ্ছেদ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহা হইলে আমাদের সকল তাম্বুলি সমাজে সম্মিলনে ব্যাঘাত জন্মিবে। যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত করা আবশ্যক নহে, তাহা হইলে তাম্বুলি সমাজ ভদ্র-সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে না ও সকল থাক সম্মানিতও হইবে না। আর একটী বিষয় বলা হইতেছে যে, সমাজের যেরূপ নিয়ম পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সে নিয়ম আপন আপন সমাজে প্রচলিত থাকিলে অন্য সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কেবল মাত্র অন্য সমাজের সহিত বিবাহ কার্য্য উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মে সমাজ আবদ্ধ থাকা ভাল বলিয়া বিবেচনা হইতেছে।

বিবাহে কৌলীন্য বিষয়ে বক্তব্য—কন্যাকর্ত্তা কুলীন কিম্বা মৌলিক হউন না কেন, কন্যা-সম্প্রদান সময়ে যখন তাঁহাকে নম্রতা স্বীকার করিতে হয় এবং সমাজ হইতে পাত্রপক্ষীয় সমাজের সম্মান দিতে ও আবদার সহ্য করিতে হয়, তখন সকল সমাজের পাত্র-পক্ষের কৌলীন্য-সম্মান বিবাহ কালীন রক্ষা করার নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, পরস্পর কোন সমাজেই কৌলীন্য বিষয় লইয়া বিবাদ হইবে না।

যে কোন সমাজে শ্রাদ্ধাদি সমারোহের কার্য্য উপস্থিত হইবে, এই সমাজের মালাচন্দন সেই সমাজেরই কুলীন মহাশয়ের সম্মানার্থ ব্যবহার করা নিয়ম থাকিলে পরস্পর কোন সমাজেই কৌলীন্য সম্মান লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইবেক না।"

বিবাহ পদ্ধতি।

(তাম্বূলী সমাজ মাসিক-পত্র হইতে উদ্ধৃত)

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সমাজের বিবাহ।

গাত্র হরিদ্রার দিন সধবা স্ত্রীলোকে বরের গা'য়ে তেল হলুদ দিয়া হাতে হরিদ্রা সূতা এবং দূর্ব্বা বাঁধিয়া দেয়। তৎপরে এই তেল হলুদ এবং তৎসঙ্গে সিন্দুর, চিরুণী, দর্পণ, মাথাঘসা, তেলের মশলা, /২ /৩ সের হইতে /৫ /৬ সের পর্য্যন্ত সন্দেশ যিনি যেমন পারেন, এই সকল দ্রব্য কন্যার বাটী পাঠান হয়; তথায় কন্যার গায়ে এই তেল হলুদ সধবা স্ত্রীলোকে দিয়া, তাঁহারও হস্তে দূর্ব্বা এবং সূতা বাঁধা হয়।

গাত্র হরিদ্রার পর বর বা কন্যার আত্মীয়েরা স্ব স্ব বাটিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ইহাদের ভোজন করান, ইহাকে আইবুড়া ভাত বলে।

বিবাহের দিন বর সভাস্থ হইলে, সেই সভায় দান সামগ্রী, যথা—পিত্তলের ঘড়া, গাড়ু, থালা, বাটী, ইত্যাদি বিবিধ তৈজসপত্র পাটী, সিন্দুর চুবড়ী, দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি যিনি যত দিতে পারেন—আজকাল ২।৪ খানা রূপার বাসনও ভাল ছেলেকে দেওয়া হইতেছে—এসকল দ্রব্য সভাস্থলে সাজাইয়া দিতে হয়। বিবাহের লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইলে, কন্যাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ করেন। এ সময় কুলীনের সম্মান রক্ষা করিতে হয়।

ইঁহাদের কুলীন সেই পরশুরামের প্রণীত কুলচী অনুসারে,—

দে, দত্ত, পাল, সেন প্রধান চারি ঘর।
পরশুরাম দাস কহে শুন তার পর॥

এই প্রবচনে যে চারি ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীনের উল্লেখ আছে, ইঁহারা অদ্যাপিও উক্ত চারিঘরকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন। বিবাহের সভায় এই চারিঘরের যিনি উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে "ডালা" দেওয়া হয়। যদি চারি ঘরই উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখিয়া "ডালা" দেওয়া হয়। একখানি থালায় পান, সুপারি এবং কিছু সন্দেশ রাখিয়া উহা রুমাল ঢাকা দিয়া "ডালা" করা হয়। ইহাই কুলীনের প্রাপ্য।

তৎপরে কিছু কিছু পান সুপারি সভাস্থ অন্যান্য স্বজাতীয়দিগকে দেওয়া হয়। বরের সম্মান—ছেলে পাস করা হইলে কিছু নগদ টাকা, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরি, ঘড়ি, চেইন এবং কন্যাকে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার ইচ্ছামত বা পূর্ব্বচুক্তিমত দিতে হয়। ছেলে ভাল না হইলে এবং গরীব দুঃখীর কন্যা হইলে লোকে ঐরূপ কন্যার পণ লইয়া বিবাহ দিয়া থাকেন।

বিবাহরাত্রে কন্যার মাতুলের কিছু প্রাপ্য আছে। ইহাকে "মাতুল-সম্ভাস" বলে। মাতুল-সম্ভাসের টাকা বরপক্ষকে দিতে হয়। যিনি যেমন পারেন, ৮৲ ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত চুক্তি হয়। টাকা না দিলে, মামা ভাগিনেয়ীকে আটক করেন, সভাস্থ হইতে দেন না। কাজেই টাকা দিতে হয়। মামা কিন্তু এ টাকা লইয়া আত্মসাৎ করেন না, বরং উহার সঙ্গে আরও কিছু মিশাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎ সভায় গিয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্র মাতুল স্থলবিশেষে টাকা পুনঃপ্রদান-বিষয়ে কৃপণতা করেন, তাহাও শুনা যায়।

জ্যেষ্ঠ জামাতার বরণের জোড়া কাপড় দিবার নিয়ম। এক্ষণে উহার স্থলে ধুতি চাদর দেওয়া হয়। মাতুল-সম্ভাসের পর কন্যাকে সভাস্থ করা হয়। এবং এখানকার কার্য্য শেষ হইলে, বরকে ছাঁদলাতলায় লইয়া গিয়া, "সাতাশ খাড়ি" ঘুরান হয়। এ ছাঁদলাতলায় স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই। শুনা যায়, শুভদৃষ্টি সভাতেই হয়। এখানে কেবল ২৭টী ছোট ছোট মশাল জ্বালাইয়া, উক্ত ২৭টী মশাল ৭জন পুরুষে অংশমত লইয়া বরকে প্রদক্ষিণ করেন। ইহারই নাম "সাতাশ খাড়ি বা সাতাশবর্ত্তিকা।" ইহার পর বরকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়।

এই সম্প্রদায়ের বরযাত্রীর বিশেষ সম্মান আছে। তাঁহাদের আহার দিয়া রাত্রে রাখিতে হয়। যতই বরযাত্রী থাকুন না কেন, পরদিন কন্যার পিতাকে মোটের উপর দেড়টাকা দিতে হয়। পরন্তু আর একদিন যদি ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ৪॥০ টাকা সম্মান লাগে। তৎপরে যতগুলি বরযাত্রী গমন করেন বা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের ঐ টাকা অংশমত প্রাপ্য। ইহা কেহ লয়েন, কেহ বা লয়েন না। স্বজাতীয় বরযাত্রীর পক্ষে এই সম্মান। কিন্তু অন্য জাতীয় বরযাত্রী থাকিলে, তাঁহাকে রীতিমত লৌকিকতা অর্থাৎ বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মান রক্ষা করিতে হয়।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন। এই সম্প্রদায়ে ফুলশয্যা নাই। বৌভাত আছে। উক্তদিন বরের বাটীতে অন্ন-যজ্ঞ হয়। বৌ

রান্না ঘরে গিয়া, দাঁড়াইয়া খাদ্য দ্রব্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই বৌভাতের উদ্দেশ্য সমাধা হইয়া যায়। তৎপরে বর সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী আগমন করেন। ইহাকে জোড়ে আগমন করা বলে। ৭।৮ দিন থাকেন। এই সময়ে বর নমস্কারী টাকা দিয়া, কন্যাপক্ষের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। দ্বির-গমন কুত্রাচিৎ; ইঁহাদের "ধুল পায়ে লগ্ন" নচেৎ ১ বৎসরে ১৷৷০ বৎসর পরেও হয়। এই সময় ফুলশয্যার মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। মৎস্য, দুগ্ধ, চিড়া, মুড়কি, সন্দেশ ইত্যাদি দিতে হয়। ভোদোর লাড়ু বা ভুষির লাড়ু এই সময় দিতে হয়। অন্ততঃ ১ মণ চাউল ভাজার গুঁড়ায় গুড় এবং অন্যান্য মশলা দিয়া, এই লাড়ু প্রস্তুত করা হয়। এই সময় কন্যার সহিত নমস্কারী কাপড় দেওয়া হয়। এই বস্ত্র দিয়া কন্যা বরের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। নূতন কুটুম্ব খাওয়ান ইঁহাদের নাই।

১৪ গ্রামী সমাজের বিবাহ।

এই সমাজ মহাত্মা ষষ্ঠীবর সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ১৪৬১ শকাব্দায় চৌদ্দঘর ৪২ গ্রামী তাম্বূলী দ্বারা ইহার সৃষ্টি। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা অনুমান ৮ হাজার।

এই সুবৃহৎ সমাজে কৌলিন্য প্রথা আছে। ৺ষষ্ঠীবর সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কীয় যে কেহ, এমন কি তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং তাঁহার সভার সভাপতি, সম্পাদক, লেখক প্রভৃতি সকলেই কুলীন পদবাচ্য। অদ্যাপিও ঐ সম্পর্কীয় বংশধরেরা স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছেন। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইঁহাদের কুলমর্য্যাদানুসারে বিবাহের পণ ধার্য্য ছিল।

বরপক্ষকে পণের টাকা না দিলে, এ সমাজে বিবাহ হয় না। পূর্ব্বে দত্ত প্রামাণিকেরা সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে বিবাহ করিলে, ১৫১৲ টাকা এবং দত্ত প্রামাণিকের ঘরের মেয়ে সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে গেলে, ১৫০৲ টাকা পণ ধার্য্য ছিল। তৎপরে, ৪ ঘর ৬ ঘরে বিবাহ হইলে, সমান পণ—অনুমান ৬০, ৬৫ টাকা ছিল। এইরূপ নির্দ্ধারিত পণে সমগ্র সমাজটীর বিবাহ ব্যাপার পরিচালিত হইত। এখন আর সে নির্দ্ধারিত পণ প্রথা নাই। যিনি যত দর করিয়া লইতে পারেন, এমন কি শুনা যায়, ৪।৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পণ লওয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। ইঁহাদের বংশপরিচয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, বরকর্ত্তা পণের টাকা লইয়া কন্যার গহনা দিবেন, কন্যার পিতাকে আর গহনা দিতে হয় না। কিন্তু বরকর্ত্তা যত টাকা লয়েন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে গহনা দিতে পারেন। হয়ত দুই হাজার টাকা লইয়া, দুইশত টাকার গহনা দিতে পারেন, অথবা ২ হাজার পাইয়া ৪ হাজার টাকার গহনাও দিতে পারেন।

পণের টাকা, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরি অথবা কুলীনবিশেষ হইলে সুতার কাপড় এবং রৌপ্যাঙ্গুরিও দেওয়া হয়। যেমন জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের বংশে বিবাহ করিলে, সুতার কাপড় এবং রূপার আংটি লইতে হয়। বিবাহ-সভায় পূর্ব্বে কুলীন-বিশেষের পাগ্‌ড়ি প্রথা ছিল, এখন তাহা রহিত হইয়াছে।

সভা হইতে বর ছাঁদলাতলায় যাইবার পূর্ব্বে বর ও কন্যা উভয় পক্ষের দুই-জন জ্ঞাতি বা উভয়ের পিতা বা খুড়া করযোড়ে পান সুপারির দুইখানি থালা লইয়া প্রথানুসারে অনুমতি লইয়া থাকেন। ৪টা হাঁড়িতে সুপারি লইয়া উভয়ের গুরু পুরোহিতকে সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়। তৎপরে সভাস্থ ব্রাহ্মণ কুটুম্ব প্রভৃতি অপর সমুদয় জাতিকে সুপারি দিতে হয়। এ সুপারি খরচ কেবল বরপক্ষের। বিবাহবিশেষে ২০ মণ সুপারি খরচা হইয়াছে। সচরাচর বিবাহ-সভায় ২মণ সুপারি ব্যয় হয়। সভাস্থ প্রত্যেককে।০, ।৵০, ॥০ সের পর্য্যন্ত সুপারি দেওয়া হয়। এই জন্য সুপারি বুঝিয়া এবং সভার লোক দেখিয়া অনু-মানে যথানুপাতে উহা বিতরিত হয়।

দান সামগ্রী সভায় সাজাইয়া দিতে হয় না। সে ভাবে দিবার প্রথা নাই। বাসি-বিবাহ নাই। কিন্তু বরণ করা হয়। যাত্রার মন্ত্র নাই। ফুলশয্যা আছে। কিন্তু বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার দ্রব্যাদি দিতে হয় না। ৮ দিনের মধ্যে জোড়া দিন বাদে ফুলশয্যা পাঠান হয়। ডাবর ১টা, পাটি ১টা, ফুলচন্দনের বাটি ১টা, থালা ১খান, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মশলা, ক্ষীর, বাতাসা, মুড়কি ইত্যাদি অবস্থানুসারে দিতে হয়। ২শত হাঁড়ী ক্ষীর, ১৮ ধামা বাতাসা, ৫ মণ মুড়কি ইত্যাদি দিতে দেখা গিয়াছে। উহাতে ফল ফুল চন্দন রীতিমত ভাবে দিতে হয়। দ্রব্যের অভাবে টাকাও ধরিয়া দেওয়া চলে।

বিবাহের পরদিন শয্যা তুলানী যাহা লয়, কন্যা আসিবার সময় "ননদ-থামী" উপহার ডবল ধরিয়া দিতে হয়;—ইহা ননদের প্রাপ্য।

বিবাহের পর ৮ দিনের মধ্যে হাতের সূতা খোলার দিন বরের আত্মীয়েরা

"কনে-দেখা" বলিয়া, কন্যার হস্তে যৌতুক অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে নগদ টাকা এবং গহনাও দিতে পারেন।

বিবাহের পর অবস্থানুসারে নূতন কুটুম্ব খাওয়ান হয়, ইহাই "বৌভাত।" মেয়ের পিতাকে নূতন কুটুম্ব খাওয়াইতে হয় না।

বিবাহের পর বৌভাত ইত্যাদি হইয়া গেলে, বর ও কন্যা জোড়ে বাপের বাটী আসিয়া, ৩ দিন হইতে পনের দিন বা যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। এই সময় বর নমস্কারী টাকা দিয়া, কন্যার গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। কিন্তু যাইবার সময় একা যাইতে হয়। কারণ ইঁহাদের ১ বৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়।

এই দ্বিরাগমনের সময় দান সামগ্রী, মশলা, পাটি এবং আবার ফুলশয্যার মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। রীতিমতভাবে বরের গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে নমস্কারী কাপড় যথা,—পুরুষের ধুতি চাদর, সধবার সাটী এবং বিধবাকে থান কাপড় দিতে হয়। বর যে শ্বশুর বাটীতে টাকা দিয়া নমস্কার করিয়া আইসে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুদিন পরে উহা ফেরত দিয়া, তৎসঙ্গে হয় এক জোড়া কাপড় না হয় ধুতি চাদর দিতে হয়।

বিবাহের রাত্রে ভাগিনেয় বরণ এবং জামাই বরণ, কৌলীন্যানুসারে গরদের জোড় কিম্বা সূতার বস্ত্র দ্বারা করা হয়।

বরযাত্রীর রাহা-খরচ বরপক্ষকে দিতে হয়।

জাহানাবাদ—অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ।

মেদিনীপুরনিবাসী অনারারী মাজিষ্ট্রেট বাবু দুর্গাদাস রক্ষিত মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহার সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি আমাকে যেরূপ জানাইয়াছেন, তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমাদের স্বগোত্রে বিবাহ নাই। বিবাহের দিন বর সভাস্থ হইলে, কন্যাকর্ত্তা কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য অগ্রে ব্রাহ্মণ, তৎপরে অন্যান্য জাতি, সর্ব্বশেষে স্বজাতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন; অথবা কোন সময়ে সভাস্থ সকল ব্যক্তিগণের সম্মুখে কন্যাকর্ত্তা অনুমতি লইয়াও কন্যা পাত্রস্থ করিয়া থাকেন। ইহাতে অগ্র পশ্চাৎ জাতি বিশেষের বিবেচনা করা হয় না।

সভায় পান সুপারি দেওয়া হয় না এবং দান সামগ্রী সভায় সাজান হয় না, উহা "ছাঁদনাতলায়" সাজাইয়া দিতে হয়।

বরকে নগদ টাকা পণ-স্বরূপ দিবার প্রথা নাই। পূর্ব্বে কুলীন বর হইলে, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী দিতে হইত। এক্ষণে স্থলবিশেষে কি কুলীন, কি মৌলিক, উভয় বরকে চুক্তি অনুসারে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেইন এবং দান সামগ্রী দেওয়া হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরাও পণ লইয়া কন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন না। তবে বিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য বরপক্ষ হইতে গোপনে সময়বিশেষে কন্যাপক্ষ কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শুনা যায়; কিন্তু ইহা সমাজে পণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

বিবাহের পরদিন অর্থাৎ বাসী বিবাহের দিন, "আকাটা পুকুরে স্নান" বলিয়া একটী কার্য্য আছে। এই তারিখে কন্যার বাটীতে স্বজাতীয়দিগের ভোজ দিতে হয় এবং সেই ভোজের এক পংক্তিতে বরকেও ভোজন করান হয়। ইহাকে "বর-ব্যবহার" বলে। বিবাহের দিন, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী-আচার ও বরণ করিবার প্রথা আছে। বাসী বিবাহের পরদিন বরকন্যা বরণ করিয়া পাঠান হয়। অর্থাৎ বিবাহ করিয়া, বর তিন দিবসের দিন সস্ত্রীক বাটী আইসেন।

ফুলশয্যার প্রথা আমাদের সমাজে নাই। বিবাহের তারিখ হইতে ৮ দিন হস্তে হরিদ্রাসূতা বাঁধা থাকে, শেষ দিনে ঐ "সূতা পুয়ান" হয় অর্থাৎ অষ্ট-মঙ্গলের কার্য্য শেষ হয়।

বরের বাটীতে বৌভাতের দিন আত্মীয় স্বজন কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এবং পংক্তি ভোজের শেষে বৌ কিছু ক্ষীর প্রথমে আত্মীয় স্বজনকে পরিবেশন করিবে, শেষে তাহার স্বামীকেও সেই পংক্তিতে ক্ষীর দিবে। ইহাকেই পাকস্পর্শ বা বৌভাত কহে।

বরকন্যা আসিবার পর অষ্টমঙ্গলার তারিখের মধ্যে—স্বগ্রামের কন্যা হইলে, তাহাকে পিত্রালয়ে আনাগোণা করাইয়া, দ্বিরাগমনের কার্য্য ধুলপায়ে লগ্নের মত করা হয়। দূরদেশ হইলে দ্বিরাগমন চন্দ্র, তারা ও শুক্র বিচারপূর্ব্বক দিন স্থির করিয়া দ্বিরাগমনের কার্য্য করিতে হয়। এই সময় কিছু মিষ্টান্ন দিয়া কন্যা পাঠান হয়।

কন্যার পিতা ক্ষমতানুসারে তাঁহার কন্যাকে বিবাহের দিন গহনা দিয়া থাকেন এবং ঐ তারিখে বরকর্ত্তা তাঁহার পুত্রবধূকে যে সকল অলঙ্কার দিবেন, তাহা জনৈক ভাই, পাত্র, আত্মীয় ও নাপিত সহ পান সুপারি দিয়া কন্যার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

গাত্র হরিদ্রার দিন বরের গায়ে হলুদ দিয়া, উক্ত তেল হলুদ কন্যার বাটীতে পাঠান হয়। ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য দিতে হয় না।

গাত্র-হরিদ্রার দিন অথবা ২।১ দিন পরে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া, একটী "আইবড় ভাতের" ভোজ দিতে হয়। তৎপরে স্বজাতিগণ বর ও কন্যাকে স্ব স্ব বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আইবড় ভাত খাওয়াইয়া থাকেন এবং লৌকিকতার স্বরূপ নগদ টাকা,কেহ বা কাপড় দিয়া থাকেন। ঐ লৌকিকতার প্রতিলৌকিকতা করিতে হয় না। যখন সেই লৌকিকতাকারীদিগের বাটীতে এই বৈবাহিক কার্য্য হয়, তখন এই লৌকিকতার ফেরত লৌকিকতা হয়, নচেৎ নয়। এমন কি দূরদেশস্থ কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ করিলে, মণিঅর্ডারে টাকা এবং ডাকে কাপড় পাঠাইতে হয়; অথবা লোক-সুযোগে পাঠান নিয়ম আছে।

আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে নিকটস্থ সমুদয় স্বজাতীয়দিগকে একাসনে অধিষ্ঠিত করাইয়া, একটী সভা করা হয়। এই সভায় বর এবং কন্যার পিতাকে অমুকের কন্যা বা অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহ—এ বিষয় জানাইতে হয়। তৎপরে সভাস্থ স্বজাতীয়বর্গ কন্যা এবং বরকর্ত্তা কিরূপ অবস্থার লোক স্থির করিয়া, শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ জীউকে সন্দেশের বাবদে ১৬৲, ৮৲, ৪৲ এবং ২৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রণামী দিবার অনুমতি করেন; তৎপরে বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা কিরূপ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, ইহা জানিয়া সভা সেই মত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন; ধনবান হইলে ষোলআনা অর্থাৎ গোটা সমাজটীকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতে হয়; নচেৎ উক্ত সমাজ বা সভার নিকট অনুমতি লইয়া, মালিক, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ এবং কুটুম্বদের মধ্যে তাহার নিকট-আত্মীয়দের লইয়া বিধি পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়। মালিক, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ ইঁহাদের উপর উক্ত কার্য্যের ভার, ষোলআনা অর্পণ করিয়া সভার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিলে, ষোলআনা সমাজ বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই সকল ব্যক্তিবর্গের সবিশেষ পরিচয় পাইলাম না; আশা করি, আমাদের মেদিনীপুরস্থ দুর্গাদাস বাবু ইহার সবিশেষ তথ্য সাধারণকে জানাইবেন। মালিক, ভাই, পাত্র এবং অন্তরঙ্গ ইঁহারা কি সভা হইতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি?

যাহা হউক, কৃতী যদি এই সকল মহোদয়ের যথোচিত সম্মান রক্ষা এবং ইঁহাদের সুপরামর্শ গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষাই হইতে হয় এবং সমাজ তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করেন। ইঁহাদের সমাজ-বন্ধন ভাবে বোধ হইতেছে,

সুনিয়মে গঠিত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিকাতাস্থ অষ্টগ্রামী মহোদয়েরা ৺জগন্নাথ দেবের পূজা কলিকাতা হইতে তথায় পাঠান কি না? সহরের অধিবাসী অষ্টগ্রামীদিগের কিরূপ নিয়ম এবং আমাদের রাজা বাহাদুরের বালেশ্বরস্থ স্বজাতিবর্গ এই নিয়মে পরিচালিত হন কি না, জানিতে বাসনা হয়। আমাদের অনুমান—মালিক অর্থে অধ্যক্ষ হইবে না ত?

শ্রীশশীভূষণ সেন অষ্টগ্রামী সমাজের যে সঠিক বিবাহ পদ্ধতি লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করা গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে কোষ্ঠি গণনা প্রায়ই হইয়া থাকে। পাল্‌টি বিবাহ অর্থাৎ পরিবর্ত্ত সম্পর্ক আছে, কিন্তু অতি বিরল। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের স্বজাতীয়ের একটি সভা হয়। বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়ে স্বগ্রামের হইলে, ঐ এক সভায় কুটুম্ব মহাশয়দিগের নিকট উভয়কে আপন আপন দায় জানাইয়া, বিবাহের অনুমতি লইতে হয়। কুটুম্ব মহাশয়েরা উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কিরূপ কার্য্য করিবেন? ষোল আনা লইয়া কার্য্য করিবেন কি?" কুলীন হইলে জিজ্ঞাসা করা হয়, "ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ লইয়া কার্য্য করিবেন?" মৌলিক হইলে তাঁহাদিগকে বলা হয়, "মালিক, ভাই এবং অন্তরঙ্গ লইয়া কার্য্য করিবেন?" তাহাতে যিনি যেমন প্রার্থনা করেন, তিনি সেইরূপ অনুমতি পাইয়া থাকেন। ঐ সভায়, যাঁহারা উড়িষ্যার তাম্বূলি, তাঁহাদিগকে ক্ষমতানুসারে ২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের সন্দেশ দাখিল করিয়া, গোষ্ঠীর অনুমতি লইতে হয়। আর বাঙ্গালার তাম্বূলী হইলে তাঁহাদের গ্রাম্য দেবতার, নিকট যেস্থানের যেরূপ প্রথা আছে, সেইরূপ দিতে হয়;—তাহাতে সক্ষম অক্ষম নাই, সব সমান; ধনী ও গরিবের পক্ষে একই নিয়ম।

অগ্রে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া, শেষে সেই হরিদ্রা কন্যার গাত্রে দিবার জন্য, কন্যাকর্ত্তার বাটীতে লোক দ্বারা একখানি লালপেড়ে শাটী, লাল গামছা, তুয়ালে, আরসি, চিরুণী, সাবান, পাউডার, পফ্‌, সুবাসিত নারিকেল তৈল, আতর, গোলাপ, খেলানা, দধি, মৎস্য ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠাইতে হয়। অক্ষম হইলে সাধ্যমত দিলেই চলে, তাহাতে কোন কথা নাই। তাহার পর উভয়ের বাটীতে "আইবুড়া" ভাতের প্রথা আছে। তাহাও উভয়ের ক্ষমতানুসারে হইয়া থাকে।

বিবাহের দিবস উভয়ের বাটীতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নান্দীমুখের শ্রাদ্ধ

হইয়া থাকে। ঐ শ্রাদ্ধের পরে বরকে পরামাণিকের নিকট হইতে বর-কামান কামাইতে হয়। পরে ৫ জন কিম্বা ৭ জন এয়োস্ত্রী বরকে স্নান করাইয়া দেয়। পুনরায় আভ্যুদয়িক ক্রিয়া স্থলে আলিপনালেপিত পিঁড়ির উপর উপবেশন করে। ব্রাহ্মণে মন্ত্রপাঠ করিয়া বরণডালাসহ যাবদীয় বরণীয় সামগ্রী এক একটী করিয়া বরের কপালে স্পর্শ করাইয়া সেই বরণডালায় পুনঃ রাখা হয়। পরে "শ্রী" লইয়া বরের কপালে ছুঁয়াইয়া রাখিতে হয়। ঐ সময় বরকর্ত্তা বরের হস্তে সূতা বন্ধন করিয়া দেন, এবং মস্তকে টোপর পরাইয়া দেন। পরে এয়োস্ত্রীগণ বরকে লইয়া বরণ করে এবং হাতে জাঁতি দেয়। কন্যাকর্ত্তার বাটীতেও ঐরূপ নিয়মে কন্যার হস্তে সূতা-বন্ধন হয়। বরের বাটী হইতে সূতা যায় না। বৈকালে উভয় বাটীতে এয়োকামান অর্থাৎ নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা নাপিতানীর নিকট হইতে আল্‌তা, সিন্দুর পরে; ইহাকে এয়োকামান বলে। বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা আপন ক্ষমতানুসারে ঐ সকল এয়োদিগকে নববস্ত্রপরিধান করাইয়া, তাঁহাদিগকে দাঁড় করাইয়া, তাঁহাদের কাপড়ে পান, সুপারি, বাতাসা দেন; ইহাকে দাঁড়া-শুভচণ্ডীর পূজা বলে।

কন্যাকর্ত্তার বাটীতে ইহা ছাড়া আর একটী স্বতন্ত্র কার্য্য হয়। যত স্বামীসোহাগিনীরা মিলিয়া, একটী ছাতা মাথায় দিয়া হাইআমলা বাঁটিয়া ২৭টী গোটা পানের উপর ২৭টী বড়ি দিয়া একটী কুলার উল্টা পৃষ্ঠে রাখে। বর ছাদ্‌নাতলায় আসিলে বরণ করিবার সময় উহা আবশ্যক হয়।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধের পর, বরকর্ত্তার বাটী হইতে কন্যা-অধিবাসের সামগ্রী পাঠাইতে হয়। বর কুলীন হইলে, অধিবাসের ডালায় কেবলমাত্র সোণার মাকুড়া দুইটী, যোড়া মারুই, কোলসরা, মালা, ঘুন্‌সী, সিন্দুরকৌটা এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ, পরামাণিক, খেলানা, দধি, মৎস্য পাঠাইতে হয়। বর মৌলিক হইলে, অধিবাসের ডালায় এক খান সোণার অলঙ্কার, যোড়া মারুই, কোলসরা, ধনসোণা, কাচা সাতহাতি ও ন-হাতি সূতার শাটী, মালা, ঘুন্‌সী, সিন্দুর-কৌটা, দধি, মৎস্য, মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ খেলানা ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মালিক, ভাই, অন্তরঙ্গ এবং পরামাণিক পাঠান হয়। কন্যাকর্ত্তা আপন ক্ষমতা-অনুসারে ঐ সকল লোকের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহাতে কোন নিয়ম ছিল না; এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পরামাণিক ও দাস-দাসীর স্বতন্ত্র বিদায় করা হয়। আর কুটুম্ব যত জন যাউক না কেন, মোট ২৲ টাকা সম্মান দেওয়া হয়।

সেই ২৲ টাকা অধিবাসের ডালার সহগামী কুটুম্ব মহাশয়েরা সমান অংশে অংশ করিয়া লন।

বর কুলীন হইলে, কন্যাকর্ত্তার ক্ষমতানুসারে দানসামগ্রী সভায় সাজাইয়া দেন, এবং বস্ত্রত্যাগের সময়, কন্যাকর্ত্তাকে পূর্ব্বজামাতাদিগের বরণের বস্ত্র দিতে হয়। বরের ভ্রাতার বরণের বস্ত্র দিতে হয়, পরে বরকে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণাঙ্গুরী দিয়া কন্যা দান করিতে হয়। বর মৌলিক হইলে, সূতার বস্ত্র, রূপার অঙ্গুরী ও দানসামগ্রীর মধ্যে অন্নজল ব্যতীত ইহার অধিক বিবাহ-সভায় আর কিছুই পান না। মাতুল-মানের প্রথা আছে। বর মৌলিক হইলে মাতুল-মান ১১৲ টাকা এবং কুলীন হইলে ৫৲ টাকা দিতে হয়। ইহা আমাদের পল্লীগ্রামে চলিত আছে। কলিকাতায় কেহ গ্রহণ করেন না।

প্রথমে বর বিবাহস্থলে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপাঠ ও পরে বস্ত্রত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-আচার করিতে উভয় পক্ষের পরামাণিক বরকে লইয়া ছাঁদ্‌নাতলায় আনিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দেয়। পরে এয়োস্ত্রীগণ ২৭ কাটী অর্থাৎ ২৭টী চিতার কাটীর মশাল জ্বালিয়া ৫ কিম্বা ৭ জন এয়োস্ত্রীতে সাত বার বরকে পরিভ্রমণ করে। পরে ২১টি ধূতুরা ফলের প্রদীপ জ্বালিয়া বরকে বরণ করিয়া, পরে বরের মাথা ডিঙ্গাইয়া বরের পদতল গলাইয়া সেই কুলাখানি উল্টাইয়া, তাহার উপর বরণকারিণী দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বের বাঁটা সেই হাইআমলা ২৭টীর ফোঁটা সেই বামাগণ বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা বরের কপালে ফোঁটা দিয়া বরের বামে ও দক্ষিণে, এবং মস্তক লঙ্ঘাইয়া ফেলিয়া দেয় এবং বরণ করা হয়। পরে পরামাণিক কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাহার মুখচন্দ্রিমা পানে দ্বারা আবৃত করিয়া পরামাণিকদ্বয় বরকে সাতবার পরিক্রমণ করিয়া কন্যাকে বরের সম্মুখে লইয়া "বর বড়, কি কন্যা বড়" করিয়া, উভয়ের মস্তকোপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, শুভদৃষ্টি করায়; মাল্যবদল, এবং পাণিগ্রহণ করাইয়া, বর-কন্যাকে বিবাহস্থলে আনাইয়া, মন্ত্রপাঠ ও কুশণ্ডিকা ইত্যাদি সমাপনানন্তর বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া কৌড়ি ইত্যাদি খেলাইতে হয়।

তৎপরদিবস আকাটা পুকুরে স্নান। একখানি শিলের নীচে ৫খানি হরিদ্রা, ৬টা সুপারি, ৫টা হরিতকী, ৫টা বয়ড়া ও ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্চ প্রকার সামগ্রী, এবং তাহার চারি পার্শ্বে ৪টী ছোট ছোট কলার গাছ পঞ্চসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তন্মধ্যে বর-কন্যাকে পাঁচ এয়ো মিলিত হইয়া স্নান করায়। ইহার নাম আকাটা পুকুরে স্নান, এবং বাসি বিবাহ। এই স্থানে বর বস্ত্র-

ত্যাগকালীন, মৌলিক হইলে কন্যাকর্ত্তার সহিত চুক্তি অনুসারে বরকে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী দিয়া কন্যার মাতা-পিতা বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন; কিন্তু বিবাহস্থলে বা বাসরগৃহে সূত্র বস্ত্র, রজতাঙ্গুরী এবং অন্ন জলের অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারেন না।

বিবাহের পরদিবস প্রাতে বরের জলখাবার বরকর্ত্তাকে পাঠাইতে হয়। ক্ষমতানুসারে নানাবিধ মিষ্টান্ন, পুরি, কচুরী ইত্যাদি এবং কন্যার আকাটা পুকুরে স্নান করিবার জন্য তৈল ও স্নান করিবার শাটী পাঠাইতে হয়। কন্যা-কর্ত্তা বরকে স্নান করিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র বস্ত্র দেন। আকাটা পুকুরে স্নান হইয়া গেলে, বরের পরিত্যক্ত বস্ত্র কন্যাকর্ত্তার নাপিত লয়। কন্যার পরিত্যক্ত বস্ত্র বরকর্ত্তার নাপিত পায়।

বাসি বিবাহের দিন, রাত্রিতে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে একটী কুটুম্বিতা হয়। তাহার নাম বরব্যবহার বা বর-ভাত, অর্থাৎ বর কাহার সন্তান, কি বৃত্তান্ত, তাহার পরিচয় আদি লইয়া, উভয় পক্ষের সম্মানার্থে কন্যাকর্ত্তা বরপক্ষীয়দিগকে ২৲ টাকা দেন, এবং বরকর্ত্তা কন্যাপক্ষীয়দিগকে ২৲ টাকা সম্মান দেন। বর কুলীন হইলে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি পরিধান করিয়া উভয় পক্ষীয় কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্র আহার করিতে বসেন। আর বর মৌলিক হইলে তাহাকে সেই বিবাহরাত্রির প্রাপ্য সূতার বস্ত্র, রূপার অঙ্গুরী পরিধান করিয়া বাসি বিবাহের রাত্রিতে বরভাত খাইতে হয়। ইহাই আমাদিগের চিরপ্রথা, এবং সেই প্রাচীন প্রথানুসারে অদ্যাবধি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

তৃতীয় দিবসে বর-বিদায়কালীন, বরকে শয্যাতুলানী, এবং বাসরজাগরণী স্বরূপ নগদ কিছু দিতে হয়; তাহা আপন আপন ক্ষমতানুসারে। কন্যা-কর্ত্তাকে বরের বাটীতে কলসীতুলানী ও দ্বারআগলানী, (অর্থাৎ যাহাকে ননদ ক্ষেমি বা ননদপিড়ি বলে) দিতে হয়; তাহার জন্য নগদ-দক্ষিণা অবস্থানুসারে দেওয়া হয়, তাহার জন্য কোন কথা নাই।

আইবুড়া ভাতের, বা বউয়ের মুখদেখানি লৌকিকতা আমার সময় তুমি, আর তোমার সময় আমি। যেমন দেওয়া, তেমনি পাওনা। হাতে হাতে বা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত লৌকিকতা কিছুই নাই।

বিবাহের পর, তৃতীয় দিনের দিন, বর-কন্যা বাটী আসিলে বরকর্ত্তার বাটীতে একটী মৃত্তিকার ভাণ্ডে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হয়, এবং সেই দুগ্ধ উথলিয়া পড়িলে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কি হইতেছে?" কন্যা বলে, "আমার

শ্বশুরের ধন উথলিয়া পড়িতেছে।" পরে বরকন্যাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া কন্যাকে একটী থালায় অলক্তক জল করিয়া তাহার উপর দণ্ডায়মানা করিয়া, বরকন্যাকে পূর্ব্বের ন্যায় বরণ করিতে হয়। পরে একটী গৃহে উভয়কে একত্র বসাইয়া কৌড়িখেলা হয়। ঐ দিবস রাত্রিতে বরকর্ত্তার বাটীতে আমাদিগের স্বজাতীয়ের পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ থাকে। কুটুম্ব মহাশয়েরা রাত্রিতে সকলে উপস্থিত হইলে, বরকর্ত্তাকে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সূতা পোহাইবার অর্থাৎ বর-কন্যার হস্তের সূতা খুলিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। অনুমতি হইলে গোষ্ঠীর তরফ হইতে জনৈক প্রধান কুলীন বাটীর ভিতর যাইয়া বর-কন্যাকে বিবাহ কালীনের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এবং টোপর ইত্যাদি মস্তকে দিয়া বসাইতে হয়। প্রধান কুলীন মহাশয় যাইয়া একটী পাত্রে হরিদ্রা-জল করিয়া, উভয়ের হস্তের সূতা ও জাঁতি এবং কজ্জললতা লইয়া সেই হরিদ্রা-জল পাত্রে রাখিয়া দেন, ও মস্তকের টোপর নামাইয়া দেন। (হস্তে সূতাবন্ধন অষ্টাহ থাকে না।) তাহার পর পাকস্পর্শের ব্যবস্থা। কুটুম্ব মহাশয়দিগের সেবার সময় কন্যা একটী পাত্রে করিয়া ২।১ জনের পাতে পরমান্ন দিয়া, অবশেষে বরকে সেই পাত্র সমেত দিয়া যায়। ইহারই নাম পাকস্পর্শ।

ফুলশয্যার ব্যবস্থা কলিকাতায় আছে, পল্লীগ্রামে নাই। ফুলশয্যার দিন কন্যাকর্ত্তা, বরের জন্য সূতার ধুতি, উড়ানি, এবং কন্যার জন্য লালপেড়ে শাটী, ফুল, চন্দন, আতর, গোলাপ, নানাবিধ সৌগন্ধদ্রব্য, এবং বিবাহ-দিবসের দান-সামগ্রী, খেলানা, আরসি, চিরুণী, ক্রুশ ও বরকর্ত্তার বাটী হইতে গাত্র-হরিদ্রা এবং অধিবাসের যে সকল উপঢৌকন পাঠান হইয়াছিল, কেবল তৈল-হরিদ্রা ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ফুলশয্যার সঙ্গে ফেরত পাঠাইয়া দেন। ইহা ব্যতীত ক্ষমতানুসারে নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইতে হয়। পল্লীগ্রামে এ ব্যবস্থা নাই। তথায় আছে মেলানিভার। বিবাহের পর, কন্যাকর্ত্তা তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া ক্ষমতানুসারে চিঁড়া, মুড়কি, বাতাসা, দধি ও নাড়ু বরকর্ত্তাকে দিয়া কন্যা লইয়া আসেন। ইহাকে পল্লীগ্রামে মেলানিভার কহে।

স্বগ্রামের মধ্যে হইলে, সূতা পোহাইবার পর কন্যা শ্বশুরালয় হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া, পিত্রালয়ে যায়। তথায় মিষ্টান্নগুলি রাখিয়া পিত্রালয় হইতে কিঞ্চিৎ ইন্দুরমাটি এবং মিষ্টান্ন লইয়া পুনরাগমন করে। ইহাকে "ধূলাপায়ে লগ্ন" বলে। দূরদেশ হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা-নক্ষত্রের বিচার করিয়া আনিতে হয়।

কন্যাদানকালে সকল জাতিকেই, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাক ও অপরাপর এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যাদান করিতে হয়, ইহা লেখা বাহুল্য বিবেচনায়, আমি লিখিলাম না।

পরিত্যক্ত বিষয়গুলি নিম্নে লিখিলাম।

বরণডালা অর্থাৎ একখানি থালায় ধান, দূর্ব্বা, একটি ছোট মুড়ি, নারিকেল, পঞ্চশস্য, শঙ্খ, ছোট চামর, এক ছড়া আখণ্ড কাঁঠালি কলা সাজান থাকে এবং স্বতন্ত্র নূতন কুলায় একখানি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা ঢাকা ৪টি ছোট হাঁড়ি, খুব ছোট মাটির ভাঁড়ের মত, তাহাকে আকহাঁড়ি বলে, তাহার আবার সরার মত ৪ খানি ঢাক্‌নি আছে। সেই ৪টি হাঁড়িতে হরিদ্রা মাখান চাউল, ৫ খানি গোটা হরিদ্রা, ৫টি হরিতকী, ৫টি বয়ড়া, ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্চ প্রকার দ্রব্য থাকে।

বাসর গৃহে বর-কন্যার কড়িখেলার পর, সেই কুলাখানি লইয়া বরের সম্মুখে রাখিয়া, সেই আখহাঁড়ির চাউলগুলি কুলায় ঢালিয়া দেয়, এবং স্বর্ণরজ্জু দিয়া কন্যার হস্তবেষ্টন করিয়া দিতে হয়। * পরে কন্যা সেই চাউলগুলি দুই হস্তে অঞ্জলী করিয়া লইয়া সেই ৪টি হাঁড়ি পূর্ণ করে। পরে বর সেই ঢাক্‌নি ৪ খানি লইয়া কন্যার নাম বলিয়া—যথা অমুকের লজ্জা সরমে ঢাকা পড়িল, বলিয়া একে একে ৪টি হাঁড়িতে ঢাকা দেয়। ইহাকে আখহাঁড়িও বলে এবং মঙ্গলা হাঁড়িও বলে। এই সকল প্রথা আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে চলিত।

আমাদিগের স্বজাতিকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা নাই। কৃতিকে প্রতিদিন কুটুম্ব মহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়; এমন কি যদি কোন কৃতি মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন দুইবেলা সেবা লইতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে দুইবেলা দুইবার নিমন্ত্রণ করিতে আসিতে হয়। এ নিয়ম কেবল কলিকাতায় প্রচলিত নাই। পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই আছে।

কলিকাতা সহরের অধিবাসীদিগের যেরূপ নিয়ম ও বিবাহ-পদ্ধতি, তাহা লিখিলাম, আপনি দয়া করিয়া মুদ্রিত করিয়া অষ্টগ্রামী সমাজকে বাধিত করিবেন।

অন্য কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে, পত্রদ্বারা জ্ঞাত করাইবেন। কৃতসাধ্য মত মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করাইতে ত্রুটি করিব না।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রক্ষিত ২য় পত্রে লিখিতেছেন।

---

* স্বর্ণরজ্জু অর্থাৎ একছড়া রেশমের হার দিয়া হস্ত বেষ্টন করার নাম স্বর্ণরজ্জু।

সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন। পরে আমি ইতিপূর্ব্বে "তাম্বুলি অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতি" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কতক অসম্পূর্ণ থাকায়, অদ্য নিম্নে আরও লিখিলাম।

১। বিবাহের তারিখে বরের বাটী হইতে কন্যার বাটীতে অধিবাস যাইলে, যাঁহারা অধিবাসের ডালার সহিত যান, তাঁহারা কন্যার বাটী হইতে "সমুদ্র বিদাই" বাবত ২।১টী মুদ্রা সম্মান বাবত পাইয়া থাকেন।

২। বিবাহের তারিখে বর সভাস্থ হইলে বরকর্ত্তাকে গ্রাম্য বাব ইত্যাদি ও ডেলামারার বাবত কিছু দিতে হয়।

৩। বিবাহের সময় সভা-বরণ পান-গুপারি দ্বারা ও গুরু-বরণ, পুরোহিত-বরণ, গ্রাম্য দেবতাদি-বরণ ইত্যাদি বরণও পান গুপারি দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। আর কন্যাকর্ত্তাকে তাঁহার পূর্ব্ব জামাতাগণের মান্য স্বরূপ অবস্থানুসারে ধুতি উড়ানি বস্ত্রাদি দিয়া বরণ করিতে হয়। মাতুল মান, মাতামহীর মান ইত্যাদি বরকর্ত্তাকে দিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বাসর-জাগানি হয় এবং তৎপরদিন শয্যা তুলা হয়, তৎ বাবৎ বরকে "বাসর-জাগানি" ও "শয্যা তুলানী" কিছু দিতে হয়।

৪। কন্যা দ্বিরাগমন কালীন শ্বশুরালয় যাইলে তৎসঙ্গে একটী মেলানি-ভার দিতে হয় অর্থাৎ তাহাতে অবস্থানুসারে যথোপযুক্ত মিষ্টান্ন ও নানাবিধ দ্রব্যাদি ও কন্যার কাপড়াদি বা শয্যাদি এবং বরের বাড়ীর গুরুজন ব্যক্তিকে নমস্কারী কাপড় চোপড় দিতে হয়।

৫। বিবাহের পর প্রথমতঃ জামাতা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা দিয়া জামাতা প্রণাম করিবে। পরে জামাতা প্রত্যাগমন কালীন নগদ টাকা ও বস্ত্রাদি উক্ত গুরুজনের নিকট হইতে সম্মান স্বরূপ লৌকিকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৬। গহনা বা পণ কিছু নির্দ্ধারিত নাই। উভয় পক্ষের অবস্থা ও ইচ্ছানুসারে কন্যাকে অলঙ্কার দেওয়া হয়।

৭। "আর অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির" ১১ দফা অনুসারে একামন করিয়া শুভাশুভ কার্য্য শেষ করিতে হয়। বিদেশস্থ কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, "জানান এক পণ কড়ি" দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল। শুনা যায়, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ৫ একটী পয়সা উক্ত একপণ কড়ির পরিবর্ত্তে ঝিউরী জানান ইত্যাদি যাহা দিতে হয় এবং তাঁহার বাটীতে কোন দেবতা থাকিলে

তাঁহার বাবত পৃথক ৫ পয়সা মান্য দিতে হয়। ঐ সকল মান্য দিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়। এইরূপ করিলে তবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু স্বদেশে বিবাহ আদির নিমন্ত্রণ হইলে ঐ নিয়ম খাটে না। সেস্থলে উক্ত নিমন্ত্রণ জন্য মান্য সন্দেশ বাবত ৺জগন্নাথ জীউকে অর্পণ করা হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া হয় বলিয়াই স্বদেশের নিমন্ত্রণে কড়ির পৃথক্ ব্যবস্থা নাই। বিদেশে লোকাভাবে ডাকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দেবতার মান্য ও ঝিউড়ি জানানাদি কড়ি বাবত টিকিট উক্ত পত্র মধ্যে পাঠান হয়।

৮। উক্ত "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১২ দফায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও বালেশ্বর অষ্টগ্রামী সমাজ "মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউকে" পূজা পাঠান সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়মে পরিচালিত হন কিনা? তৎসম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

৯। আমাদের স্বস্থান অর্থাৎ মেদিনীপুর অষ্টগ্রামী সমাজের সন্দেশ বাবত কড়ির টাকা মেদিনীপুর ৺জগন্নাথ জীউকে দেওয়া হয়। ঐরূপ কলিকাতাস্থ ও বালেশ্বর স্থানের অষ্টগ্রামী তাম্বূলি মহাশয়গণও মেদিনীপুর স্থানের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের সন্দেশের টাকা এই মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউকে অর্পণ করেন। ইহা বহুকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আর উক্ত "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১১ দফায় লিখিত ১৬৲ ৮৲ ৪৲ ২৲ টাকা (অবস্থানুসারে) সন্দেশ বাবত কৃতির নিকট লইয়া সকল স্থানেই কার্য্যের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সমস্ত টাকা মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউর বাবত ষোল আনা, অষ্টগ্রামীর তরফ একজন খাজাঞ্চির নিকট খাতায় জমা হইয়া থাকে।

১০। মহাশয় "মালিক আদির অর্থ কি?" জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল। "স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, আত্ম, অন্তরঙ্গ, দশ গ্রামের দশ জনা" বেষ্টিত মহাশয়েরা সকলেই উপস্থিত। দশের অনুমতি হইলে কৃতি কার্য্যের জন্য অনুমতি পায়। ইত্যাদি বচনটী একজন কুলীনের দ্বারা ব্যক্ত হইবে। তদনুসারে কৃতি অনুমতি পাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রথমতঃ ১০টী গ্রাম লইয়া প্রথমে অষ্টগ্রামী সমাজ গঠিত হয়। তজ্জন্যই দশ গ্রামের নাম এ পর্য্যন্ত খ্যাত আছে। উক্ত দশটী গ্রামের নাম ধরিয়া কোন মাসের কোন সংখ্যার কোন বৎসরে ১০টী কুলীন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা "মহাজন বন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকায় ১০।১১ পৃষ্ঠায় (উপাধি ও মন্তব্য) স্থানে উদ্ধৃত হই-

রাছে, তন্মধ্যে "পোল ও পাতুল" এই দুই গ্রাম কোৎ অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অবশিষ্ট ৮টী গ্রাম মাত্র বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে।

১১। "মালিক" শব্দে মৌলিকের যিনি কুলীন, তাঁহাকেই বুঝা যায়। কুলীন না হইলে শুভাশুভ কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না। কুলীনের পাত্রের বাড়ীতে কোন শুভাশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকের বাটীতে কুলীনের নিকট যে ডালা পড়িবে, তাহাতে যে টাকা ও পান শুপারি ইত্যাদি দেওয়া হয়, তাহা মাশুস্বরূপ কুলীনেই গ্রহণ করিবেন। আর যে কুলীনের পাত্র নাই, তিনি একানি-অংশী ভাই। কোন কুলীনের বাটীতে কোন কার্য্যকলাপ উপস্থিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা অর্থাৎ কুলীনগণের মধ্যে যিনি উক্ত একাসনে উপস্থিত থাকিবেন, তিনিই উপরোক্ত বচনটী ব্যক্ত করিবেন। কুলীনের ঘরের কার্য্যে ডালায় ২৫৲ টাকা দেওয়া হয়। তাহা কুলীনের ভাণ্ডারে যাইবে অর্থাৎ কুলীনের নিজ ঘরেই থাকিবে; উক্ত ডালার টাকা অন্ত কেহ পাইবেন না।

১২। অষ্টগ্রামী সমাজের শুভাশুভ কার্য্যে কুটুম্বিতায় একটা কাগজের প্রথা আছে। উক্ত কাগজে অগ্রে সারদে, বামনদে, হেলান মল্লিক, সেব্যরাজসেন, সেনপুরের সেন, কুশমাথা গুঁই, বড়ামের লাহা ইত্যাদি পর পর কুলীনের নাম লিখিতে হইবে। বাগড়ার নন্দীর নাম কুটুম্বিতার কাগজের সহিত লিখিত হয় না। উক্ত আমদানী টাকা মোড়কে করিয়া পৃথক রাখা হয়। আর মৌলিক পাত্রগণের নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে "মজকুরি-আশের" নাম কাগজে আড়ভাবে লিখিতে হইবে। তৎপরে উপরোক্ত কুলীনগণের পরের পর যেমত কাগজে নাম লিখিত হয়, তদনুসারে উক্ত কুলীনগণের পাত্রের নাম অর্থাৎ মৌলিকের নামগুলিও লিখিত হয়।

১৩। শুভ বিবাহ আদিতে সভায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখগণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ ও নবশাখগণকে মালা-চন্দন ব্রাহ্মণের দ্বারা বিতরণ করিয়া, পরে স্বজাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারদে, বামনদে, হেলান মল্লিক ইত্যাদি যাবতীয় কুলীন মৌলিকগণকে ক্রমানুসারে পরের পর মালা চন্দন দেওয়া হয়। কুলীনের অনুমতি না হইলে কুতির কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

১৪। ভাদ্র মাসের মাসিক পত্রিকায় "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১১ দফায় লিখিত ভাই, পাত্র এবং অন্তরঙ্গ—ইহারা কি সভা হইতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, অথবা কিরূপ? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। উত্তরে বলি-

তেছি যে, কৃতি অবস্থাপন্ন হইলে তাহার শুভাশুভ কার্য্য উপলক্ষে যে কয়েক দিন কার্য্য করিবেন, তাহাতে ষোল আনাকে উক্ত কয়েক দিন কার্য্য উপলক্ষে ডাক ও নিমন্ত্রণ অর্থাৎ ষোল আনাকে আহ্বান করিয়া সমবেত করিতে হইবে। উক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেবল ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ দ্বারা উক্ত কার্য্য সারা চলিবে না। তবে কৃতি অবস্থাহীন হইলে, উক্ত কৃতি প্রথমে যে একটি একাসন আহ্বান করিবেন, সেই একাসনের উপস্থিত ষোল আনা কৃতিকে অবস্থাপন্ন যগুপি বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে অত্র পত্রের ১০ দফায় লিখিত কুলীন ও অন্তরঙ্গ ও ভাই, পাত্র ইত্যাদির মধ্য হইতে এক এক জনা বা প্রত্যেককে লইয়া কৃতি কার্য্য করিতে পাইবেন। এমত ষোল আনা বিবেচনা করিলে এই মত আদেশ দিয়া থাকেন; তদনুসারে কৃতির কার্য্য সমাধা হয়। অর্থাৎ উক্ত দশ দফায় লিখিত ব্যক্তিগণের উপর উক্ত সময়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ক্ষমতা ষোল আনা দিয়া থাকেন। তাহাতে চিরস্থায়ী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে ধারণা করিবেন না। কেবল উক্ত কৃতির ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্যই দেওয়া হইয়া থাকে।

চতুর্গ্রামী সমাজের বিবাহ।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দে মহাশয় লিখিয়াছেন।

আমাদের সমাজে বিবাহে কৌলীন্য-প্রথা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; বরং মালিক-প্রথা আছে; কিন্তু তাঁহাদের সম্মানার্থ নগদ মুদ্রাদি কিছুই দিতে হয় না। তবে যদি বরকর্ত্তার পিতা মালিক হন, তাহা হইলে, ধনসোনা স্বরূপ ১॥৶০ কন্যাকর্ত্তাকে দিতে হয়।

বর সভাস্থ হইলে, পান সুপারি দেওয়া হয়। উহা দ্বারা সভা-বরণ হয়। এই পান সুপারির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; পান পান না পান না পান। বিবাহের পূর্ব্বে গুরু পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ তৎপরে স্বজাতি ও সভাস্থ অন্যান্য লোকের অনুমতি লইয়া বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব জামাতাদিগের বরণ অগ্রে দিতে হয়, তৎপরে মাতুল সম্মান ও মাতামহীর সম্মান দিতে হয়। বিবাহের পর দিন "আকাটা সিনান" করান হয়। ইহা ভিন্ন বিবাহের পর দিন অন্য কোন প্রথা প্রচলিত নাই। অবস্থানুসারে বরকে পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে সূতার কাপড় দেওয়া হয়; ফুলশয্যা আছে, ক্ষমতানুসারে দেওয়া হয়।

বিবাহরাত্রে কন্যার বাটীতে যে যজ্ঞ করিয়া বরযাত্রী খাওয়ান হয়. এই বর-

যাত্রীর ভোজন দক্ষিণা কিছু কিছু দিতে হয় ;—ইহাকেই "সুকৃতি ভোজন" বলে এবং এই যজ্ঞের অনুমতি কুটুম্ব মহাশয়গণের নিকট হইতে পূর্ব্বেই লইতে হয়।

বিবাহের পর বর বাটীতে পৌছিলে, বরকর্ত্তা গ্রামস্থ স্বজাতির একটা ভোজ দিয়া থাকেন ; কন্যার পিত্রালয় বরের স্বগ্রামে হইলে, এই সঙ্গে কন্যার আত্মীয় গণকেও নিমন্ত্রণ করা হয়, ইহাই বৌভাত।

বিবাহের তৃতীয় দিবসে বরকন্যা নিজালয়ে আসিয়া, আটদিনের দিন অষ্টমঙ্গলা শেষ করেন।

নমস্কারী কাপড় দ্বিরাগমনের সময় দিতে হয়। বৎসরান্তে দ্বিরাগমনের নিয়ম ; কিন্তু মেয়ে বড় হইলে, ধূল পায়ে লগ্ন করা হয়।

বিবাহের পর সর্ব্ব প্রথম বর শ্বশুর বাটী আসিলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে টাকা দিয়া প্রণাম করিতে হয়। সেই প্রণামী টাকা তাঁহারা ফেরত দিয়া, তৎসঙ্গে আরও লৌকিকতা করেন।

গহনা বা পণের কোনরূপ পীড়াপীড়ি নিয়ম বা দর দস্তর করা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ। অবস্থানুসারে গহনা দেওয়া হয়।

অগ্রে কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দিতে হয় ; কিন্তু বরের বাটী হইতে লগ্নধরণী হরিদ্রা সিন্দুরাদি পাঠাইতে হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ সর্ব্ব সাধারণকে করা হয় ; এবং সকলেই লৌকিকতা দিয়া থাকেন।

দরিদ্রেরা কন্যা বিক্রয় করিয়া পণ লইয়া থাকে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

বিবাহের পূর্ব্বে জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং মালিক একাসন করিয়া, উঁহাদের সম্মান স্বরূপ ১৲ টাকা ও পান সুপারি দিয়া বিবাহের অনুমতি লইতে হয়। পূর্ব্বে টাকার পরিবর্ত্তে কড়ির ব্যবস্থা ছিল। এখন তাহা নাই, এখন ১৲ টাকা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত লওয়া হয়। এই টাকা সভায় দিলে দেশ বিদেশ সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল এবং বিবাহের সমাচার, পত্র দ্বারা দেওয়া হয়।

বিবাহের পর কন্যা লইতে আসিলে মেলানী-ভার ও কল্যাণীয় লাড় দিতে হয়। ছাঁদলাতলার খরচা কন্যাকর্ত্তাকে দিতে হয়, পণে বিবাহ হইলে বরকর্ত্তা দিয়া থাকেন। পীতাম্বরবাবু দ্বিতীয়বার লিখিয়াছেন ;—

যদ্যপি উভয় পক্ষের মালিকের সহিত বিবাহ হয়, তবে ধনসোনা স্বরূপ ১॥৵০ আনা কাহাকেও দিতে হয় না। বিবাহের পরদিবস কন্যার বাটীতে যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞকেই সুকৃতিভোজন বলে। দিবাভাগে ও রাত্রিতে যজ্ঞ হয়। এক্ষণে বরযাত্রীর সুবিধার জন্য দিবাভাগে যজ্ঞ ও রাত্রিতে জলপান হয়। কার্য্য সমাধা

হইলে মালিক এবং পাত্রকে ১৲ টাকা অথবা ॥০ আনা মানস্বরূপ বিদায় উভয়কেই করিতে হয়। সেই বিদায় উহারা উভয়ে ॥৵০ আনা ও ।৵০ আনা ভাগ করিয়া লয়। কার্য্য সমাধা হইলে ডালাবিদায় করা প্রচলিত আছে। ঐ ডালা ৪ খানা কুতির বাটি হইতে বাহির হয়; ঐ ডালা দে, কুণ্ডু, সেন, গণ ইঁহারা পাইয়া থাকেন। ডালার নিয়ম ৬ পণ ১৫ গণ্ডা করিয়া কড়ির দুইখানি ডালা বাহির হয়; একখানি সেনপুরের দায় দিয়া, আর একখানি বিষ্ণুপুরের দায় দিয়া বাহির হয়, আর একটি ডালা এক কাহন পাতুলসাঁতার দায় দিয়া বাহির হয়, আর একটি ডালা ৪ পণ ১০ গণ্ডা দেপুরের দায় দিয়া বাহির হয়। এই ৪খানি ডালার মধ্যে দেয়ার দে কপিলর্ষি গোত্র হইলেই ঐ ডালা গ্রহণ করিবেন। ইহাকে গৌরবের ডালা কহে। অপর দে হইলে ইহা পাইবেন না। আর বিষ্ণুপুরেরটী কুণ্ডু পাইবেন, সেনপুরেরটী সেন পাইবেন, পাঁতুল সাঁতারটী গণ পাইবেন। এই ৪টী ডালার মধ্যে ঐ মালিকগণের বাটীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে সেই ডালাখানি ভাঁড়ারগত হইবে, ও বাকি ৩খানি ডালা বিলি হইবে। বরের তৃতীয় দিবসে বাটী আসিবার সময় বরকর্ত্তার বিদায় ১৲ টাকা ও নিতবরের বিদায় ॥০ আনা, আর বরযাত্রীর বিদায় কেহ২ গায়ে২ করিয়া থাকেন, কেহ বা ক্ষমতা অনুসারে দিয়া থাকেন। আর একটী কথা, কন্যার বাটীতে বিবাহের রাত্রিতে কন্যার ভগিনীরা বাসর জাগান ও তাহাঁর পরদিবস আকাটা স্নানের পর দুধপান্ত ও কড়িখেলা চিরপ্রথা আছে। এবং ঐ দুধপান্তর উচ্ছিষ্টতোলা কন্যার ভগিনীরা মান্য স্বরূপ কিছু পাইয়া থাকেন, তাহা বরকর্ত্তাকে দিতে হয়। বর ও কন্যা বাটীতে পৌছিলে কলসী তুলান ও দুয়ার আগুলা হিসাবে বরের ভগিনীদিগকে মান্য স্বরূপ কন্যার পিতাকে অবস্থানুসারে দিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরকর্ত্তাকে কন্যার ভ্রাতৃবর্গের মান্য স্বরূপ ২৲ টাকা দিতে হয়। বর বিদায় কালীন ২৲ টাকা কন্যাকর্ত্তাকে বরের ভ্রাতৃবর্গের বিদায় স্বরূপ দিতে হয়। কেহ কেহ গায়ে গায়ে শোধ করিয়া দেন।

সপ্তগ্রামী সমাজের বিবাহ।

নান্দিবৃদ্ধি হইয়া অধিবাস হয়। তৎপরে বরের বাটী হইতে হলুদবাটা এবং হরিদ্রাসূতা, দূর্ব্বা, সন্দেশ, বাতাসা, গোটা পান ও সুপারি কিছু কিছু লইয়া জনকয়েক সধবা স্ত্রীলোক এই সকল দ্রব্য ক'নের বাটী লইয়া যান ও লগ্ন মত্রে।

তথায় ক'নের গায়ে এই হলুদ দিয়া হস্তে জাঁতি দেওয়া হয়। এবং পান, সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা নিমন্ত্রিত সধবা স্ত্রীলোকদিগকে তথায় বিতরণ করা হয়। ক'নের গায়ে হলুদ দিবার সময় ৫ খাই হরিদ্রাসূতা ৫টী দূর্ব্বা সহ উহার বাম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ক'নের বাটী হইতে উক্ত তেল হলুদ এবং উহার সঙ্গে তাঁহারা আবার পান, সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা দিয়া, সেই সকল সধবা স্ত্রীলোকের দ্বারা বরের বাটী পাঠাইয়া দেন। এইবার বরের হাতে ৫টী দূর্ব্বাসহ ৫খাই হরিদ্রাসূতা এবং হস্তে দর্পণ দেওয়া হয়। সন্দেশ বাতাসা বা পান সুপারি দিবার কোন পরিমাণ নাই; অল্পই দেওয়া হয়। নববস্ত্র পরিধান করিয়া গায়ে হলুদ হয়, কিন্তু তাহা নিজে দেয়। উহা কাহারও প্রদত্ত নহে।

বিবাহের ২।৪ দিন পূর্ব্বেও গায়ে হলুদ হয়। অথবা কল্য বিবাহ অদ্যও গায়ে হলুদ হয়। সম্বন্ধের পরে কোষ্ঠি গণনা প্রায়ই হয়। পাল্‌টি বিবাহ, অর্থাৎ দুই-জনেরই ছেলে মেয়ে পরস্পরে বিবাহ হয়। কিন্তু তাহা অতি বিরল। গায়ে হলুদের পর বর ও কন্যার নিকট আত্মীয়েরা স্ব স্ব বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমান্ন ভোজন করান এবং নববস্ত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, ইহাকেই "আইবুড়া ভাত" বলে। দূর সম্পর্কে যে সকল স্বজাতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহারা সকলেই বস্ত্র এবং কিছু মিষ্টান্ন বা দুধ দিয়া লৌকিকতা করেন। বরের বাটীতে এই লৌকিকতায় ধুতি চাদর, ক'নের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে সাটী কাপড় দিতে হয়। নিমন্ত্রণ না হইলে কোন তত্ত্ব করিতে হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের কোন সভা সমিতি বা মালিককে জানাইতে হয় না, তবে সমাজের পূজনীয় মহোদয়দিগকে জানাইয়া "অধ্যক্ষ" করা হয়। কিন্তু নিমন্ত্রণ ইচ্ছা কিম্বা অবস্থানুসারে করা হয়। তাহাতে কাহারও মান অভিমান নাই। সাধারণের নিকট যে বস্ত্র লৌকিকতা পাওয়া যায়, তাহা আবার তাঁহাদের বাটীতে কাহা-রও বিবাহের সময় এই লৌকতার পুনঃপ্রদান হয়। নচেৎ নহে।

বিবাহের দিন বর এবং ক'নের বাটী ছাঁদলাতলা হয়। দুইজন লোক দাঁড়াইতে পারে এমন একটু বাটীর ভিতরের উঠানে অথবা কোন স্থানে ৪টি "কলার তেড়" অর্থাৎ ক্ষুদ্র কলাগাছ চারিকোণে রাখা হয়; ইহাকেই ছাঁদলা-তলা বলে। বরের বাড়ীর ছাঁদলাতলার ভিতর শিল ও পাথর এবং ক'নের বাড়ীর ছাঁদলাতলায় একখানি শিল ও আলিপণাযুক্ত পিঁড়ি রাখা হয়।

বিবাহের দিন "জল সওয়া" হয়, তৎপরে বৈকাল বেলা নাপিত আসিয়া বরকে কামাইয়া দেয়। এ সময় বরের পরিধেয় যে বস্ত্র থাকে, তাহা নাপিতের

প্রাপ্য। বর কামাইয়া ছাঁদলাতলায় স্নান করে; পরে কয়েকজন সধবা স্ত্রীলোকে ইহাঁর হস্তে ৭ খাই হরিদ্রাসূতা বাঁধিয়া দিয়া,বরণডালা এবং শ্রী দিয়া বরণ করে।

"শ্রী" ব্রাহ্মণের সধবা স্ত্রীলোকে প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহা চাউল বাটার বিবিধ রং দিয়া পর্ব্বতের মত করা হয়। এই পর্ব্বতের গাত্রে বৃক্ষলতাদি করিয়া শিল্প দেখান হয়।

বরণডালা অর্থাৎ একখানি থালায় ধান, দূর্ব্বা এবং ৪টি মাটির চোরো থাকে। মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত খুব ক্ষুদ্র হাঁড়ির মত আকৃতি দ্রব্যকে "চোরো" বলা হয়। ইহার আবার ঢাকনী আছে। কোন চোরোয় হলুদ মাখা চাউল, কোনটিতে পান বা সুপারি আদি থাকে। এই চোরোগুলিও থালার উপর বসান থাকে, ইহাকে বরণডালা বলে। বরণের পর "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে" প্রভৃতি যাত্রার মন্ত্র পাঠ করা হয়। ওদিকে মেয়ের বাটীর ছাঁদলাতলায়ও ঐ ব্যাপার। তথায় নাপতিনী দ্বারা ক'নে নখ কাটিয়া আল্‌তা পরিয়া, পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েন। এ সমাজে ৮।১০ এবং ১২ বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এখানেও ছাদলাতলায় ক'নেকে ঐরূপ ডালা দিয়া, সধবা স্ত্রীলোকে বরণ করে।

সভায় ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যাদান করা হয়। সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করার পর বর ছাঁদলাতলায় যায়। তথায় স্ত্রী-আচার অর্থাৎ শুভদৃষ্টি হয়। তৎপরে বর ও ক'নেকে পুনরায় সভাস্থ করা হয়। এখানে প্রতিজ্ঞামন্ত্রের ও সাক্ষিমন্ত্রের পাঠ এবং শুভদৃষ্টি করিয়া কুশণ্ডিকার পর বিবাহ সমাপ্ত হয়।

তাহার পর বাসর ঘর। পরদিন বৈকালে বরকর্ত্তা যে গহনা পাঠাইয়া থাকেন, তাহা পরাইয়া ছাঁদলাতলায় আবার ক'নে ও বরের হস্তে ৭ খাই সূতা বাঁধিয়া বরণ করিয়া বর ক'নেকে পাঠান হয়। ইহাকেই বাসী বিবাহ বলে।

বরযাত্রী ভোজনের পর কন্যা এবং বরের উভয়ের বাটীর পান সুপারি স্বজাতিবর্গকে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কুলীনদিগকে ডালা দেওয়া হইত, এখন তাহা হয় না; ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা বরকর্ত্তা যাহা দিবেন, কন্যাকর্ত্তা উহার অর্দ্ধেক দিবেন,—ইহাই প্রচলিত প্রথা।

বর ও ক'নে বাটী আসিলে, তাঁহাদের বরণ করিয়া লওয়া হয়। এবং কড়ি-খেলা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্বিরাগমন হয়। শ্বশুর-বাটী নিকটবর্ত্তী হইলে, তথায় নচেৎ জ্ঞাতির বাটী গমনাগমন করাইয়া কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া, দ্বিরাগমন শেষ করা হয়। বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার বিবিধ দ্রব্যাদি রীতিমত ভাবে

দেওয়া হয়। দূরদেশ হইলে, টাকা ধরিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাত্রিতে সভায় দান সামগ্রী সাজাইয়া দেওয়া হয়। গহনা বা অন্য কোন দান সামগ্রী দিবার চুক্তি নাই। বরের বা ক'নের পণ নাই। এ সকল প্রথা এ সমাজে ঘৃণার্হ।

বিবাহের পর উভয় পক্ষেই নূতন কুটুম্ব ভোজন বলিয়া যজ্ঞ করেন। পাক-স্পর্শে পংক্তি-ভোজনের শেষে ক'নে আসিয়া ২।১০ পাতে পরমান্ন পরিবেশন করেন; ক'নের বাটীতে বাসী বিবাহের দিন বরকে পংক্তি-ভোজনে বসিতে হয়।

হরিদ্রা কাপড় পরিবর্ত্তনের পর বর জোড়ে আসিয়া শ্বশুর-বাটী ৮ দিন থাকেন;—ইহাই নিয়ম। এই সময় বর শ্বশুর-বাটীর গুরুতর সম্পর্কীয় জনগণকে টাকা দিয়া নমস্কার করেন।

বরের বাটীতে ক'নে দেখার দিন ক'নে তাহার মান্য গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে যথাসম্ভব ধুতি, চাদর, সাটি, থান দিয়া নমস্কার করে। সধবার সাটি, বিধবার থান কাপড়, পুরুষগণের ধুতি চাদর নমস্কারীরূপে প্রদান ও নমস্কার করা প্রথাসম্মত। ধনবান্ আত্মীয়েরা এই দিন গহনা দিয়া থাকেন;—সাধারণে টাকা দিয়া বৌ'র মুখ দেখেন।

বিবাহের পূর্ব্বে কোষ্ঠি গণনা করিয়া,ছেলে এবং মেয়েকে টাকা বা অলঙ্কার দিয়া "বাগদত্ত" করা হয়।

ঘড়ি চেইন এবং রূপার বাসন ইচ্ছানুসারে বড়লোকেরা দিয়া থাকেন।

মাতুল বরণ নাই। কিন্তু দান সামগ্রীর সঙ্গে ভোদোর লাড়ু ১০০ শত ন্যূনাধিক্য পরিমাণে দেওয়া হয়; এই সঙ্গে শাশুড়ী এবং ননদের লাড়ু সম্মান-স্বরূপ কিছু নূতন আকৃতিতে বড় করিয়া দেওয়া হয়। ননদের লাড়ু ভিন্ন দর্পণ, চিরুণী, কাপড়, সিন্দূর-চুবড়ী ইত্যাদি প্রাপ্য আছে।

বিবাহ-বাসরান্তে "বরের শয্যাতুলা" বলিয়া চাওয়া হয়; কিন্তু টাকা লাগে না। এ প্রথা ক্রমেই মৃতাবস্থায় পতিত—তাই জোর নাই। বর যে টাকা দিয়া নমস্কার করেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপ্রদান করিয়া লৌকিকতা করিবার রীতি নাই। বরযাত্রীর রাহাখরচ বর-পক্ষকে দিতে হয়। সুকৃতি-ভোজন আছে, কিন্তু স্বজাতীয় বরযাত্রীর দক্ষিণা দিবার প্রথা নাই। ইহাদের ভাগিনেয়ের বরণ নাই; আইবুড়া ভাতের লৌকিকতা অষ্টগ্রামী সমাজের অনুরূপ।

পল্লী সমাজের বিবাহ।

ডুমকা রসিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দে উকিল মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আমাদের সমাজ অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আদি সমাজ হইতে আসিয়া আমরা বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় প্রথমতঃ ৬টি গ্রামে বাস করিয়াছিলাম। গ্রামের নাম যথা—১ যশপুর, ২ ডুবরাজপুর, ৩ কড্ডে, ৪ সেময়্লে, ৫ পারষণ্ডী, ৬ মধুনগর;—এই ৬টি গ্রামে বাস করাহেতু আমাদের সমাজ ছয় "থাকে" সমঅংশে বিভক্ত হইয়াছে। পরে কোন অজ্ঞাত কারণ হেতু বিভিন্ন থাকের বিবাদ হওয়ায়, ২ থাক একপক্ষ ও অপর ৪ থাক অন্য পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রত্যেক থাকের সংখ্যা ১০৮ ঘর। বিবাদের পর হইতে একপক্ষ ২১৬ ঘর বলিয়া ও অন্যপক্ষ ৪৩২ ঘর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই বিবাদে আদান প্রদানও সামাজিক আচার ব্যবহারের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই অর্থাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে। আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহ এই দুই জেলার মধ্যেই হইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদিগকে আদান প্রদানে সবিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কন্যার বিবাহে মনোনীত বর পাইলে, উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায় না এবং ঘর পাইলে, বরের অভাব হয়। পুত্রের বিবাহেও কখন কখন উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানীয় সমাজের সম্মিলন-প্রার্থনার এই একটি মূল কারণ।

সে যাহা হউক, ইহারই মধ্যে কোনরূপে কষ্ট স্বীকার করিয়া, পিতা মাতা কিংবা আত্মীয় স্বজন বর কন্যা নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে বর ও পাত্রী নির্দ্দিষ্ট হইলে, "আশীর্ব্বাদের" দিন স্থির করা হয়। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজন সমক্ষে ধান দূর্ব্বা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা আশীর্ব্বাদ করা হয়। পূর্ব্বে বরপক্ষীয় লোকেরাই কন্যাকে অগ্রে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিত। কিন্তু অধুনা পাত্রের অভাব হেতু অধিকাংশ স্থলেই কন্যাকর্ত্তারাই প্রথমে পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। আশীর্ব্বাদের সময় পাত্র ও পাত্রীকে উপযোগী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দেওয়া হয়। এইরূপে আশীর্ব্বাদ সমাধা হইলে, কন্যাকে বাগ্‌দত্তা বলা হয়। সম্বন্ধ দৃঢ় রাখাই আশীর্ব্বাদের মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু এখন অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

আশীর্ব্বাদের পর বিবাহের দিন স্থির করা হয়। ঐ বিবাহ সম্পাদনজন্য, আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ-প্রথা তিন প্রকার, যথা ১ অন্তরঙ্গ ২ গ্রামী ৩ শতেকী। আত্মীয় স্বজনকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইলে, অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিকটবর্ত্তী কতিপয় নির্দ্দিষ্ট গ্রামের কুটুম্ব লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম গ্রামী নিমন্ত্রণ। পূর্ব্বোক্ত ২১৬ এবং ৪৩২ ঘরের কুটুম্ব মহোদয়গণকে লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম শতেকী নিমন্ত্রণ। যিনি

যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি, তিনি সেই প্রকারের নিমন্ত্রণ করিয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্বদিনে অধিবাস বা গাত্রে হরিদ্রা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বরের গাত্রে অগ্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়। বরকর্ত্তা কন্যার জন্য "অধিবাস-বস্ত্র" প্রেরণ করেন। উক্ত বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়।

বিবাহের রাত্রে, পাত্র সভাস্থ হইলে, ব্রাহ্মণ, পুজনীয়লোক এবং বরকর্ত্তার বরণের পর, পাত্রকে সুপারি ও পট্টবস্ত্র দিয়া বরণ করিতে হয়। সেই সময় কন্যাকর্ত্তার অন্যান্য জামাতৃগণকেও সুপারি ও যথাযোগ্য বস্ত্র দিয়া বরণ করিতে হয়। তদনন্তর বৈদিক প্রথামত বিবাহ সমাধা হইলে, কন্যাকর্ত্তা জামাতাকে সাধ্যানুসারে স্বর্ণাঙ্গুরী, কাংসনির্ম্মিত কলস, ঘটী, থালা, বাটী, গেলাস, গাড়ু, পানপাত্র ইত্যাদি দ্রব্য এবং আধুনিক প্রথানুযায়ী ঘড়ি চেন প্রভৃতি প্রদান করেন এবং অধুনা সালঙ্কারা কন্যার দানপ্রথা অনেকস্থলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল দ্রব্য সাজাইয়া দান করিবার জন্য সভাস্থ করা হয়। বিবাহের পর বরকর্ত্তা নববধূকে ইচ্ছানুসারে অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। তদনন্তর পাত্র ও কন্যাকে গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হয় এবং লৌকিক প্রথানুসারে ফুলশয্যা করা হয়। পরদিন "সুকৃতি-ভোজনের" সময় কন্যাকর্ত্তা কুলীন না হইলে, তাঁহাকে কুলীনের সম্মান দিতে হয়। সেই সময় তাঁহার জামাতাদিগের মধ্যে কেহ কুলীন থাকিলে, তাঁহাকে পৃথক্‌ভাবে সম্মান করিতে হয়।

পল্লীসমাজে "দে দত্ত পাল সেন" কুলীন। সুকৃতি-ভোজনের পর ফুলশয্যার জন্য বরকর্ত্তা সাধ্যানুসারে সুগন্ধি তৈল এসেন্স আতর হরিদ্রা সিন্দুর আল্‌তা ইত্যাদি দ্রব্য এবং টাকা দিয়া থাকেন। টাকার সংখ্যা ৫্ হইতে ৪০্ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

বর ও কন্যার স্ত্রী-আচার হইয়া থাকে। বিবাহের সমারোহ ফেরত আসিলে বরকর্ত্তাকে বৌভাত দিতে হয়। সেই দিবস নববধূকে হাঁড়ি ছোঁয়ান হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনবর্গ বরের বাটীতে নগদ টাকা ও কন্যা বাড়ীতে ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য দ্বারা লৌকিকতা করেন। এই সব দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণেও সেইরূপ লৌকিকতা করিতে হয়।

বর ও কন্যা অষ্টমঙ্গলা করিবার জন্য জোড়ে শ্বশুর-বাড়ী গমন করে এবং সেই সময় বর কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা দিয়া নমস্কার করে। যে সকল ব্যক্তিকে নমস্কার করা হয়, তাঁহারা জামাতাকে উপযুক্ত বস্ত্র প্রতিদান করেন।

কৌলীন্য প্রথানুসারে বরকে নগদ টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সামাজিক নিয়ম নাই; তবে পাত্রের অভাবে এখন ভাল ঘর ও বর পাইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে নগদ টাকা পণ-স্বরূপ দিয়া থাকেন; এমন কি কন্যাকেও সালঙ্কারে দান করিতে হয়।

অন্য পক্ষে দরিদ্রেরা কন্যার পণ-গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেন।

বৈশ্যত্বের আলোচন।

বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। তাহা হইতে বৈশ্য শব্দের অর্থ উপভোগ-কারী হইয়াছে। যে জাতি অন্যত্র হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্ নামে খ্যাত হন। এই জন্য বিশ অর্থে মনুষ্য ও বৈশ্য দুইই বুঝায়। অভিধানে দেখা যায় যে, বৈশ্যশব্দের অপর অর্থ উপ-ভোগকারী। ইহাতে তাঁহারা যে ভারতবর্ষ প্রথমে অন্যত্র হইতে আসিয়া অধিকার করেন, ইহা বুঝা যায়। ঋ ধাতুর অর্থ গতি। সুতরাং বিশ ও ঋ ধাতুর অর্থগত কোন প্রভেদ নাই। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈদিক কালে আর্য্যদিগকে বিশ ও জন কহিত। এতাবতা আর্য্য জন সাধারণের নাম বৈশ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋগ্বেদ রচনার পর যাঁহারা গুণ কর্ম্মে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র হইলেন, তাঁহারা আর বিশ বলিয়া গণ্য হইতেন না। এই বিশ শব্দ হইতে পরবর্ত্তী কালে বৈশ্য শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতে উপনীত আর্য্য জাতির একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা তাঁহাদের পারমার্থিকতা। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই পারমার্থিকতা উপ-লক্ষে মতভেদ হইয়া পার্শী জাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভট্ট মোক্ষমূলর কহেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় ভাষা বিজ্ঞান সত্য। তিনি ভাষা বিজ্ঞান হইতে বৈদিক ও জেন্দ আবস্তিক জাতির পূর্ব্বপুরুষ এক, স্থির করিয়াছেন। ভারত আগত আর্য্যগণের পারমার্থিকতা হইতে যাজ্ঞিকতা উদ্ভূত হয়। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষত্ব তাহাদের অযাজ্ঞিকতা বা পরমার্থহীনতা। এতদ্দ্বারা ভারতীয় আর্য্যজাতির দুইটী প্রধান ভাবের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রথম শুচিতা, দ্বিতীয় জাতিভেদ। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের মানব সমাজে তদ্রূপ শুচিতা ও জাতিভেদ বিদ্যমান নাই। উল্লিখিত দুইটী বিশেষ ভাবের কারণ এক পারমার্থিকতা বা যাজ্ঞিকতা। অযাজ্ঞিকের দ্রব্য দেবসমীপে অগ্রাহ্য। যাজ্ঞিকের দ্রব্য বা উপহার দেবতার গ্রহণীয়। এতদনুসারে অযাজ্ঞিকের অন্ন ও জল দেবগ্রাহ্য নহে। ইহাই শুদ্ধাচারের মূল মন্ত্র। যাজ্ঞিক অর্থে যাজ্য। অনার্য্যেরা যাজ্ঞিক নহে, সুতরাং অযাজ্য।

পৌরাণিক কালে পরমার্থরত ভারতবাসী দেবতার অপ্রিয় অযাজ্যের জল ও অন্ন ব্যবহার করা অপমানজনক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হইয়া গেল। বর্ত্তমান জাতিভেদের ইহাই কারণ। তাহার ক্রম বিকাশে এক জাতির মধ্যে ভোজ্যান্নতা রহিত হইয়া উপজাতির সৃষ্টি হইতে থাকে। কাহাকেও জাতিচ্যুত করিতে হইলে ইদানীং সেই পূর্ব্বকালের আর্য্য অনার্য্যের যাজ্ঞিক ও অযাজ্ঞিকতা হইতে উৎপন্ন যাজ্য ও অযাজ্য ভাবগত জল আচরণীয়তা মূলক অন্ন ও পাণিগ্রহণ সংশ্রব রহিত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। মহাভারতীয় কালে গুণ কর্ম্মানুযায়ী মানবের বৃত্তিগত বর্ণচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে আর্য্য জাতিতে শূদ্র নামে শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে।

তাম্বুলী জাতি শূদ্র নামে পরিচিত হইলেও তাহারা বৈদিক কালের আর্য্য ও মহাভারতীয় কালের বৈশ্য। অদ্যাপি তাহাদের ধমনীতে আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহা ব্রাহ্মণের সহিত বর্ণ ও আকার গত সাদৃশ্য দেখিয়া তুলনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে। তাহারা যাজ্য ও শুচি। সুতরাং জল আচরণীয়। ইহা আর্য্যোচিত যাজ্ঞিকতার পরিচায়ক। বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, বৈশ্যজাতির সাধারণ নাম বণিক। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছে। শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যকে বণিক্ পথ কহে। তাম্বুলী এই পথাবলম্বী। বণিক পথাবলম্বী শাঙ্খিক কাংসার ও গান্ধিক জাতি শংখবণিক, কাংস্যবণিক ও গন্ধবণিক নামে বিখ্যাত। তাম্বুলী জাতির পক্ষে তাম্বুল বণিক নামে খ্যাত হইবার কোন বাধা নাই। বৈশ্যের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আপৎকালে ব্রাহ্মণের তাম্বুল ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে যজ্ঞোপবীত হইতে তাম্বুলবল্লী উৎপন্ন এবং প্রথমতঃ এক ব্রাহ্মণ তাম্বুল উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাম্বুল সম্মান প্রদর্শনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎব্যবসায়ীগণ সম্মানিত জাতিরূপে গণ্য হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কনৌজের রাজসভায় তাম্বুল ও আসন প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল।

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাত্।"

নৈষধ।

তাম্বুলীর ইতিহাসে কান্যকুব্জের নাম প্রথমে দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাঞ্চলে কণৌজিয়া নামে তাম্বুলীর একটা শ্রেণী আছে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অবশ্য কান্যকুব্জ হইতে আগত। নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ও বণিক্‌শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরির আদি পুরুষ কণৌজ হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। এই নবাগত বংশের কন্যার পাণিপীড়ন উপলক্ষে দলভেদ হইয়া ৪২ ও ১৪ র থাক উৎপাদন করে। ক্রমশঃ প্রসার বৃদ্ধি হইয়া অধুনা বঙ্গীয় তাম্বুলী সমাজ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় দলভেদের মর্য্যাদায় অধীর হইয়া ঐতিহাসিক স্মৃতিকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞানে তুচ্ছ করত কোন তাম্বুলী অপর শ্রেণীর স্বজাতিকে "তাম্বুলী নহে" বলিতে কুণ্ঠিত হন না। অপর দিকে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন ভাগিরথীর পূর্ব্বপারে আবদ্ধ সমাজ অপর শ্রেণীকে "রেঢ়" বা "রাঢ়িয়" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইহা জাতিভেদের চমৎকার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এ অবস্থায় বাঙ্গালী সমাজে তাম্বুলীকে বৈশ্যরূপে গ্রহণ করাইতে পুরুষানুক্রমে চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈশ্যবর্ণের জীবিকার জন্য সময়াভাব ঘটায় পারমার্থিক বিষয়ে ঔদাসিন্য জন্মে। তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপ হইতে থাকে। পুরুষানুক্রমে এইরূপ হওয়ায় বৈশ্যবর্ণ শূদ্ররূপে গণ্য হইল। অপরাপর জাতির ন্যায় তাম্বুলীর পূর্ব্বপুরুষগণও উক্ত কারণের বশীভূত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। যে বৈশ্যবর্ণের ভাগ সমাজে অত্যধিক ছিল, ক্রমে তাহা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। বহুকাল পরমার্থ লইয়া জীবন যাপন অধিক লোকে কদাচ করিতে পারে না। উদীয়মান পৌরাণিক যুগে সংহিতাদি প্রকটন কালে পরমার্থের নিতান্ত পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ জাতি ক্রিয়া বর্জ্জিত তাবৎ ব্যক্তিকে শূদ্রোচিত পারমার্থিক অনুষ্ঠানে রত করাইয়াছিলেন।

আজকাল বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আলোচনা অথবা বঙ্গীয় তাম্বুলীর বৈশ্যত্বের আলোচনা দেখিয়া অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা অধিক চিন্তাশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও হিন্দু সমাজের শ্রীবৃদ্ধিকামী, না, যাঁহারা ইহার প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন, তাঁহারাই যথার্থ হিন্দু ও ধর্ম্মপিপাসু একথা অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে চলিলেই

লোকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে—ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ কার্য্যে অধিক চিন্তা বা অধিক আয়াস নাই—এমন কি উহা চিন্তা শূন্যতারই পরিচায়ক। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব ব্রত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাঁহারা ধর্ম্মপথে অধিকতর অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, না, যাঁহারা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মচিন্তা শূন্য হইয়া জীবনব্রত উদ্যাপনে ব্রতী আছেন, তাঁহারা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ। সদাচারী ও সংযমী থাকিয়া আজীবন ব্রতধারী হইয়া যাঁহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা অধিক প্রশংসনীয়, না, যাঁহাদের জীবনে কোন ব্রত নাই, কোন আচার নাই, কোন শাস্ত্রচিন্তা নাই, কেবল অর্থ উপার্জ্জনে কামনার উপভোগই যাঁহাদের সংসার যাত্রার চরম লক্ষ্য, তাঁহারাই অধিক প্রশংসনীয়, এ কথা বিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আজকাল প্রকৃত আর্য্যভাব, প্রকৃত হিন্দুভাব সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে—পরস্পর ব্রতধারণ করিয়া পরস্পর সমাজের হিতকামী হইয়া—সদাচারে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করা কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা হিন্দু বলেন, তাঁহারা মুখেই হিন্দু বলিয়া থাকেন, কিন্তু মনোগত বা কার্য্যতঃ কেহই হিন্দু নহেন—সকলেই ঘোর স্বার্থপর। হিন্দুসমাজের ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুগণ কোন সমাজভুক্ত নয়—ইহারা সামাজিক ব্যক্তি বিশেষ নয়—ইহাদের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা নাই—পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই—ইহারা কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নয়—ইহাদের জীবনের লক্ষ্য কেবল যে কোন উপায়ে হউক, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া—সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া—ধর্ম্ম, ঈশ্বর বা পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিছু অর্থ উপার্জ্জন করতঃ স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি প্রতিপালন করা। সুতরাং এ সমাজে কোন ধর্ম্ম কথা বলা অথবা ধর্ম্মের আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ এক্ষণে বিষয়ীর সমাজে পরিণত হইয়াছে, অথচ ইহা যে প্রকৃত পক্ষে বিষয়ীর সমাজ তাহাও নহে। যে সমাজ বিষয় চিন্তায় অগ্রসর, তাহাদের মধ্যে যেরূপ একপ্রাণতা, জাতীয়তা, কর্ত্তব্য-বোধ প্রভৃতি আছে, আমাদের মধ্যে তাহারও লেশমাত্র নাই। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতিরা যাহারা বিষয়-প্রাণ, তাহাদের আচার ব্যবহার ও সামাজিকতাও আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। সুতরাং বর্ত্তমান

হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার না ধর্ম্মদৃষ্টি না বিষয়দৃষ্টি প্রণোদিত। ধর্ম্মের জন্য যদি অভাব বোধ হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এই বৈশ্যত্বের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইত না। আমরা বৈশ্য হইলে শূদ্রেরা আমাদের সেবা করিবে এই উচ্চ আশা বা গর্ব্ব প্রেরিত হইয়া আমরা এই বৈশ্যত্বের আলোচনা করিতেছি না। অনেকে বলেন, আজকাল শূদ্রগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা দাস উপাধি ত্যাগ করিয়া বৈশ্যোচিত ভূতি উপাধি ধারণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের দাস বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। পরন্তু এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। আমরা বুঝি যে, যে সমাজে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেই যথার্থ ঈশ্বর নির্ম্মিত সমাজ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করা স্বাভাবিক। আমরাও বুঝি যে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ঋণের পার নাই। ব্রাহ্মণগণই এ সমাজে সর্ব্বত্যাগী ও বৈরাগী হইয়া ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল জ্ঞান ও তপস্যায় রত থাকাতেই এ সমাজে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সকলের উদ্ভাবন হইয়াছে। আমাদের জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, সকলই সেই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ প্রসাদাৎ। ব্রাহ্মণ যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এ সমাজে পূজনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা আমাদের উপাধিতে দাস না লিখিয়া ভূতি লিখিলেই যে ব্রাহ্মণ মর্য্যাদার হানি হয়, তাহা নয়। বরং দাস না লিখিয়া আমরা যদি ভূতি লিখি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। আমরা ব্রাহ্মণাচার অনুকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মপথের অনুকূল সহায় হইয়া যদি বৈশ্যোচিত ভূতি নাম ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা যথার্থ ব্রাহ্মণ ভক্ত হইব, না যাঁহারা ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার হইতে বহুদূরে থাকিয়া ব্রহ্ম কার্য্যের কোন প্রকার আনুকূল্যে বঞ্চিত থাকিয়া দাস উপাধিধারী হইয়া জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের ভক্তি অধিক প্রকাশিত হইবে? লোকে হঠাৎ বিপরীত বা কুদিকই দেখে, তাই আমাদের এই বৈশ্যত্বের প্রসঙ্গে তাঁহারা আমাদিগকে সমাজদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া উপহাস করেন। আমরা যদি বিরুদ্ধবাদী হইতাম, অথবা সমাজদ্রোহী হইতাম, তাহা হইলে আমরা সমাজ

হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া ইহার দ্রোহকার্য্য সম্পাদন করিতাম—বৈশ্য নামেই বা এত গর্ব্ব প্রকাশ করিব কেন? যাঁহারা ধীরভাবে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই বর্ত্তমান ব্রহ্মণ্য সমাজ কিছুতেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে লইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ দিন দিন যে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া শূদ্র অপেক্ষাও অধম পদবীতে গমন করিতেছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। কেবল এই সমাজ বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বিভক্ত হইয়া শূদ্রপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ যে সমাজে বিদ্যমান নাই—যে সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, সেই সমাজের ব্রাহ্মণগণ একেবারেই শূদ্র পদবীতে স্খলিত হইবেই হইবে। আমরা, বৈশ্য ব্রতধারী হইতে প্রয়াস পাইলে সমাজে দ্রোহ হওয়া দূরে থাকুক, সমাজ আরও পুষ্টিলাভ করিবে? অতএব আমাদের এই বৈশ্যত্বের অবতারণা প্রসঙ্গে হঠাৎ কোন বিদ্রূপ বা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অথবা এই প্রসঙ্গকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া ধীরভাবে বিচার করিবেন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা যে বঙ্গীয় তাম্বুলীর বৈশ্যত্বের অবতারণা করিতেছি, ইহার নানা কারণ আছে। একেবারে পক্ষপাতী না হইয়া ধীরভাবে বিচার করিলে এই সকল কারণ সঙ্গত কি না তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ আমরা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিব, যে আমরা বৈশ্য। শাস্ত্রে আছে যে—

পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুপালন, দান, যজন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত সুদগ্রহণ অর্থাৎ তেজারতি মহাজনী এবং কৃষিকর্ম্ম এই সকল বৈশ্য-দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। উপরে যে বচন উদ্ধৃত হইল, উহা মনুর বচন। মনুর ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ গ্রন্থ আর ভারতবর্ষে নাই। অপরাপর শাস্ত্রেও বৈশ্যদিগের বৃত্তিবিধান এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।

বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মই কৃষি, গোরক্ষা, এবং বাণিজ্য প্রভৃতি। বিচার করিয়া দেখুন যে যে কর্ম্ম বৈশ্যত্বের নিদানীভূত সে সমুদয় কর্ম্ম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমাদের মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা, যজন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য এবং তেজারতী ও মহাজনী প্রভৃতি সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কর্ম্মই আমাদের স্বাভাবিক বা সহজ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সকল কর্ম্ম আমাদের সহজ বা সহজাত কর্ম্ম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ চৌর্য্য, দাসত্ব, পশুপক্ষী শীকার প্রভৃতি অপকর্ম্মে আপনাদিগকে নিয়োজিত না করিয়া মনের মাহাত্ম্য বশতই চিরকাল এই সকল সৎপথে থাকিয়া আর্য্যসমাজের হিতচিন্তা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন কালে কে তাঁহাদিগকে এই সকল সৎকর্ম্ম অবলম্বনে ঈঙ্গিত করিল? বিধাতা তাঁহাদিগের মনে কথঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের সঞ্চার না করিলে কি তাঁহারা আপনাপনি ঐ সকল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেন? সংসারে কতপ্রকার উপায়ে লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; অসৎ ও তমোগুণ প্রধান অলস ব্যক্তিগণ চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ, পশুশীকার, রজক, ভারবাহক, পরিচারক, লোকের কুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া মদ্যপ্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা কত অসৎ উপায়ে অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেন সেই আদিম কাল হইতে কষ্টসত্ত্বেও সৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি জীবনোপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, ভগবান্ যে বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।"

অর্থাৎ স্বাভাবিক মনের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বশতই লোকে আপনাপন বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে এবং এইরূপেই আমি তাহাদের কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিয়াছি। আজকাল সব বিষয়ে একাকার; সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ, এক্ষণে কর্ম্মবিষয়িণী লোকের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি কি, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার, মনের ইচ্ছা একরূপ থাকিলেও লোককে দায়ের গতিকে এমন কি তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু অতি পুরাকালে সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না— তখন এখনকার ন্যায় লোকবৃদ্ধি ও জীবিকার সংগ্রাম ছিল না; তখন সকলেই

প্রবৃত্তিমত স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে পারিত, সুতরাং তখনকার কালের বৃত্তি অবলম্বন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৃত্তিগ্রহণকারী সাত্ত্বিক গুণ প্রধান বা তামসিক গুণ প্রধান। অতএব আমাদের এই সকল বৃত্তি যে কথঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের পরিচায়ক, তাহাতে আর সংশয় নাই এবং এই সকল বৃত্তি যে আমাদের মধ্যে আজকাল অবলম্বনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। আবার শুদ্ধ যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাভাবিক প্রেরণায় আমাদের জন্য এই সকল বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে। এই সকল বৃত্তি দ্বারা কেবলমাত্র ধনোপার্জ্জনই যে তাঁহাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা নহে। জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দান, ইজ্যা ও অধ্যয়ন ছিল। নীচ জাতীয়গণের ন্যায় যে সে ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা আত্মোদর পোষণই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠেয় ছিল না। তাঁহারা সাধু ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি করিতেন। ইহাই তাঁহাদের দ্বিজত্বের ও সাত্ত্বিক গুণের পরিচায়ক ছিল। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহী দ্বিজের অবশ্য কর্ত্তব্য—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে তাহা ছিল এবং আমাদের মধ্যেও তাহা আছে। ন্যায়পথে কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র পরিবার পোষণ, ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দান, অতিথি সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা, হোম, পুরাণাদি কথকতা দেওয়া, পুষ্করিণী খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যও তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যায়পথে থাকিয়া কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার পোষণ, দশজনের হিতসাধন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দোল দুর্গোৎসবাদি দেবযজ্ঞ, আত্মীয় ও ব্রাহ্মণ সজ্জন ভোজনাদিতে নরযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃযজ্ঞ ও মন্ত্রাদি জপ ও চিন্তনে ঋষিযজ্ঞ যাঁহারা পুরুষ পরম্পরা ক্রমে আজীবন সমাধা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যদি বৈশ্য না হইবেন, তবে সমাজে আর বৈশ্য কে হইবে? ইহা অপেক্ষা বৈশ্যজীবন আর কোন্ উচ্চতর আদর্শে সংগঠিত হইতে পারে? প্রাচীন ও বর্ত্তমান তাম্বূলী সমাজের ক্রিয়া কর্ম্ম ও আচরণাদি দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তাম্বূলীজাতি বৈশ্য লক্ষণ বিশিষ্ট এবং পূর্ব্বে

বৈশ্যই ছিল। তবে যেখান হইতে বর্ণভেদের মর্য্যাদা শিথিল হইয়াছে, যখন হইতে সমাজের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে, যখন হইতে হিন্দুসমাজ পরাধীন হইয়াছে, তখন হইতেই ইহাদের মধ্যে বৈশ্যমর্য্যাদা ও বৈশ্যজনোচিত শিক্ষা তিরোহিত হইয়া ইহারা দিন দিন অধঃপতনোন্মুখ হইতেছে এবং যদি এখনও বৈশ্যপদবীতে উন্নত হইবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে আরও অধঃপাতিত হইবে।

মনু বলিয়াছেন, যথায় যথায় বর্ণসন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তথায় তথায় সেই সকল বর্ণের আচার ব্যবহার দর্শনে তাহাদের বর্ণ নির্ণয় করিবেক। এক্ষণে আমাদের সমাজে বর্ণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত। কারণ

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ
চতুর্থঃ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।"

শাস্ত্রের বচন এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্রজাতি, জাতি গণনায় পঞ্চম আর নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে বর্ণজিজ্ঞাসা এই যে, আমরা কোন্ জাতিমধ্যে পরিগণিত হইব? আমরা বৈশ্য কি শূদ্র জাতিতে পরিগণিত হইব? যদি বৈশ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত না হইলাম, তাহা হইলে অবশ্যই শূদ্র জাতি হইব? কিন্তু কথা এই, বর্ত্তমান সমাজে আমাদিগকে সৎশূদ্র বা জলাচরণীয় শূদ্র আখ্যা প্রদান করে। শূদ্রের মধ্যে যে সৎ ও অসৎ বিভাগ, ইহা মন্বাদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ঐরূপ বিভাগ বেদসঙ্গত নয়। উহা লৌকিক বিভাগ মাত্র। যখন আমাদের মধ্যে শূদ্র না বৈশ্য এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত, তখন বৈদিক বর্ণবিভাগ অনুসারেই আমাদের সন্দেহ উত্থাপিত এবং বৈদিক প্রণালীতেই সেই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে হইবে। এইরূপে বর্ণসন্দেহ উপস্থিত হইলে মনুর মত যাহা সম্পূর্ণ বেদানুযায়ী ও বেদমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদনুসারেই চলিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, বর্ণসন্দেহ স্থলে বর্ণগণের অনুষ্ঠিত আচার দৃষ্টেই তাহাদের বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। আমরা পুরুষ পরম্পরা ক্রমে সদাচারী ও বৈশ্যোচিত নিষ্ঠাবান্, সুতরাং আমরা বৈশ্য নয় কি? মনু বলিয়াছেন—

"বিত্তং বন্ধু র্বয়ঃকর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্য স্থানানি গরীয়ো যদ্‌যদুত্তরং ॥"

অর্থাৎ ধন, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা—এই পাঁচটী মান্যের স্থান। ইহার মধ্যে পর পরই অধিক মান্য। দাসত্বজীবী অপেক্ষা যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যজীবী তাহাদিগেরই অধিক ধনাগম সম্ভাবনা ও তাহাদিগেরই অধিক আচারবান্ হওয়া সম্ভব, সুতরাং ধন ও কর্ম্ম এই দুই বিষয়ে কৃষি ও বণিক্ সম্প্রদায় উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বলিয়া তাহারা সমাজে মাননীয় কেন না হইবে? মনুর এই মান্য স্থান গণনানুসারেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ মান, ক্ষত্রিয়ের তন্নিম্নে ও বৈশ্যের তন্নিম্নে এবং শূদ্র সর্ব্বনিম্নে প্রতিষ্ঠিত।

মনু আলোচনা করিলে বাঙ্গালী তাম্বূলী যে বৈশ্য, সে বিষয়ে বিস্তর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমন কি ঐ ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া আইসে। বৈশ্যের যে সকল কর্ম্মবিধি মনু লিখিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্মবিধি আমাদিগের মধ্যে আছে। মনু বলিয়াছেন, বৈশ্যবর্ণ উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দারপরিগ্রহানন্তর কৃষ্যাদি কার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। প্রজাপতি প্রথমতঃ পশু সকলকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের প্রতি-পালনের নিমিত্ত বৈশ্যকে অর্পণ করেন এবং প্রজা সৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে প্রজা সকল অর্পণ করেন। ইহাতে জানা গেল যে, পশুপালনাদি কার্য্য নীচ নয়, পশুপালকেরাও বৈশ্য। তার পর মনু বলিতে-ছেন যে, বৈশ্যবর্ণ মণি মুক্তা প্রবালাদি, লৌহ, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্যাদি ও উত্তম মধ্যম অধমাদি নির্ণয় করিবেন। বৈশ্য কোন্ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্য হয়, এ বিষয়ে বিজ্ঞ হইবেন এবং ইহা উষর ভূমি—এই ভূমি শস্যপ্রদ—এইরূপে ক্ষেত্রের গুণ দোষজ্ঞ হইবেন এবং প্রস্থ, দ্রোণ, আঢ়ক, পালি, প্রভৃতি পরিমাণ ও তুলামান সম্যক্ অবগত হইবেন। তিনি গোপাল মহিষাদি পালকরূপ ভৃত্যের দেশকাল ও কর্ম্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবেন এবং বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে বিবিধ দেশের ভাষা অবগত হইবেন—আর এই দ্রব্য এইরূপে স্থাপিত করিতে হয় এবং ইহা এই দ্রব্যে মিশ্রিত করিলে নষ্ট হয় না এবং এই দ্রব্য দেশ কাল বুঝিয়া

এত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। বৈশ্যবর্ণ টাকা ধর্ম্মত সুদে খাটাইবেন এবং হিরণ্যাদি দান অপেক্ষা সকলকে বিশেষ রূপে অন্নদান করিবেন।

পাঠক! উপরে মনু যে সকল কর্ম্মবিধি বৈশ্যের জন্য স্থির করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল কর্ম্ম পাঠে জানা যায় যে, কৃষক এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবি লোক সকলই বৈশ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহারা সকলেই ব্রতধারী ও সংস্কারার্হ।

শ্রাদ্ধে যাহাদিগের নিমন্ত্রণ করিতে নাই, যাহাদিগকে হব্যকব্যে আবাহন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়—সেই দ্বিজাতিগণের তালিকা দেখিলেও স্পষ্ট জানা যায় যে, যাহাদিগকে আমরা অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, অতি প্রাচীন কালে তাহারাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল। মনু এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"পরদারেষু জায়েতে দ্বৌসুতৌ কুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌজীবতিকুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥
তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাং॥"

অর্থাৎ পরস্ত্রীতে জাত যে কুণ্ড ও গোলক ইহাদিগকে হব্যকব্য প্রদান করিলে অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্বিজস্থলে নিমন্ত্রণ করিলে দাতার কর্ম্মনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, অতি প্রাচীন কালে কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি জারজেরাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল?

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥

অর্থাৎ সোমবিক্রয়কারী, তৈলজীবী. আগারদাহী প্রভৃতি দ্বিজকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। পাঠক! ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, তৈলজীবীরাও দ্বিজপদ বাচ্য?

হস্তি গোহশ্বোষ্ট্র দমকো শ্যেনজীবী তথৈবচ।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্য স্তথৈবচ॥

অর্থাৎ শ্যেন জীবী, হস্তি, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমক এবং পক্ষিপোষক দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

পাঠক! শ্যেনজীবী—পক্ষিপোষক, গো অশ্বের দমক—যখন দ্বিজপদ বাচ্য, তখন তাম্বুলী বৈশ্য নয় কিসে?

"গৃহসম্বেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এ বচ।"

অর্থাৎ যিনি জীবিকার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন, যিনি দৌত্য কর্ম্ম করেন, যিনি বৃক্ষরোপণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি শ্রাদ্ধীয় দ্বিজ হইতে পারেন না।

এইরূপে মনুর শ্রাদ্ধীয় দ্বিজ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি ইতর কর্ম্মকারীরাও তৎকালে দ্বিজ সংস্কারে বঞ্চিত ছিল না।

আপদ্‌কালের ধর্ম্মে মনু বলিয়াছেন—

উভাভ্যাং অপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্‌ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কৃষি গোরক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি ব্রাহ্মণ আপদ্‌কালে অবলম্বন করিবেন।

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, আপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও হিংসাবহুল ও পরাধীন কৃষিকার্য্য রূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। কেন না, যদিও কোন কোন পণ্ডিত কৃষিকার্য্যকে ভাল বলেন, তথাপি সাধুলোকেরা উহাতে অনেক জীব হত্যা হয় বলিয়া ঐ কার্য্য সাধু বিগর্হিত বলিয়া থাকেন।

"কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখং॥"

পাঠক! এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বারুই, সদ্‌গোপ প্রভৃতি যে সকল বৈশ্য জাতি কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তদপেক্ষা তাম্বুলী বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

আবার মনু আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বলিয়া ক্রয় বিক্রয়কারী সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যজীবী বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণং।
বিট্‌পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্‌॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি আত্মবৃত্তির অসম্ভবে ধর্ম্মের প্রতি সম্যক্‌ রূপে নিষ্ঠা না রাখিতে পারে, তবে বৈশ্যের বিক্রীতব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত অপরাপর দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

সর্ব্বান্‌ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃসহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ॥

বর্জ্জনীয় দ্রব্য সকল দর্শাইতেছেন—সকল প্রকার রস, সিদ্ধান্ন, তিল, প্রস্তর, লবণ, পশু, মনুষ্য এই সকল বিক্রয় করিবেন না। রসের মধ্যে লবণ গর্হিত হইলেও ইহার বিক্রয়ে দোষবাহুল্য প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অধিক হইবে। এজন্য লবণের পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা যায় যে, এই সকল বিক্রয়কারীরা বৈশ্য ছিল।

সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী॥

কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্র নির্ম্মিত সকল প্রকার বস্ত্র, শণ, অতসী, তন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম নির্ম্মিত কম্বলাদি এ সকল রক্তবর্ণ না হইলেও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং ফল মূল ও ঔষধি দ্রব্য সকলও বিক্রেয় নয়। তন্তুবায়, গাছগাছড়া বিক্রয়কারী বেনিয়া প্রভৃতি যে বৈশ্য, তাহা এতদ্দ্বারা জানা যায়।

অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চসর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ংকুশান্‌॥

আপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় হইলেও তথাপি ব্রাহ্মণ জল, শস্ত্র,

বিষ, মাংস, সোমলতারস, কর্পূরাদি সমুদয় গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, গুড়, দর্ভ, মধু ও মোম বিক্রয় করিবেন না।

কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য বিক্রয়কারী গন্ধবণিক, ক্ষীর দধি ঘৃত বিক্রয়কারী গোপ সকল যে বৈশ্য, এতদ্দ্বারা তাহা জানা যায়।

আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলিঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা॥

অরণ্যবাসী সিংহ প্রভৃতি পশু, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট পশু, শুক সারিকা প্রভৃতি পক্ষী, মদ্য, নীল, লাক্ষা, যাহাদের খুর জোড়া এমন অশ্বাদি পশু—এ সকল বিক্রয় করিবে না।

এ সকল বিক্রয়কারীরাও যে পুরাকালে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল—তাহা এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণীকৃত হয়।

কামমুৎপাদ্য কৃষ্যাস্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্॥

স্বয়ং কর্ষণ দ্বারা তিল উৎপন্ন করিয়া অন্য দ্রব্য না মিশাইয়া ধর্ম্মার্থ বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু তাহা উৎপত্ত্যনন্তরই বিক্রয় করিবে—লাভের জন্য অধিক দিন রাখিয়া বিক্রয় করিবে না।

ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ভোজন, অভ্যঙ্গ ও দান ব্যতিরেকে যদি অন্য নিমিত্ত তিল বিক্রয় করে, তবে ঐ দোষে পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরের বিষ্ঠায় মগ্ন থাকে।

তৈলিক যে বৈশ্য জাতি তাহা উপরোক্ত শ্লোকে প্রমাণীকৃত হয়।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রোভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ॥

ব্রাহ্মণ, মাংস লবণ ও লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্র পতিত হয় এবং ক্রমিক তিন দিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি॥

ব্রাহ্মণ, মাংসাদি ভিন্ন অন্য প্রতিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছা পূর্ব্বক সাত দিন বিক্রয় করিলে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

রসারসৈর্নির্মাতব্যা নত্বেব লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিল.ধান্যেন তৎসমাঃ॥

ঘৃতাদি রসের পরিবর্ত্তে গুড়াদি রস হইতে পারে, কিন্তু কখন লবণরসের পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে না। সিদ্ধান্নের পরিবর্ত্তে আমান্ন হইতে পারে, ধান্য দ্বারা তিল হইতে পারে, কিন্তু উহা সমান পরিমাণ জানিবে।

জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
নত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিং অভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥

বিপদাপন্ন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আপৎ কালোক্ত প্রকারে জীবিকা করিবে, কিন্তু কখন ব্রাহ্মণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

পাঠক! এই সকল শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, উপরোক্ত ব্যবসা-জীবীরা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য হইবে, কিন্তু কদাচ শূদ্র হইবে না। কেন না—

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥

যদি অধম জাতি লোভ বশম্বদ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে উহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজা শীঘ্রই স্বদেশ হইতে নিষ্কাশন করিবেন। নতুবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন হইবে। ব্রাহ্মণ রাজত্বকালে

বৃত্তিসাঙ্কর্য্য অর্থাৎ অধম জাতি উত্তম জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত না, কেন না বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা করাই রাজার প্রধান কার্য্য ছিল। মুসলমান রাজত্বেও বৃত্তি বিশৃঙ্খলা ততটা উপস্থিত হয় নাই। কেননা, মুসলমান রাজত্ব কালে আমাদের সামাজিক ব্যাপার হিন্দুদিগেরই হাতে ছিল, তখনও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি হিন্দুসমাজই করিত। পরন্তু এই ইংরাজ রাজ্যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে সকলেই স্বাধীন, তথাপি সচরাচর দেখা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ লোকই নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বরং স্বধর্ম্মোবিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

স্বকীয় কর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহাই করা উচিত, পরকীয় কর্ম্মকরণ অনুচিত। স্বকর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়া যদি পরকীয় কর্ম্ম করে, তবে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

পাঠক! শাস্ত্রের এইরূপ শাসন বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের বিঘ্নকারক।

বৈশ্যো জ্জীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যানি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥

বৈশ্য যখন স্ববৃত্তিতে জীবিকা করিতে অক্ষম হইবে, তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকার্য্য না করিয়া দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কিন্তু শক্তিমান্ হইলে শূদ্রকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে।

উপরের শ্লোক দ্বারা জানা গেল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ ততটা দুষ্য নয়, যতটা বৈশ্যের শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ দূষ্য। ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রিয় আপৎকালে বৈশ্যের বৃত্তিধারী হইলেও মদ্য প্রভৃতি বিক্রয়রূপ অকার্য্য করিবেন না—বৈশ্যও তদ্রূপ আপৎকালে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন বটে, কিন্তু শূদ্রের যে সকল অকার্য্য আছে, তাহা করিবেন না এবং শূদ্রবৃত্তি হইতেও যথাশক্তি নিবৃত্ত থাকিবেন।

উপরে দেখান গেল যে, বাণিজ্য ও কৃষিজীবিরা সাধারণতঃ বৈশ্য শ্রেণীতে পরিগণিত। তাম্বুল ব্যবসায়ীরা যে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না

এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। শাস্ত্রীয় বচন সকল দেখাইয়া আমরা এ বিষয়ের প্রমাণ করিব। ব্যাস বলিয়াছেন, অন্যের উক্তি ততক্ষণ পর্য্যন্ত শোভা পায়, যাবৎ মনু না দেখা দেন। তাৎপর্য্য এই যে, বেদ ব্যতীত মনুর উপর প্রামাণিক গ্রন্থ অপরাপর স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ বা তন্ত্রাদি হইতে পারে না। অতএব আমরা মনু প্রমাণই দেখাইব যে, মনু যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন, আমরা সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহি।

মনুর মতে পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তাহারা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য, না হয় শূদ্র হইবে। বিধাতা কল্পিত এই বিভাগকে অতিক্রম করিয়া অপর কোন মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। একারণ তিনি চীন, যবন প্রভৃতি জাতি সকলকেও বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্র পদবী প্রদান করিয়াছেন। মনু বলেন—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে নচ ॥
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রাবড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ঔড্র, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ—ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া লোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর এক স্থলে আছে,

মুখবাহূরূপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচং চ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে সকল জাতি ক্রিয়ালোপাদি দোষে বাহ্যজাতি ভাবাপন্ন হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষী বা আর্য্যভাষীই হউক, উহাদের সকলকেই দস্যুজাতি বলিয়া জানিবে।

মনুর মতে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত। বেদেতে ইহাদিগকে দাস বা দস্যুজাতি শব্দে নির্দ্দেশ আছে। পাঠক! রাক্ষস ও পিশাচেরাও মনুর মতে শূদ্র জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। মনু বলেন,—

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসীগতিঃ॥

অর্থ এই যে, হস্তী, অশ্ব, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও শূকর—ইহারা তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যমা গতি। পরন্তু—

রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ।

রাক্ষস ও পিশাচ সকল তমোগুণ নিমিত্ত উত্তমা গতি জানিবে। যেরূপ তমোগুণে শূদ্রের ও ম্লেচ্ছের জন্ম হয়, হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও ব্যাঘ্রেরও সেই তমোগুণে জন্ম। শূদ্রজীবন ঋষিচক্ষে এত অকিঞ্চিৎকর যে, শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অতি যৎসামান্য। এমন কি প্রায়শ্চিত্ত স্থলে লেখা আছে যে,—

মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেব বা।
শ্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যা ব্রতঞ্চরেৎ॥

অর্থাৎ মার্জ্জার, নকুল, চাষ, মণ্ডুক ও কাক প্রভৃতির হত্যাকারীকে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক।

অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যানস্থান্তু শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ॥

অর্থ এই যে, কৃকলাস প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট প্রাণীর সহস্র বধে এবং অস্থি বিহীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীর বধে শূদ্রবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। পৃথিবীতে যত অকর্ম্মকারী, পাপকর্ম্মপরায়ণ, তমোগুণ প্রধান জাতি দেখিতে পাও, মনুর মতে সকলেই শূদ্র। অতএব শূদ্র শব্দের প্রসর অত্যধিক। এক্ষণে ইহাদের কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করুন।

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি স্বষ্টোহসৌ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

শূদ্র ক্রীত হউক, আর অক্রীতই হউক, উহাকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। কেননা, বিধাতা ব্রাহ্মণের দাস্য কার্য্য করিবার জন্য উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন স্বামিনা নিস্বষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥

স্বামি কর্তৃক মুক্ত হইলেও যেমন শূদ্রত্ব জাতি মরণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না এমৎ উহার দাসত্বও স্বাভাবিক বলিয়া কদাচ নষ্ট হয় না।

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাস যোনয়ঃ॥

ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে দাস করা যায়, ভক্তদাস, ভাতের লোভে যে ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ আপনার দাসী পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দ্বারা যাহাকে কেনা হইয়াছে, দাত্রিম অর্থাৎ প্রতিগ্রহ-লব্ধ দাস, পৈত্রিক অর্থাৎ পিত্রাদি ক্রমাগত দাস, দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে—এই সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে উক্ত আছে। এই সাত প্রকার দাসই শূদ্র। পাঠক! আজকাল দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়াতে এই দাস শূদ্র একালে নাই। পুরাকালে যে ভারতবর্ষে অপরাপর দেশের ন্যায় দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, উপরোক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। এই দাসবর্গকে লক্ষ্য করিয়াই মনু শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিড়াল হত্যার সমান বলিয়াছেন। এই দাস শূদ্র সম্বন্ধেই মনুর অনুশাসন এই যে—

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্যতদ্ধনং॥

ভার্য্যা পুত্র ও দাস ইহারা অধন। অর্থাৎ ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিবে ঐ ধনে ইহাদের স্বামিত্ব না থাকিয়া উহাদিগের স্বামীর তাহাতে অধিকার।

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে বিস্রব্ধ ভাবে ধনগ্রহণ করিতে পারে। যে হেতু শূদ্রের স্বত্বাপদীভূত কিছুই নাই। উহার যাবতীয় ধন উহার ভর্ত্তৃগ্রাহ্য।

এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন এই যে—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

শূদ্র ধনার্জ্জনে সমর্থ হইলেও ধন সঞ্চয় করিবে না; কেননা শূদ্র ধনবান্ হইলে পাছে ব্রাহ্মণের পীড়া উপস্থিত হয়। এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে মনু বলেন যে,—

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

আশ্রিত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ভক্ষণার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন দিবেন এবং পরিধানার্থ জীর্ণবস্ত্র দিবেন এবং ধান্যের আকৃড়া ও পুরাণ শয্যাদি শয়নার্থে দিবেন।

এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে অন্য স্থলে লেখা আছে,—

একজাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ চ্ছেদ প্রাপ্নুয়াদ জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥

একজাতি যে শূদ্র, সে যদি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণকে পরুষ বাক্য দ্বারা আক্ষেপ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ রূপ দণ্ড হইবে, কেননা, সে জঘন্যপ্রভব।

নাম জাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেন কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোহয়োময়ং শঙ্কুর্জ্বলনাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

রে যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণাধম এবংপ্রকার নাম ধরিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে তাহার মুখে জ্বলন্ত লৌহময় শঙ্কু নিক্ষেপ করিবে।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥

তোমাদিগের এইরূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ততৈল নিক্ষেপ করিবেন।

যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যা চ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥

শূদ্র কর চরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে মারে, রাজা উহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন—ইহা মনুর আজ্ঞা।

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥

ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে যদি শূদ্র উপবেন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্তশলাকা অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবেন। অথবা উহার পাছা কাটিয়া দিবেন।

রাজার প্রতিও মনুর আদেশ এই যে,—

বাণিজ্যং কারয়েৎ বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশুনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥

অর্থাৎ বৈশ্য জাতিকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি কার্য্যে এবং কৃষি

গোরক্ষাদি কার্য্যে রাজা নিযুক্ত রাখিবেন এবং শূদ্রকে দ্বিজাতিগণের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন।

পাঠক! উপরে যে শূদ্রের বিবরণ দেওয়া গেল, তদ্দৃষ্টে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, ক্রীতদাস শূদ্র প্রভৃতি আর এদেশে নাই—সে সময়ের শূদ্র এক্ষণে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শূদ্র অসংখ্য প্রকারের আছে। কিন্তু কথা এই যে, সমাজে কি সকল শূদ্রেরই সমান মান্য হইবে? না যে শূদ্রের যত অর্থ, তাহার মান্য তত অধিক হইবে? কোন্ বিবেচনা প্রেরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রের মধ্যে ভাল মন্দ বা সদসৎ নির্ব্বাচন করিয়াছেন? অপরাপর সমাজের ন্যায় অর্থ গণনায় যে আমাদের সমাজে উচ্চ নীচ গণনা, তাহা নহে; পরন্তু জ্ঞানধর্ম্ম ও আচারের তারতম্যানুসারেই আমাদের সমাজের উচ্চ নীচ গণনা। শূদ্র-গণের মধ্যেও যাহারা সদাচার পরায়ণ, তাহারা উচ্চ এবং যাহারা অসদাচার পরায়ণ, তাহারা নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অপর এক স্থানে আছে যে,—

"উচ্ছিষ্টং অন্নং দাতব্যং।"

অর্থাৎ শূদ্রদিগকে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে দিবে; আবার কোন স্থানে আছে—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টঞ্চ কদাচন।
ন চা স্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥"

শূদ্রকে মতি অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি দিবেক না; উচ্ছিষ্ট দিবেক না; কোন ধর্ম্মোপদেশ করিবে না; অথবা কোন ব্রত আদেশ করিবে না। মনুতে কোন স্থানে আছে যে,—

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মোঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥"

শূদ্র যদি লশুনাদি ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহার পাপ নাই—শূদ্র

উপনয়নাদি কোন সংস্কারের যোগ্য নয়। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহার অধিকারও নাই—অথবা ধর্ম্মকার্য্যে ইহার নিষেধও নাই।

"ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাংবৃত্তিং অনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥"

ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্র যদি ধর্ম্মকামনায় ব্রাহ্মণাদির ন্যায় আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ কেবলমাত্র নমস্কার মন্ত্র দ্বারা সম্পাদন করিবে—ইহাতে সাধুসমাজে সে প্রশংসনীয় হইবে। আবার এরূপও লেখা আছে যে,—

"যথা যথা হি সদ্বৃত্তং আতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অর্থ এই যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদির প্রতি অসূয়া প্রেরিত না হইয়া পরন্তু ধর্ম্ম কামনায় যদি ব্রাহ্মণাদির আচার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে লোক নিন্দিত না হইয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করে।

এইরূপে শূদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রকার ভাব দেখিলে প্রতীত হয় যে, শাস্ত্রকারগন সকল শূদ্রের প্রতিই যে একরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সৎ ও অসৎ আছে। পরবর্ত্তী পুরাণাদি অপরাপর গ্রন্থেও সৎশূদ্র ও শূদ্র—এই দুই বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে।

শূদ্রের প্রধান ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ সেবা। যে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ সেবা পরায়ণ, তাঁহারা আর্য্য সমাজে উন্নত ও অপরাপর শূদ্রগণ ঘৃণিত হইয়াছে। মনু যে স্থলে বলিয়াছেন, দাসেরা অধন—অর্থাৎ ইহাদের ধন উঁহাদের ভর্তৃগ্রাহ্য, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, দাস শূদ্র হইলেও সে সৎশূদ্র নয়। কেননা, অপরত্র আছে—

"শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যু র্যদি পুত্রশতংভবেৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্র সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে। যদি এই সবর্ণা পত্নীতে তাহার একশত সন্তানও হয়, তথাপি তাহারা সমান অংশ পাইবে। কিন্তু—

"দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য স্বতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥

দাসীতে বা দাসপত্নীতে শূদ্র দ্বারা উৎপন্ন সন্তান শূদ্র পিতার অনুজ্ঞা ক্রমে উহার ঔরস পুত্রের তুল্য ভাগী হইবেক—ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় যে, দাস বা অনার্য্য শূদ্র পৃথক্। আর প্রকৃত বা আর্য্য শূদ্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আর্য্য শূদ্র একটী স্বতন্ত্র না থাকিলে কি প্রকারে শূদ্রের সবর্ণা বিবাহ সম্ভবে? আমরা যাহাকে সৎশূদ্র কহি, মনুতে সে শ্রেণীর কোন আভাস পাওয়া যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে ক্রিয়াহীন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও প্রকৃত শূদ্র এই ত্রিবিধ বর্ণের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই আর্য্য শূদ্রের ধর্ম্ম নিরূপণ স্থলে মনু বলিয়াছেন,—

স্বর্গার্থং উভয়ার্থং বা বিপ্রনারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥

অর্থ এই যে, শূদ্র স্বর্গ কামনা করিয়া অথবা স্বর্গ ও জীবনবৃত্তি এই উভয় কামী হইয়া ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে। কেননা ব্রাহ্মণ সেবাতেই ইহার জন্ম সাফল্য, অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্তিতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলং॥

অর্থাৎ, বিপ্র সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে আছে। এতদ্ভিন্ন আর সকল কর্ম্ম শূদ্রের পক্ষে নিষ্ফল অর্থাৎ অপরাপর কর্ম্মে শূদ্রের জীবিকা চলিতে পারে, কিন্তু সে সকল কর্ম্ম শূদ্রের পক্ষে পরকালে ফলদায়ক হয় না।

একারণ আপদ্ধর্ম্মে মনু লিখিয়াছেন,—

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুক কর্ম্মভিঃ॥

শূদ্র যদি স্ববৃত্তিতে অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পুত্রদারাদির ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম হয়, তবে সূপকারাদি কারুকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

কারুকর ও শিল্পকরের মধ্যে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তাহাদের কার্য্যের ব্রাহ্মণানুকূলতা দেখিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, আপদ্‌কালে আর্য্য শূদ্রকে যথায় মনু কারুকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তথায় আবার ইহাও বলিয়াছেন যে,—

যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শূশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুক কর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥

অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতিদিগের পরিচর্য্যা হয়, এমন কারুকর্ম্ম ও শিল্প প্রভৃতি উপায় শূদ্রগণ আপদ্‌কালে অবলম্বন করিবেন।

প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্ যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥

অর্থ এই যে ব্রাহ্মণ, পরিচারক শূদ্রের পরিচর্য্যা সামর্থ্য এবং দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া তাহার জীবিকা বা বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন।

পাঠক! এই যে শূদ্রের কথা দেখিতেছেন, ইহারা অনার্য্য দাস শূদ্র নহে।

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানোহি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালঃ প্রেত্যজায়তে॥

যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ কখন শূদ্রের নিকট হইতে ধন ভিক্ষা করিবেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবেক।

যে শূদ্রাদধিগম্যার্থং অগ্নিহোত্রমুপাসতে!
ঋত্বিজস্তেহি শূদ্রাণাং ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ॥

যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করিয়া শূদ্র হইতে ধন গ্রহণ করিয়া অগ্নি হোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শূদ্রযাজী বলা যায়। সে অতিশয় নিন্দিত।

পাঠক! শূদ্র শব্দে এখানে অনার্য্য শূদ্র বুঝিতে হইবেক। যথায় মনু "শূদ্র শিষ্যো" ব্রাহ্মণ অথবা "দেবলো গ্রামযাজক" ব্রাহ্মণ পতিত বলিয়াছেন, তথায় আর্য্যশূদ্র লক্ষ্য করা হয় নাই। মনুর অন্নবিচার স্থলেও এইরূপ দুই প্রকার শূদ্রের উল্লেখ আছে। যাহারা যাজ্য, তাহাদের অন্নও গৃহীতব্য। পাঠকগণের বিদিতার্থ মনু কাহার অন্ন খাইতে বলিয়াছেন তাহা লেখা যাইতেছে।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

অর্থ এই যে যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে, যাহারা পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যাহারা গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌর কর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ন ভোজন করা যায় এবং আমি তোমার সেবা করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিব বলিয়া যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

পাঠক! যাহারা ভোজ্যান্ন তাহারাই যাজ্য ও তাহারাই আর্য্য।

বৈশ্য ও শূদ্র উভয়েরই ধর্ম্ম কর্ম্ম উপরে আলোচনা করা গেল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সেই বৈশ্য এখন কোথায়? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলাও যাহা—আর্য্যসমাজ বৈশ্যপ্রধান সমাজ বলাও তাহা। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৃত্তিতেই এদেশের জনসাধারণ সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে। সমগ্র সমাজই এই বৈশ্যগণের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করে। যেমন গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি অবস্থান করিতেছে, গৃহস্থই যেমন অপরাপর আশ্রমের জীবন স্বরূপ, এই বৈশ্য বর্ণও তদ্রূপ অপরাপর বর্ণের ভিত্তি স্বরূপ। শূদ্রের নিকট হইতে জীবিকা সংগ্রহ করা অথবা শূদ্রের যাজন বা অধ্যাপনা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ—শূদ্রের নিকট হইতে কর গ্রহণ করাও ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একমাত্র বৈশ্যকে সহায় করিয়াই

আর্য্যসমাজে অবস্থিতি করিতেছেন। বৈশ্যই সমাজের ধনরক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ। ধনাভাবে কি রাজা, কি ব্রাহ্মণ কাহারও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সুতরাং বৈশ্যই আর্য্যসমাজের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। বৈশ্য ব্যতীত বেদ ব্রহ্মণ্য কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু কথা এই, এক্ষণে তো সকলেই যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকলেই কি বৈশ্য হইবে? আজকাল যাহার দুপয়সা বেশী আছে, সেই কারুকর বা শিল্প বৃত্তিতে বা সেবা বৃত্তিতে জীবনযাপন না করিয়া বাণিজ্য প্রভৃতিতে অধিক ধনাগমের সম্ভাবনা দেখিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই বৈশ্য হইবে? কথনই না। কেননা, অর্থস্বচ্ছল হেতু যে আজ বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইয়াছে, সে অর্থের অস্বচ্ছল প্রযুক্ত হয়ত আবার সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে, এক পুরুষে হয় ত সে ব্যবসায়ী রহিল, দ্বিতীয় পুরুষে হয় ত সে সেবাকারী ভৃত্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। সুতরাং তাহার বর্ণগত পৃথক্ অস্তিত্ব যাহা আবহমান কাল তাহার জন্ম ও কর্ম্মের পরিচায়ক হইবে, তাহা তাহার কোথায় রহিল? আবার আজ হয় ত সে গাছগাছড়া বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিল, কাল হয় ত সে জুতা বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে—ব্যবসাদার হইলেই যে সে বৈশ্য হইবে, তাহাই বা কিপ্রকারে স্থির করিতে পারা যায়? সকল প্রকার ব্যবসায় বা সকল প্রকার কর্ম্মই বৈশ্যত্বের পরিচায়ক নহে। তাহা হইলে শৌণ্ডিক, কলু, প্রভৃতিও বৈশ্য হইত। এক রকম ব্যবসায়ে, একপ্রকার আচারে যাহারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেই সম্ভবমত বৈশ্য বলিতে পারা যায়। আবার সকল বৈশ্যই যে সকল বৈশ্যের অন্নগ্রহণ বা কন্যাগ্রহণ করিবে তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে যাহারা রঙ্ বিক্রয়ী, তাহারা হয়তো লাক্ষা বিক্রয়ীর অন্নগ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না, আবার যাহারা পান বিক্রয়ী, তাহারা হয়তো ঘৃত বিক্রয়ীকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার সহিত কন্যার আদান প্রদান করিবে না। পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় অনুসারে আবার এক বর্ণের মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে। নীল, লবণ, তিল, ঘৃত প্রভৃতি এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহার বিক্রয়ে বা যাহাতে ব্যবসা করা ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। সংসারে সকল

দ্রব্যেরই প্রয়োজন, লবণ বা তৈল না হইলে একদিনও আমাদের আহার চলে না। এসকল জানিয়া শুনিয়াও আমাদের শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল বিক্রয় পাপের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে? সুতরাং ব্যবসা বা কর্ম্ম দেখিয়াই এক্ষণে বর্ণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন ভারত পরাধান অবস্থায় পতিত হইয়াছে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা আর এক্ষণে বর্ণ বা আশ্রমের রক্ষিতা নন—ব্রাহ্মণ যখন বৃত্তির নিয়োগ কর্ত্তা নহে, তখন একালে ব্যবসা দেখিয়া বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র। তবে আমরা যতদূর পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পর্ণবিক্রয় যে আমাদের আবহমান কাল ব্যবসা, তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং বঙ্গীয় তাম্বুলী বৈশ্য নয় কিসে? সুতরাং কর্ম্ম বা বৃত্তি দেখিলে আমরা বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। আবার দেখ, কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ব্যবসা যখন বৈশ্যের কার্য্য, তখন সংসারে বৈশ্যই অধিক। কয়জন লোক যুদ্ধকার্য্য বা লোকের সেবা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত আছে? সুতরাং এদেশের এই সকল বৈশ্য গেল কোথায়? বঙ্গের ভিতর উপবীত ধারী একজনও কৃষক বা ব্যবসায়ী তো দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? বঙ্গের সমুদয় কৃষক বা ব্যবসাদারগণ কি শূদ্র হইয়া কৃষি বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছে, না উহারা পূর্ব্বে বৈশ্য ছিল এক্ষণে ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে? ব্রাহ্মণবংশ ও শূদ্রবংশ ঠিক্ রহিল, আর বৈশ্যবর্ণ যে একেবারে মরিয়া গেল, এমন কোন রোগ বৈশ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, একথা তো হইতে পারে না? কেননা প্রকৃতির নিয়ম সকলেরই উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। বৈশ্যগণ যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বৈশ্যবর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, একথাতো কখনই হইতে পারে না। তবে সম্ভব তাহারা স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া অনাচারী হওয়ায় শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে। কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে যাহারা দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকে, স্বদেশ হইতে প্রবাসে থাকিয়া যাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়, কর্ম্মের গতিকে তাহারা আচার ব্যবহার ঠিক্ রাখিতে পারে না। দারিদ্র্য দুঃখে মুহ্যমান হওয়াতে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে বেদজ্ঞান লোপ পায়। অধিকাংশ বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এই কারণে সংঘটিত হইয়াছে। একেত বৈশ্য ও শূদ্রের

মধ্যে পার্থক্য কম। বৈশ্যে যে দ্বিজত্ব সংস্কার, তাহা তাহার যৌবন কালে হইয়া থাকে। বাল্য কালে যাহার শিক্ষা ও সংস্কার না হইয়া যৌবন কালে হয়, তাহার শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাব অতি কম হয়। কেননা যৌবনের সহজসুলভ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে তাহার সংস্কার ও শিক্ষা কোন মতে কার্য্যকরী হয় না। তাহার উপর কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্য এরূপ দিবারাত্রি লোককে আকৃষ্ট করিয়া রাখে যে, সে স্বচ্ছন্দ হইয়া দু দণ্ড জ্ঞান বা ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে পারে না, উপনয়নের পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হয় ও সন্তানাদি উৎপাদন দ্বারা সে এত ব্যস্ত থাকে যে, তাহার প্রতি তখন ধর্ম্মের উপদেশ বৃথা হইয়া থাকে। বিশ বা চব্বিশ বৎসর যাহার বয়স, সে সংসারে এত আবদ্ধ হইয়াছে যে, তখন আর তাহার গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে না। বিশেষতঃ সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে এত প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, লোকে ধন পিপাসায় তাহার ব্যবসা ধর্ম্মসঙ্গত কিনা দেখিতে চায় না। সুতরাং বৈশ্যত্ব হইতে পতিত হইবার অনেক কারণ বিদ্যমান। একারণ পতিত বৈশ্যদিগকে আমাদের বঙ্গদেশে সৎশূদ্র এই আখ্যা প্রদত্ত হয়। যাহারা স্বয়ং ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রহ্মণ্যের উদ্দীপন করিতে অক্ষম—যাহারা নিজে অবসরাভাবে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে সাধু ব্রাহ্মণের সেবা দ্বারা ব্রাহ্মণের সহায়কারী হওয়াই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়া শাস্ত্রকারগণ উঁহাদিগকে সৎশূদ্র পদে অবিষ্ঠিত করিয়া উঁহাদিগকে যাজ্য বলিয়া গিয়াছেন।

যাহারা শূদ্রদিগকে ধর্ম্ম চর্চ্চার অধিকারী করেন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন, তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন বৈশ্যদিগকে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের অধিকারী করাতে কার্য্য ও অবস্থা গতিকে তাহারাই স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই।

শূদ্রের আপদ্‌কালে অর্থাৎ দাস্যবৃত্তি দ্বারা ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ না হইলে বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি প্রভৃতি অবলম্বন করিবার বিধান আছে। ইহাতে বৈশ্য শূদ্রের প্রভেদ নির্ণয় করা স্থলবিশেষে কঠিন হইয়া পড়ে। বৈশ্যের মধ্যেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন। ইহাতে বৈশ্য নির্ণয়ের সমস্যা অধিকতর জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে মনুর একটি সহজ

সঙ্কেত প্রবন্ধের প্রথম অংশে প্রদর্শন করিয়াছি। যেথানে বর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় আচার ব্যবহার দৃষ্টে বা গুণকর্ম্ম দেখিয়া বর্ণ জিজ্ঞাসার সদুত্তর, প্রদত্ত হইতে পারে। তবে বহুকাল পোষিত বিশ্বাস হঠাৎ কেহ ত্যাগ করিতে চাহে না। মনু হইতে বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা গৃহীত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন তাম্বুলী জাতিতে শূদ্রের লক্ষণ কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই। যে গুণ থাকিলে বৈশ্য বলিতে পারা যায়, তাম্বুলীতে তাহা সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে।



সম্পূর্ণ

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্য।

পরিশিষ্ট।

তাম্বূল।

খৃষ্টীয় শকের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গৃহ্য সূত্রে তাম্বূলবল্লীর প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় পূর্ব্ব দুইশত অব্দে সুশ্রুতে তাম্বূলপত্রের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের সময় তাম্বূল সহযোগে দ্রব্যবিশেষ দ্বারা দন্ত আরক্ত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়।

মুঞ্জকাশ তাম্বল্যো রসনাঃ।

গোভিল গৃহ্যসূত্র ২।১০।১০।

এষাং রসনাঃ কটিবন্ধ রজ্জবঃ মুঞ্জকাশ তাম্বল্যঃ কর্ত্তব্যাঃ। উপনয়ন কালে— ইহাদের রসনা অর্থাৎ কটিবন্ধনী মৌঞ্জী, কাশী ও তাম্বলী হইবে।

তাম্বুল পত্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং কটূ পিত্ত প্রকোপনং।
সুগন্ধি বিষদং তিক্তং স্বর্য্যং বাত কফাপহং॥
শ্রমণং কটূকং পাকে কষায় বহ্নিদীপনং।
বক্ত্রকণ্ডু মল ক্লেদ দৌর্গন্ধ্যাদি বিশোধনং॥

সুশ্রুত। সূত্রস্থান। ৪৬ অধ্যায় শাকবর্গ।

তাম্বুলপত্র তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু ও পিত্ত প্রকোপকর, সুগন্ধি, বিশদ, তিক্ত, স্বরের হিতকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক, কষায়, অগ্নিকর এবং বক্ত্র কণ্ডু (মুখে যে চুলকনা হয়) মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

সুশ্রুত শাকবর্গ। ২৪৫ পৃষ্ঠা।

তাম্বূলাক্তং দশনমসকৃদ্দর্শয়ন্তীহ চেটী।

রঘুঃ।

চেটী তাম্বূলাক্ত দন্ত এখানে বার বার দেখাইতেছে।

অমরকোষে পানলতার নাম তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী ও নাগবল্লী লিখিত আছে। গোভিলের লিখিত তাম্বলী শব্দে বা অমরসিংহের তাম্বূলীশব্দে কোন্‌টিতে উ কারের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের বর্ণবিন্যাসে ব্যতিক্রম অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেণ্টপিটার্শবর্গ অভিধান ও বিশ্বকোষে তাম্বলী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমবশতঃ উক্ত শব্দের প্রয়োগ গোপথ ব্রাহ্মণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাতি ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় তাম্বূলকে পান কহে। আরব ও পারস্যে পানের নাম তাম্বল। দ্রাবিড়, কর্ণাট. সিংহল ও মলয়দ্বীপে পানকে বেত্তিলাই বা তদনুরূপ শব্দে অভিহিত করে। ইহাতে স্থির হইতেছে, আরব ও পারস্যদেশে ভারতবর্ষ হইতে তাম্বূল গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণাপথে মলয়দ্বীপ হইতে তাম্বূল আনীত হয়। ইংরাজী, বিটল্ শব্দ মলয়দ্বীপের বেত্তিলা হইতে উদ্ভূত বলিতে পারা যায়। যবদ্বীপ বা মলয় হইতে সমুদয় ভারতবর্ষে তাম্বূল আনীত হইয়াছে, ইহা বলা অন্যায়। কেবল দক্ষিণদেশে পানকে মলয় হইতে আনীত কহিলে শব্দশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। হিন্দুস্থান, বাঙ্গালা, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের পান পর্ণশব্দের অপভ্রংশ; অতএব এই সকল দেশে কদাচ মলয় হইতে পান আনীত হয় নাই। আসামে পান স্বভাবতঃ জন্মে, সেই স্থান হইতে বেহার প্রভৃতিতে অবশ্য আসিয়াছে। অনেক তন্ত্র আসামে লিখিত। মৎস্যসূক্তের ষড়বিংশতি পটলে লিখিত আছে যে, যে সে বৃক্ষে তাম্বূলবল্লী উঠিলে গ্রহণীয় নহে।

অথবাস্তু গুবাকঞ্চ কৃত্বাপর্ণ সমন্বিতং।
শঙ্খ শম্বুক চূর্ণেন বিলিপ্তেন নিবেদয়েৎ॥
কর্পূর বাসিতং দেবি মৃগদর্প সমন্বিতং।
ধন্যাকমধুরীকাদ্যৈঃ সাধিতন্তু নিবেদয়েৎ॥
এলাচম্পাক মুণ্ডাদ্যৈ মুখবাস প্রশস্যতে।
কপর্দ্দকস্য বৃক্ষস্য পলাশস্যচ শঙ্করি॥
তচ্চূর্ণং বর্জ্জয়েদ্দেবি বৃক্ষপর্ণং ন দাপয়েৎ।
কলিবৃক্ষস্থিতং পর্ণং পনসস্থং ন দাপয়েৎ॥
অশোক শাল্মলীস্থং বা সদৈব পরিবর্জ্জয়েৎ।

আগ্রে নিম্ব গতশ্চৈব শস্তং পর্ণং মম প্রিয়ে ॥

নিম্নে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে তাম্বূল সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবহারিক ও বিশ্বাস্য তাবৎ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, এইরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

খদির কফ পিত্তঘ্নশ্চূর্ণ বাত বলাসনুৎ।
সংযোগত স্ত্রিদোষঘ্নং সৌমনস্যং করোতি চ ॥
মুখবৈশদ্য সৌগন্ধ কান্তি সৌষ্ঠব কারকং।
প্রভাতে পূগমধিকং মধ্যাহ্নে খদিরং তথা ॥
নিশাসু চূর্ণমধিকং তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ সদা।
আয়ুরগ্রে যশোমূলে লক্ষ্মীমধ্যে ব্যবস্থিতা ॥
তস্মাদগ্রং তথামূলং মধ্যং পর্ণস্য বর্জ্জয়েৎ।
পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধি পর্ণাগ্রে পাপ সম্ভবঃ ॥
জীর্ণপর্ণং হরত্যায়ু শিরাবুদ্ধি বিনাশিনী।
আদ্যাং বিষোপমং পীতং দ্বিতীয়ং ভেদী দুর্জ্জরং ॥
তৃতীয়া দনুপাতব্যং সুধাতুল্য রসায়নম্ ॥
তাম্বূলং নাতি সেবেত ন বিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ।
দেহদৃক্ কেশ দন্তাগ্নি শ্রোত্রবর্ণ বলক্ষয়ঃ ॥
শোষ পিত্তানিলাশ্রম স্যাদতি তাম্বুল চর্ব্বণাৎ।
বিষমূর্চ্ছা মদার্ত্তানাং ক্ষয়িনাং রক্তপিত্তিনাং ॥

তাম্বূলের প্রয়োগ সম্বন্ধে সপ্তগ্রামী তাম্বূলীবংশীয় ডাক্তার অম্বিকাচরণ রক্ষিত কৃত ভারতভৈষজ্যতত্ত্বে লিখিত আছে, যথা ;—

পান—পাইপিরেসী জাতীয় পাইপর বিটল নামক লতার পত্র। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় ইহা জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িকপ্রয়োগ। লালাগ্রন্থির উত্তেজক ও পাচক। ইহার পত্রের রস দেশীয় কবিরাজেরা বিবিধ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবন করিলে স্কর্ভি বা শীতাদ রোগ জন্মিতে পারে না। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুচ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, বল্য, রক্তপিত্তকর, লঘু এবং শ্লেষ্মঘ্ন,

আস্য দৌর্গন্ধ, বাত ও শ্রমাপহ। রাত্র্যন্ধ রোগে ইহার রস ২।৪ ফোঁটা সন্ধ্যাকালে চক্ষের ভিতর ঢালিয়া দিবে, ক্ষণকাল পরেই পরিষ্কার শীতল জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে। এইরূপ দুই তিন দিন করিলেই প্রায় রাত্র্যন্ধ রোগ আরোগ্য হয়। আমরা ২।৩টি রোগীকে এই উপায়াবলম্বনে আরোগ্য করিয়াছি। সর্দ্দি ও কাশি প্রভৃতিতে পানে তৈল মাখাইয়া ও উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যকৃতের রক্তাধিক্য রোগেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার দর্শে। পানের পাতা গরম করিয়া স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধস্রাব হ্রসিত হয়। পান ক্ষতের উপর লাগাইয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা সুস্থ হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। পান জলে ভিজাইয়া শঙ্খদেশে লাগাইয়া রাখিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয়। পানের বোঁটার অগ্রভাগে একটু কলি-চুণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ ও আঁচিলের উপরে ঘর্ষণ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অর্ব্বুদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া ও উহা ঈষৎ গরম করিয়া শিশুদের মলদ্বারে অল্পক্ষণ দিয়া রাখিলে দাস্ত হয়।

গন্ধদ্রব্যসংযুক্ত মুখরঞ্জক তাম্বূলের ব্যবহার বিলাসীদিগের মধ্যে প্রথমে প্রচলিত হইয়া জনসাধারণের অবশ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হইল। তখন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে মাদক দ্রব্যের শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন ও যতি এবং বিধবার পক্ষে তৎ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিলেন।

তাম্বূলং তাম্রকুটঞ্চ তুরিতা তারিতা তথা।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং সম্বিদাসব এব চ॥
এতদাসব সংজ্ঞকমুক্তঞ্চ মুনিভিঃ পুরা॥

তিথিতত্ত্ব।

তাম্বূলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাং।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ধ্রুবং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জনসমাজে তাম্বূলের ব্যবহার অতি বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। এরূপ স্থলে তাহা পণ্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইবে বিচিত্র নহে। যাহারা পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা একটি পৃথক জাতির সৃষ্টি হইয়া গেল।

তাম্বূলী।

৪০০ চারিশত খৃষ্টাব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে। তৎকালে তাম্বূলী জাতি উৎপন্ন হয় নাই। ৫০০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য মতের পুনরুত্থান হইলে পর তাম্বূল ব্যবসায়ীরা পশ্চিম ভারতে একটি নূতন জাতিরূপে গণ্য হইয়াছে। এলফিনষ্টোন কৃত ভারত ইতিহাসে লিখিত আছে, কান্যকুব্জের অধঃপতনের পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান তথায় তাম্বূলের বহু সংখ্যক পণ্যবীথি দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাম্বূলীর উল্লেখ এই প্রথম দেখিলাম। তাম্বূলীর বংশ বৃদ্ধি সহকারে বঙ্গভূমিতে উত্তীর্ণ হইলে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের সময় তাহাদিগকে বাঙ্গালীরূপে পরিগণিত হইতে দেখা যায়। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পর বৈদেশিক আধিপত্যের সময় লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাম্বূলীর পরিচয় আছে।

১। গোপনাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বূলি পর্ণকারৌ চ তথা বণিক জাতয়ঃ।
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
২। বৈশ্যাৎ শূদ্রস্য কন্যায়াং তাম্বূলী চোপপদ্যতে।

(ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়)

১৫১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দ ভট্ট তাম্বূলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

গোপমালীচ তাম্বূলি কাংসার তন্ত্রি শাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রানাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥

(বল্লাল চরিত)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যৎকালে ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত শূদ্র হইয়া গিয়াছে, তাম্বূলি জাতি সেই সময় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত শ্রেণী বিশেষে উৎপন্ন। বাঙ্গালীর তাম্বুলী নাম হিন্দুস্থানীত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালী পানের খিলির ব্যবসায়ে কদাপি রত নহে। সুতরাং তাহারা আপন জাতির নাম পশ্চিম ভারতে বাসকালে পাইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বল্লাল চরিতে পতিত ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যের সহিত শূদ্র একত্রিত হইয়া সৎশূদ্র নামে বর্ণিত হইয়াছে। তাম্বূলীর, লৌকিক বৈশ্যত্ব নাই। শাস্ত্রীয় বৈশ্যত্ব আছে। পুত্রপিতার বৃত্তি ও মাতার আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে তাম্বূলীর উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহার বৃত্তিগত জাতি বৈশ্য দৃষ্ট হইতেছে ও আচার গত জাতি শূদ্র দেখা যাইতেছে, তাহার উৎপত্তি উপরোক্ত ভাবে লিখিত হওয়া নিতান্ত কবিত্বহীন হয় নাই। বস্তুতঃ উক্ত উৎপত্তি কথা কাল্পনিক। যাহাতে আমরা এখন উপরোক্ত কবিত্বের অপলাপ করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করা অতীব কর্ত্তব্য। বৈশ্য আচার গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বপুরুষের বৈশ্যত্বের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারিব না।

ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য লেখক শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল প্রণেতা বর্দ্ধমান নিবাসী মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন ১৭১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আপন কাব্যে তাম্বূলির আতিথেয়তা ও শৌর্য্য চমৎকার রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে বন্দি চলে ভকত বৎসলা।
সঙ্কট-নাশিনী শিবা সরবমঙ্গলা॥
গুরুগতি কজ্জলা রাখিয়া দুইজনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী—বদনে॥
বিশ্রাম বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরি পথে হেনকালে॥
হরিদাস তাম্বুলি সনে পথে হ'ল দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা॥
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুইজনে।
কতখান অনুমান তাম্বুলির মনে॥
অত্যন্ত দীর্ঘল নহে, নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব॥
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানব মূরতি হয়ে মহী মাঝে ফিরে॥
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥
মনে করে এমন অতিথি যদি পাই।
সেবায় বাড়াই পুণ্য পাতক এড়াই

বুঝি মোর আছে ভাগ্য নহে রাজপথে ।
কেন দেখা হবে মোর মহাজন সাথে ॥
অনুমানি বিনয়ে কহেন ধীরে ধীরে ।
এস মহাশয় আজি আমার মন্দিরে ॥
উপযুক্ত কাল, তায় বুঝি পুণ্যবান ।
ভাল ভায়া চল বলি করিল পয়াণ ॥
নিরঞ্জন চরণ স্মরণ ভাব্য চিত ।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত ॥
মিছা মায়া মধুলোভে জড়াইয়া জীব ।
জন্ম যায় জঞ্জালে না ভজে সদাশিব ॥
বদনে না বল রাম নাম সুধাময় ।
কুকর্ম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয় ॥
যমভয় মহাঘোর নরক যন্ত্রণা ।
তখনি ত্বরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা ॥
পার পাবে পাপের সংসার ঘোরসিন্ধু ।
বদনে গোবিন্দ গুণ গাও গাও বন্ধু ॥
নিজ বাসে আসি ভাযে জীবন সফল ।
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল ॥
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে ।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে ॥
পরিপাটি ভোজন করায়ে পাঁচ রসে ।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে ॥
কত জ্ঞানতত্ত্ব কথা তাহারে বুঝাই ।
অলস এড়ায়ে নিদ্রা যান দুটি ভাই ॥
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়া ।
উপনীত গোবিন্দ-তনয়-সুত-জায়া ॥
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদিত ।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত ॥
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ ।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥

হেনকালে ধর্ম্মপুত্র লাউসেন রাজা।
সরোবর সলিলে করিল স্নান পূজা॥
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে।
তাম্বুলি-তনয় তবে সবিনয়ে ভাষে॥
মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কোন দেশে ঘর॥
পুণ্যবতী পুণ্যবান কেবা পিতামাতা।
এত শুনি হ'ল রায় পরিচয় দাতা॥
ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ-অবনী।
পিতা মোর কর্ণসেন মাতা রঞ্জারাণী।
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কর্পূর।
ভূপতি সম্ভাষ হেতু যাব গৌড়পুর॥
পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু সুধায় চকোর॥
মোর জন্ম তপস্বিনী জননী জঠরে।
ধর্ম্মপূজি তনু যে ত্যজিল শাল ভরে॥
শুনিয়া প্রণতি করি কন কর যুড়ি।
পদরজ পরশে পবিত্র মোর বাড়ী॥
পুনরপি যখন এখানে হবে বাস।
তখনি জানিব মোর পূর্ণ অভিলাষ॥
ঘৃণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে।
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে॥
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীব লোচন।
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন॥
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা।
গুহক চণ্ডাল সঙ্গে পথে হলো মেলা॥
সরণি আগুলি ক[illegible] কহি যোড় হাত।
আজি আর আম[illegible]রে রঘুনাথ॥
পালিতে পিতার স[illegible] কালি যাব বন।
আশয় বুঝিয়া প্রভু নিল নিমন্ত্রণ॥

শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু সেবিত।
হেন রাম গুহক মন্দিরে উপস্থিত॥
ফল মূল খান প্রভু গুহক-আদরে।
জানকী উদ্ধারি প্রভু এলো তার ঘরে॥
আপনি সকল জান কি কব বিশেষ।
তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ॥
তুমি যে পুরুষ আর যার গর্ভে জন্ম॥
কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধর্ম্ম॥
এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল।
মৈত্রভাবে তামুলি-তনয়ে দিল কোল।
শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা।
যাতায়াতে এখানে আমার পাবে দেখা॥
এত বলি হরিদাসে করিল বিদায়॥
লঘুপতি ভূপতি ভেটিতে দোঁহে যায়॥

নবম সর্গঃ।

কোমর বান্ধিয়া শাকা নদী হ'ল পার।
ধর ধর ডাকে সিঙ্গা হাঁকে মার মার॥
রাজার লস্কর যত চমৎকার ভাবে।
কেহ ভাবে এবার পরাণ মেনে যাবে॥
কেহ বলে শাকা এল কেহ বলে শুকা।
কেহ বলে বীর কালু কাজ নাই লুকা॥
কেহ বলে লখে বা বেঁধেছে বীর বেশ।
মামুদা বলিছে মার কি তার বিশেষ॥
যে আনে উহার মাথা পাবে পুরস্কার।
তাম্বুলিতনয় চূড়া করিল জোহার॥
আজ্ঞা পেলে আমি আনি জানি তার বল
পান দিয়া বলে পাত্র পরম মঙ্গল॥
তবে চূড়া চলিল চঞ্চল চালি চাল।
কালুর নন্দনে দেখে জিলেক দাদাল॥

শাকা বলে সমরে সাজিলি বটে চূড়া।
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া॥
পলায়ে পরাণ লয়ে ফেলায়ে হেতার।
হাটে হাটে বেচ গিয়ে পানের পসার॥
চূড়া বলে বুড়াম কথায় কিবা ফল।
আপনি পলারে যদি পরাণে বিকল॥
বৃত্তি বটে পূর্ব্বাপর পানের বেপার।
সিঁদ চুরি ডাকাতি করিতে ক'স কার॥
তু রাঢ় চোয়াড়, তোকে সব কর্ম্মথাটে।
শাকা বলে তুমিত এখনি যাবে কেটে॥
গ্রামের সম্বন্ধে তোরে ভাই বলে কই।
অতেব ও সব কথা এতক্ষণ সই॥
জাতি রাঢ় আমিরে করম রাঢ় তুঁ।
চূড়া বলে চোরা বেটা চেপে ক'স মুঁ॥
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
সঙ্কট সমরে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ॥
রণে বড় দড় দড় দোঁহে করে দম্ফ।
মালক মুড়ায়ে মারে গোটাদশ লম্ফ॥
আগে হান্ হেতার হাঁকিছে শাকাবীর।
সামালিয়া সন্ধানি সংহারি তোর শির॥
বলিতে চোটাল চূড়া শাকা ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়ে চোট হানিছে হাঁকালে॥
চাল ঢালি চূড়াবীর মালকে এড়ায়।
এইরূপে দু বীরে অনেক যুদ্ধ যায়॥
শেল হাতে চূড়া শেষে ভাষে নিদারুণ।
সুধন্বা সম্মুখে যেন সম্বোধে অর্জ্জুন॥
এই শরে তোরে যদি না করি নিপাত।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥
তু যদি তরাস মনে রণে ভঙ্গ দিস।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস॥

শাকা বলে ঐ কিরা ফিরে তোরে লাগে।
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হতে ভাগে॥
শেলে মরি তবু যদি নাহি মারি তোরে।
সুধন্বা প্রতিজ্ঞা দারুণ দিবা মোরে॥
এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক পাতে।
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে হাতে॥
শেল চালি চলে চূড়া মুড়াইয়া ঢাল।
হান বলে হাঁকে ঘন শাকারে সামাল॥
কালমুখী বান গোটা মিশাল গরল।
ভ্রমণ করযে শূন্যে সন্ধানি প্রবল॥
ছাড়িতে ছুটিল শেল সাঁধাইল আঁতে।
চূড়া বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে॥
শেল ঘায়ে শাকাবীর দেখে চমৎকার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার॥
সিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি।
বসনে বান্ধিয়া বুক রণে হ'ল হারি॥
হাঁফালে হানিল হেঁকে তাম্বুলির শির।
শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর॥
অবশ হইল অঙ্গ অবনী মণ্ডলে।
পড়িতে পড়িতে সিঙ্গাদার কৈল কোলে॥
তা দেখিয়া মহাপাত্র হ'ল হরষিত।
শাকা বলে সিঙ্গাদার দেখি বিপরীত॥
কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই॥
শুন শুন সিঙ্গাদার সব শেষকালে।
পিতামাতা ভাই বন্ধু ডাকরে গোপালে॥
সাধু সাধু সিঙ্গাদার সম্বোধি শাকায়।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গায়॥
মায়ায় কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয়॥

দ্বাবিংশতি সর্গঃ

শ্রীযুক্ত এচ্ এচ্ রিজ্‌লি কৃত বঙ্গীয় জাতি বিষয়ক পুস্তক হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তাম্বূলী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার সংগ্রহে কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তদ্দৃষ্টে আমার সংশোধন প্রস্তাব রাজকীয় জাতিতত্ত্বনির্ণায়ক কার্য্যালয়ে প্রেরণ করি। রিজলি মহোদয়ের লিখিত তত্ত্ব বিশ্বকোষে অনুবাদিত হইয়াছে। অতএব মূল গ্রহণ না করিয়া বিশ্বকোষে লিখিত তাম্বূলী শব্দ উদ্ধৃত করা উপযুক্ত জ্ঞান করিলাম।

তাম্বূলিক (ত্রি) তাম্বূলং তদ্রচনং শিল্পমস্য তাম্বূল ঠন্। ১ তাম্বূল রচনাধিকৃত, তাম্বূল বিক্রেতা। ২ তামলী জাতি। তাম্বূলী (স্ত্রী) তাম্বূল গৌরাং ঙীষ্। ১ তাম্বূলবল্লী, পাণ গাছ। ২ সাধারণতঃ তাম্লী বা তাম্বূলী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে, ইহারা মূলতঃ তাম্বূল ব্যবসায়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। এই জাতিও বর্ণ সঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

বেহারের তাম্বূলিদিগের গোত্র ভেদ নাই। আবহমান কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। "ধিয়া নিয়া" সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধ্যে ও "দেয়াড়ি" সম্পর্ক ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ গোত্র ধরিয়া ইহাদের নানা বিভাগ আছে। কুল মানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে। সমান গোত্র ও সমান কুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিণ্ড বা সমানোদক হইলেও হয় না। স্ব গোত্রিয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রিয় হইলে বিবাহে বাধা নাই।

বাঙ্গালার তাম্বূলীরা পাঁচটি থাকে বিভক্ত। সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দ গ্রামী, বিয়াল্লিশ গ্রামী ও বর্দ্ধমানী। সপ্ত গ্রামীরা বলে, তাহারা উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দশত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহাদের কোন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায়, ইহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশ গ্রামীরাও আপনাদের আদি ইতিহাস ঐরূপই বর্ণনা করে। ইহারা বাঙ্গালায় সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সম্মান নাই। বিয়াল্লিশ গ্রামী থাকের যষ্ঠীবর সিংহ বর্দ্ধমানী

থাকের শ্রীমন্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায়, পিতা কর্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হঁন এবং শ্বশুরের সহিত হুগলি জেলায় বৈঁচিতে আসিয়া বাস করেন। ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্ত্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে নিকটবর্ত্তী চৌদ্দখানি গ্রামের তাম্বুলীদিগকে স্বশ্রেণীতে আনিয়া এই থাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও কতক পাওয়া যায়। বৈঁচিতে এক দেব মন্দিরে একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠীবরের পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্ত্তন আরও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বর্দ্ধমানী থাক চোদ্দগ্রামীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে ও বর্দ্ধমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্ট গ্রামীরা বলে যে, পূর্ব্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তর ভারত হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্যই তাহারা মানে অন্য থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী থাকে কাশ্যপ, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও ব্যাস গোত্র আছে।

বিহারী তামলীদিগের মধ্যে আদি বাসস্থানভেদে প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণী আছে—মগহিয়া, ত্রিহুতিয়া, কনৌজিয়া, ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ ও সূর্য্যদ্বিজ।

বাঙ্গালায় তামলীদিগের চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পান্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, খিলিওয়ালা, নাগবংশী ও পৈটী উপাধি আছে।

বিবাহ। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও কন্যা পণ আছে। বংশ মর্য্যাদা অনুসারে কন্যা পণের বেশী কমী হয়। হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহারা নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু বিধবারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবার ন্যায় আচার রক্ষা করে। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই প্রশংসাজনক। ইহা "সাগাই" বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পঞ্চায়তের অনুমত্যানুসারে স্ত্রী-ত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী তাম্বুলীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বতন্ত্র বা পতিত নহে। ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্র দেবতা চন্দ্রসূর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য দেবতা আছে। গোধুমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কলা ও

দধি দিয়া তাঁহাদের পূজা হয়। অন্যান্য শ্রমজীবি বণিকজাতির ন্যায় তাম্বুলী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্ম্মা পূজায় যন্ত্রপূজার ন্যায় বৈশাখী পূর্ণিমায় চুণের ভাঁড়, পান, জাঁতি ও কাতারি পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অশৌচ ৩০ দিন।

তাম্বুলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর ভারতে এখনও তাহাই আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় তাম্বলীরা প্রায় জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্ত দোকানদারী, শস্য ব্যবসায় ও চুণ বিক্রয় করিতেছে। অনেকে কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকরি ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাঙ্গল ধরে না। সৎশূদ্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা স্মার্ত্তবিধি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ তেলিকে কেহবা তাম্বূলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে তাম্বূলী সৎশূদ্র. কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাম্বূলীরা জলাচরণীয় নহে। ইহারা পাঙ্গাস, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি শল্কহীন মৎস্য খায় না।

পুনার তাম্বূলীরা পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও আহ্মদনগর হইতে আসিয়া পানের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কুনবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় উপাধি প্রচলিত। সমোপাধি ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। ইহারা খদির, শুপারি, পান ও তাম্বূল বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখাপড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতক-মুসলমান আছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কুনবী। অরঙ্গজীবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুস্থানিতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বূলের ব্যবসা করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখনও অনেক হিন্দু ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাম্বূলীরা ক্ষত্রিয় ও অত্যন্ত মদ্যপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তাম্বূলী হানফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান ও সর্ব্বত্র এক আচারান্বিত। মুসলমান তাম্বূলীরা তাম্বূল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাঁধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে।

আবেদনের অনুবাদ।

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত এচ্, এচ্, রিজলি আই, সি, এস।

ভারতবর্ষীয় জাতিতত্ত্ব পরিদর্শক মহোদয়েষু—

মহাশয়!

আমি এতৎসহ "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক তিনখানি বাঙ্গালা পুস্তিকা ও "বঙ্গীয় তাম্বূলী" নামধেয় তিনখানি ইংরাজী পুস্তিকা পাঠাইলাম। প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানি পশ্চাদুক্ত পুস্তিকার ভিত্তি স্বরূপ এবং বস্তুতঃ বাঙ্গালার অত্যাবশ্যকীয় অংশ সকল ইংরাজীতে অনুবাদ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আমি প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে অনেক আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছি এবং ঐ সংগ্রহই উপরোক্ত পুস্তিকাদ্বয়ের ভিত্তি স্বরূপ। আমি স্বয়ং জাতিতে তাম্বূলী। জেলা ২৪ পরগণা বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কুশদহের সপ্তগ্রামী সম্প্রদায়ভুক্ত।

২। আমি আপনার বিখ্যাত বাঙ্গালার জাতীয় ইতিবৃত্তে ২৯২—২৯৫ পৃষ্ঠায় তাম্বূলীদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। ঐ ইতিহাস নিশ্চয়ই অতি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও মহাশয় হুগলি নিবাসী বাবু শম্ভুচন্দ্র দে ব্যতীত অপর কোন লোকের নামোল্লেখ করেন নাই, তথাচ আপনি যে তাম্বূলী জাতীয় অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শম্ভু বাবু একজন সুশিক্ষিত লোক এবং অনেক বিষয় তিনি জ্ঞাত আছেন। সে যাহা হউক, তাম্বূলীজাতি যখন এত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অর্থাৎ সমাজে কিম্বা সম্প্রদায়ে, চলিত ভাষায় থাকে বিভক্ত, তখন যতই কেন তিনি অভিজ্ঞ হউন অথবা আপনার সম্প্রদায়স্থ তাম্বূলীগণের আচার ব্যবহার অবগত থাকুন, স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত ব্যতিরেকে এই সুদূরব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচারাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করা কেবলমাত্র একজন লোক দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শম্ভু বাবু যে বিশেষরূপ তদন্ত করিয়াছেন, তাহা আমার বোধ হয় না। সে যাহা হউক, কতকগুলি ভ্রম আপনার পুস্তকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ একস্থানে আছে যে, "কি ব্রাহ্মণ অথবা রাজপুত কেহই ইহাদিগের স্পৃষ্ট জল পান করে না" (অর্থাৎ তাম্বূলীদিগের হস্তে)। যদিও এই তথ্য আপনি বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নিকট প্রাপ্ত

হইয়া পুস্তকস্থ করিয়াছেন, তথাপি ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আপনার লিখিত বিষয়ের নিদর্শনে বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নামোল্লেখ দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি এবং প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য আমি তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি দুইটী লোককে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহাদের উভয়েরই নিকটে তিনি আপন ভ্রম স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "যে রিজ্‌লি সাহেব সম্যক্‌রূপ বুঝিতে না পারায়, ঐরূপ ভ্রম ঘটাইয়াছেন।—আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তত্রস্থ তাম্বূলীদিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।" এস্থলে আমি বলি যে, উপরোক্ত হেতুবাদের যদি এই প্রকারে সংশোধন হয়, তাহাও ঠিক হইবে না। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কি ব্রাহ্মণ, কি অপর জাতি, সকলেই তাম্বূলী স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ব্যতীত অপর সকল স্থানেই তাম্বূলীগণ তাম্বূল বিক্রয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাম্বূল প্রস্তুত করিতে হইলে চূণ ও খদিরের আবশ্যক—ইহাতেও জলের প্রয়োজন, কারণ জল ভিন্ন চূণ ও খদির কখনও দ্রব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জল ভিন্ন পর্ণ জন্মাইতে পারে না এবং পানে সচরাচর যে জল-সেক করিতে হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। অপরাপর জাতিদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণও এই জলসিক্ত প্রস্তুত তাম্বূল ক্রয় ও চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপনার উক্তি অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাম্বূলী স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না" সম্পূর্ণই ভ্রমপূর্ণ।

৩। তাম্বূলীদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমুদায় ভুল পুস্তকস্থ হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। আপনি বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার তাম্বূলীগণ পাঁচভাগে বা থাকে বিভক্ত; যথা সপ্তগ্রামী বা কুশদহ, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশ গ্রামী এবং বর্দ্ধমানিয়া। প্রথমোক্ত তাম্বূলীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা উত্তরভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রাম অথবা সাতগাঁয় আপনাদিগের বাসস্থান মনোনীত করেন ইত্যাদি।" বস্তুতঃ সপ্তগ্রামী সম্প্রদায় উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে বর্দ্ধমানে বসতি করেন এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহারা বর্দ্ধমান হইতে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। পৃথক্ পৃথক্ সাতটি গ্রামে বসবাস হেতু এই সম্প্রদায় যে সপ্তগ্রামী বলিয়া কথিত, তাহা নহে, পরিশেষে সপ্তগ্রামে বাস হেতুই সপ্তগ্রামী নামে অভিহিত হইয়াছে। (আমার বাঙ্গালা পুস্তিকা ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪। আপনি শ্রীমন্ত পাল সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি বর্দ্ধমানিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত তাম্বূলী।" বস্তুতঃ শ্রীমন্তপাল আদিসমাজভুক্ত ছিলেন; যাহা এক্ষণে বিয়াল্লিশ গ্রামী নামে অভিহিত হইতেছে এবং যাহাদের বাসস্থান বর্দ্ধমানেই নিরূপিত ছিল। বর্দ্ধমানিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ বাঁকুড়ায় বসবাস করিলেন। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ সকল বর্দ্ধমান নিবাসী তাম্বূলী আপনাদিগের বর্দ্ধমানিয়া সংজ্ঞা পরিহারপূর্ব্বক আদি বা বিয়াল্লিশ গ্রামী সংজ্ঞায় পরিচয় দিয়া থাকেন।

৫। অষ্টগ্রামীসম্বন্ধে আপনি বলেন যে, "যৎকালে সপ্তগ্রামীরা উত্তর ভারত হইতে আগমন করেন, অষ্টগ্রামীরাও তৎসমসাময়িককালে ঐ স্থান হইতেই আসিবার পরিচয় দিয়া থাকে এবং বাসস্থানের দূরত্বহেতু স্বজাতির সহিত তাহাদের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাদের সামাজিক সম্মান অপেক্ষাকৃত অল্প।" উল্লিখিত বিষয়ে আমরা দুইটী ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, অষ্টগ্রামী সম্প্রদায় আদি অথবা বিয়াল্লিশ গ্রামী সম্প্রদায় হইতেই নিঃসৃত এবং বর্দ্ধমানেই ইহাদিগের বাসস্থান নিরূপিত ছিল। দ্বিতীয়, তাম্বূলীদিগের যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে কোনটি হইতেই অষ্টগ্রামীরা সম্মানে হীন নহেন।

৬। একস্থানে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় তাম্বূলীদিগকে নবশাখের অন্তর্গত করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন; অথচ তাহাদিগকে নবশাখের আচরিত ক্রিয়াকলাপ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।" এস্থলে আমি বলি যে, ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম, কারণ ব্রাহ্মণগণ কোন স্থানেই তাম্বূলীদিগকে নবশাখ-আচরিত ক্রিয়াকর্ম্মে বঞ্চিত করেন নাই। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আপনার সংবাদদাতা বাবু শম্ভূচন্দ্র দে "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাম্বূলীস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না" এই কথা বলিয়া সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন।

৭। তাম্বূলীদিগের খাদ্য সম্বন্ধে আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান করে, কিন্তু যাহারা মদ্য অথবা মাংস বর্জ্জন করিতে পারে, তাহারা অধিকতর সুপথগামী।" ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ পাইতেছে যে, মদ্যপানের কোন নিষেধ-বিধি নাই, যদিও ইহার পরিত্যাগ সুখকর। আমি এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি যে, তাম্বূলীগণ মদ্যপানকে এ ভাবে গ্রহণ করেন না, বরং মদ্য যে নিষিদ্ধ মাংসবৎ পরিত্যাজ্য, ইহাই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য মতে মদ্যপান দোষাবহ না হওয়ায়,

অধুনা সকল জাতির মধ্যেই এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে মদ্যপান করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত, এক্ষণে কিন্তু তাহা আর হয় না। জাতির নেতাগণ কেবল অভ্যাসকেই নিন্দা করেন। বস্তুতঃ বলিতে কি, পানাহার সম্বন্ধে জাতীয় নিয়মে বর্ণিত এই মদ্যপান অভ্যাস একেবারেই নিষিদ্ধ এবং গোমাংস অথবা শূকর মাংসবৎ পরিত্যজ্য। যদি আপনি বিহারের তাম্বূলীদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেস্থলে আমার বলিবার কিছুই নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

উত্তরের অনুবাদ।

ভারতবর্ষীয় সেন্সশ্ কমিশনার শ্রীযুত এচ্, এচ্, রিজলি স্কোয়ার সি, আই, ই, কর্ত্তৃক লিখিত।

কলিকাতা ১৬ই এপ্রেল ১৯০২।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত।

মহাশয় সমীপেষু—

১৫৩।১ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়!

আপনার ২৭শে মার্চ্চ ১৯০২ তারিখের পত্র ও তৎসহ বঙ্গীয় তাম্বূলী নামধেয় কয়েকখানি পুস্তিকা পাইয়া ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম এবং তদুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, তাম্বূলী জাতি সম্বন্ধে আপনার যে প্রতিবাদ, তাহা আমার স্মরণ থাকিবে ও আমার বাঙ্গালার জাতীয় ইতিবৃত্তের ২য় সংস্করণ কালে ইহা বিবেচিত হইবে। আমি যে সকল বিষয় বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নিকট পাইয়াছিলাম, তাহাও তৎকালে উল্লিখিত হইবে। আমি তাঁহার মত গ্রহণ করি নাই।

প্রধান সহকারী শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু।

রিজলি সাহেব রূপককে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করতঃ বৈজ্ঞানিক জাতিতত্ত্বে তাম্বূলীকে বৈশ্যপিতা ও শূদ্রমাতা হইতে উদ্ভূত বিবেচনা করিয়া ঔপন্যাসিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি যোগীন্দ্র বাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে নবশাখকে সঙ্কর জাতি মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে অন্ত্যজ জাতিগুলি সঙ্কর। আমরা বলি, অন্ত্যজ জাতিগুলি সঙ্কর নহে, কিন্তু অনার্য্য। "ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই পুরোহিত পৃথক্, প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও এক জাতীয় যাজক ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত। এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারা ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়।" সম্বন্ধ-নির্ণয়ে তাম্বূলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই। তাহাতে নবশাখা পরিচায়ক একটী পদ আছে :—

তিলি মালী তামুলী গোপ নাপিত গোছালি।
কামার কুমার পুঁটুলী এই নবশাখা বলি॥

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থ আমার প্রথম পথপ্রদর্শক। এজন্য বর্ত্তমান পুস্তকের এক অংশের "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামকরণ করিয়াছি। এক্ষণে যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত হিন্দুজাতি ও উপাসকসম্প্রদায় হইতে তাম্বূলী কথা ইংরাজী হইতে অনুবাদিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

"তাম্বূলী—সংস্কৃত তাম্বূল শব্দ হইতে উদ্ভূত। তাম্বূল অর্থে পান, এ জাতির প্রধান ব্যবসায় তাম্বূল বিক্রয়। এখনও দেশের কোন কোন স্থানে তাম্বূলীদিগকে তাহাদিগের পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। বাঙ্গালার তাম্বূলীগণ অবস্থাপন্ন লোক এবং বহুকাল হইল, তেলীদিগের ন্যায় ইহারাও তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে চাউল, ডাউল প্রভৃতি ভূষিমালের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহারা এক্ষণে জানে না অথবা স্বীকার করে না যে, তাহাদিগের জাতির সহিত বারুইদিগের নিকট সম্বন্ধ। তেলী এবং তাম্বূলী উভয় জাতিই সাধারণতঃ একপ্রকারেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে; ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হউক, বাঙ্গালার লোক-সাধারণের এই বিশ্বাস যে, তেলী ও তাম্বূলী একই জাতির দুইটী বিভাগমাত্র। বস্তুতঃ উপরোক্ত বিশ্বাসের কতকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়। কতকগুলি তাম্বূলীজাতি স্বজাতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তেলীজাতির

অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতেছে;—ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, রাণাঘাটের পালচৌধুরি বংশের স্থাপয়িতা কৃষ্ণপান্তী। ইনি পূর্ব্বে তাম্বূল বিক্রয় করিতেন, পরে বিখ্যাত সওদাগর এবং অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কৃত দশশালা বন্দোবস্তের প্রারম্ভে গোলযোগের সময়, নবদ্বীপরাজের সুবৃহৎ তালুক সকল ক্রয় করিয়া, একজন বিখ্যাত জমীদার হন। কৃষ্ণপান্তী পূর্ব্বে যে কেবলমাত্র তাম্বূলবিক্রয়ী ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার পদবীতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি তাম্বূলীজাতীয় ছিলেন। যাহা হউক, এই বংশ এক্ষণে আপনাদিগকে তেলী বলিয়া স্বীকার করেন ও সেই পর্য্যন্ত জমীদার হইয়া, পালচৌধুরী নাম ধারণ করতঃ তেলীদিগের শীর্ষস্থানে অবস্থিত আছেন। ১৮৯১ সালের আদমসুমারিতে ভারতবর্ষে তাম্বূলীদিগের যে লোকসংখ্যা নিরূপিত হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা	১০৫৪১৬
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৭৪১৩৪
মধ্য ভারত	২৪৩৯৮
	২০৩৯৪৮

বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্যভারতের তাম্বূলীগণ সাধারণতঃ সম্পূর্ণ নিরক্ষর। বাঙ্গালায় এমন অনেক বিখ্যাত তাম্বূলী দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়, প্রায় সকল বিষয়েই তেলীদিগের সমকক্ষ। বাঙ্গালার তাম্বূলীদিগের পদবী পাল, পান্তী, চেল ও রক্ষিত এবং বিহারের তাম্বূলীগণ খিলীওয়ালা ও পান্তী শব্দে অভিহিত হয়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন ইংরাজ লিখিত গ্রন্থে দেখিয়া থাকিবেন, বিহারে তাম্বূলীদিগের খিলীওয়ালা ও পান্তী উপাধি আছে। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, কাহারও কৌলিক উপাধি খিলিওয়ালা হইতে পারে না; ইহা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মের পরিচায়কমাত্র। হিন্দুস্থানিদের নামের সহিত কোন কৌলিক উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, অতএব বিহারের তাম্বূলীর পান্তী উপাধি থাকা সম্ভবপর নহে। ইহাকে সম্ভবপর জ্ঞান করিয়াও বঙ্গীয় তাম্বূলীর মধ্যে পান্তী উপাধি আছে, এই ভ্রমে রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তীকে জাত্যন্তর প্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। বাস্তবিক পানের ব্যবসায় নিবন্ধন কৃষ্ণপালের কৃষ্ণপান্তী নামকরণ হইয়াছিল। তিনি জাত্যংশে তাম্বূলী ছিলেন না।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে জনসংখ্যা গৃহীত হয়, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান তাম্বূলী গণিত হইয়াছে। তাম্বূলীর মধ্যে বারুই নামে একটী শ্রেণী আছে। বারুই যে তাম্বূলী হইতে পৃথক্, তাহা সকলেই জানেন। ব্যবসায়ের ঐক্য দেখিয়া, গণনাকারি জাতি নির্ব্বাচনে ভ্রান্ত হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে সেরিং ও ক্রূক্ স্থির করিয়াছেন, বারুই ও তাম্বূলী পৃথক জাতি নহে। ক্রূক্ সাহেব লিখিয়াছেন;—ভারতবর্ষীয়দিগের নিত্য ব্যবহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় পানগুল্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সংস্রব থাকায়, তাম্বূলীগণ কিছু অবস্থাগত সম্মান পাইয়া থাকেন। আত্মশুদ্ধির প্রতি ইহাদিগের লক্ষ্য দেখা যায়।

আসামে পান ও সুপারি উভয়কে তাম্বূল কহে। তাম্বূল বিক্রয়ের জন্য বারুই বা তাম্বূলী নামে কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট নাই। গৌহাটীনিবাসী আসামের পূর্ব্বতন রাজার পরিচারকগণ (ফুকন্) এই সম্মানিত উপাধি পাইতেন, তন্মধ্যে যিনি তাম্বূলকরঙ্কবাহী ছিলেন, তাঁহাকে তামূলীফুকন্ কহা হইত। ডিব্রুগড়নিবাসী আসামবুরুঞ্জী লেখক স্বর্গীয় কাশীরাম তামূলীফুকন্ ব্রাহ্মণ-জাতীয় ছিলেন। এই তামূলীফুকনের উপাধি হইতে দুইটী তত্ত্ব নিষ্কাসিত করিতে পারা যায়। ১ম, তাম্বূলের সংস্রব পবিত্র, নতুবা ব্রাহ্মণ ইহার কার্য্য-ভার লইতেন না। ২য়, তাম্বূলের সংস্রবে থাকাতে তাঁহার তামূলী বা তাম্বূলী উপাধি হইয়াছিল।

গেট কৃত ১৯০১ সালের রাজকীয় জন-সংখ্যা।

তাম্বূলী।

(ঔড্র ও হিন্দুস্থানি সহ)

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
বর্দ্ধমান	৩০০০	২৯৯১	৫৯৯১
বীরভূম	১০২৩	৯৫৫	১৯৭৮
বাঁকুড়া	৯২১৩	৯৫৪৪	১৮৭৫৭
মেদিনীপুর	৪১৫৬	৪২৫০	৮৪০৬
হুগলি	২৬৩১	৩১৯৬	৫৮২৭
হাওড়া	৯৯৫	১০৭৪	২০৬৬
২৪ পরগণা	৮০২	৭০৯	১৫১১

নদীয়া	৫২৪	৫৪৬	১০৭০
বালেশ্বর	১৩৩২	১৩৫৩	২৬৮৫
কটক	১৪০৪	১৫৫৯	২৯৬৩
পুরী	৫২১	৫৮৪	১১০৫
	২৫৬০১	২৬৭৬১	৫২৩৬২

ইহাতে দেখা যাইতেছে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৬০ অধিক। বাঁকুড়া জেলায় তাম্বূলীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইস্থান হইতে পরশুরামের কারিকা সংগৃহীত হইয়াছে। যেখানে তাম্বুলীর সংখ্যা অধিক, সেইস্থান হইতে কুলপঞ্জি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রামাণিকতা সকলের স্বীকার্য্য।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আনুমানিক জন-সংখ্যা ৩৮৮০০, তদনুসারে ১৩৫৬২ সংখ্যা প্রভেদ হইতেছে। রাজকীয় বিবরণীতে পৃথকভাবে যেখানে প্রত্যেক জেলার জন-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যা সমেত তাম্বূলীর সংখ্যা ৭৫৬৫৯ আছে। যথায় অকারাদি ক্রমে জাতির নামানুসারে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় ৮৭০৪৯ নির্দ্দিষ্ট দেখিলাম। ইহাতে রাজকীয় মতে ১১৩৯০ সংখ্যার প্রভেদ হইল। অতএব আমাদের অনুমানে বা রাজকীয় গণনায় কোনটীতে অধিক ভ্রম আছে, নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম।

তৈলী।

বঙ্গে তৈলী ও তাম্বূলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাম্বূলী ও বারুই জাতিকে একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা আছে। বৃত্তিগতভাবে দেখিলে তাহা সত্য, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তির ইতিবৃত্ত দৃষ্টি করিয়া অধুনা অন্ন ও পাণিগ্রহণ বিচার করতঃ জাতির পার্থক্য হইয়া থাকে। তদনুসারে দুই স্থানে উক্ত তিন জাতিতে সম্পূর্ণ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে এক জাতিভুক্ত কহা অজ্ঞতার পরিচায়কমাত্র। কলুজাতির অনেকে তেলী নামে পরিচয় দেন, এজন্য স্থানবিশেষে তৈলীরা আপনাদিগকে তিলি আখ্যা দিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ধনবান্ তৈলী তৈপাল নামে পরিচিত। যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন ;—

"শাস্ত্রের অর্থানুসারে কি কৃষক জাতি, অথবা কি শিল্পকর, উভয় জাতিই

তুল্যরূপে বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাহারা সচরাচর যজ্ঞোপবীত ধারণ না করায় শূদ্র বলিয়া পরিচিত।"

* * * *

"তৈল ব্যবসায়ের সহিত আজকাল বাঙ্গালায় তৈলীদিগের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহারা আপনাদিগকে তৌলিক বলে। তুলা (দাঁড়ি পাল্লা) হইতে তৈলী নামের উদ্ভব, তৈল হইতে নহে। কিন্তু তুলা হইতে যে তৈলী শব্দের উৎপত্তি, ইহা ব্যাকরণতঃ অসম্ভব ও উল্লিখিত বাক্যের বিশেষরূপ প্রতিবাদও হইয়াছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অপরাপর স্থানের তৈলীরা প্রকৃতই তৈল নিষ্কাষণ কার্য্য করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার তৈলাগণ নবশাখের মধ্যে গণ্য এবং সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালার তৈলীগণ একটি ক্ষমতাবান্ জাতি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দোকান ও শস্যাদির ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত সঙ্গতিপন্ন লোক। ইংরাজাধিকারে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত ধনী ও জমিদার হইয়াছেন। তন্মধ্যে মুরশীদাবাদের বিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ী এবং দিঘাপতির রাজা উল্লেখ-যোগ্য।"

তৈলীদিগের সাধারণ বংশের নাম ;—১ কুণ্ডু, ২ পালচৌধুরী, ৩ পাল, ৪ নন্দী, ৫ দে, ৬ চৌধুরী, ৭ মল্লিক, ৮ রায়।

"বাঙ্গালার তৈলীদিগের মধ্যে অতি অল্পই অশিক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইংরাজাধিকারে ইহাদের মধ্যে কতিপয় মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত স্বর্গীয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর। ইনি যে ভারতের মধ্যে একজন প্রধান সম্পাদক ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন, ইহা নিশ্চয়ই বহুকাল লোকের মনে জাগরূক থাকিবে। কলিকাতার হিন্দু কলেজ হইতে প্রথমে কতকগুলি তৈলী বিখ্যাত হইয়া বহির্গত হন, তন্মধ্যে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিকই উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান তৈলীগণের মধ্যে বিখ্যাত শ্রীনাথ পাল। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহারাণীও তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। পঠদ্দশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গত দশ বৎসর হইল, ইনি, মহারাণীর বৃহৎ জমীদারি সুচারুরূপে শাসন করিতেছেন। বাঙ্গালার তৈলীগণের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে, যথা, একাদশ, দ্বাদশ, বেতনা, তুঁষকোটা এবং সপ্তগ্রামী।"

"তেলুগু দেশীয় কলুদিগকে তেলকুলু ভারলু বলে ও তাহারা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করে।"

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কলু নাই। তৈলীরা তৈল নিষ্কাষণ-কার্য্য সমাধা করে। ক্রিয়ার উৎকর্ষাপকর্ষনিবন্ধন সামাজিক সম্মানের ইতরবিশেষ হয়। গো-জাতি হিন্দুর পূজ্য, তৈল নিষ্কাষণের সহায়তা জন্য বলিবর্দ্দকে কষ্ট দিতে হয়, ইহা তৈলীর ব্যবসায়ের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছে; এইহেতু তাহারা সমাজে হেয়, অযাজ্য ও তাহাদের জল অনাচরণীয়। বঙ্গদেশে তৈলীজাতি সেরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে, সুতরাং সামাজিক সম্মানে তাহারা শ্রেষ্ঠ, যাজ্য ও আচরণীয়।

সহৃদয় সঞ্জীবনী-সম্পাদক তৈলিক সমিতির কার্য্যবিবরণে তাম্বূলী ও তৈলিক এক জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ ভ্রম অনেকের হইয়া থাকে। সম্পাদকীয় উদার উক্তি ও বিভিন্ন সময়ের সভার কার্য্য-বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"বঙ্গদেশের তেলি সম্প্রদায়ের উন্নতি-উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপার সারকুলার রোডে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগান বাটিতে গত শুক্রবার আনুষ্ঠানিক সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত প্রায় একশত লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন। ভাগ্যকুলের সৌভাগ্যশালী কুণ্ডু বাবুদের অনেকে, রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের কেহ কেহ, হাওড়া মৌড়ীর বাবু গুরুদাস চৌধুরী, উলার বাবু জগন্নাথ খাঁ, শ্রীরামপুরের বাবু মদনমোহন দে, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতনামা অনেক লোক সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভার সভাপতি, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় ও বাবু কিশোরী মোহন রায়, রাণাঘাটের বাবু নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী এবং দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমদা নাথ রায় সহকারী সভাপতি, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কোষাধ্যক্ষ, বাবু সীতানাথ রায় সম্পাদক, বাবু যশোদানন্দন পরামাণিক এম, এ, বি, এল, বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি, এল, বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু বি, এল, ও বাবু রাধাচরণ পাল সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। প্রতি মাসে এই সমিতির এক এক অধিবেশন হইবে। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এত গুলি ধনী ও পদস্থ লোক, ইচ্ছা ও চেষ্টা এবং যত্ন করিলে সহজেই এই

সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এতদিন যে এজন্য চেষ্টা হয় নাই, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। ইহাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু ব্যক্তব্য আছে। বঙ্গে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণ রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সমস্ত জাতিকে এক করা বর্ত্তমানে দুরূহ ব্যাপার বটে, তেলিদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে উন্নত করা তেমন দুরূহ নহে। নিম্নশ্রেণী চিরদিন নিম্নে থাকুক, ইহা যেন কাহারও লক্ষ্য না হয়। নিম্নশ্রেণী উন্নত হইয়া উর্দ্ধশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া যাক্, এইরূপ চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়, তাহাতেই দেশের উপকার হইবে। ব্রাহ্মণেতর যে সকল শ্রেণীর মধ্যে জল চলে, তাহাদিগকে এক করিবার জন্য যদি "তেলী সম্প্রদায়" চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের সভা দ্বারা যথার্থই উপকার হইবে।"

"বঙ্গদেশে তৈলিক সম্প্রদায়ের অনেক শ্রেণীবিভাগ। কাশীমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার রাজপরিবার, রাণাঘাটের পাল চৌধুরীগণ, ভাগ্যকুলের কুণ্ডুগণ, কলিকাতার ৺ বাবু কৃষ্ণদাস পালের পুত্র বাবু রাধাচরণ পাল প্রভৃতি তিলি, তামলী যত সমৃদ্ধিশালী লোক বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহাদের সকলেই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে তিন বৎসর হইল এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে,—মহারাণী স্বর্ণময়ীর কলিকাতার বাগান বাটিতে প্রতি বৎসর এই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়; মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সমিতির সভাপতি, দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় প্রমুখ এই সম্প্রদায়ের কয়েকজন গণ্য মান্য পদস্থ লোক সহকারি সভাপতি, আর বাবু সীতানাথ রায় ইহার সম্পাদক।

এই সম্প্রদায়ের যে সকল গরিব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবে, সভা হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে শিল্প শিক্ষাদানার্থ একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে,—তাহাতে গরিব বালকদিগকে বিনা বেতনে ও অর্দ্ধ বেতনে কার্য্যশিক্ষা দেওয়া হইবে। সভার সাহায্যার্থ এ বৎসর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২ হাজার, রাজা প্রমদানাথ রায় ১ হাজার, এবং রাজা শ্রীনাথ রায় ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

তৈলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। এই শ্রেণীবিভাগ তুলিয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলন সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে সভা এবারকার অধিবেশনে স্থির করিয়া-

ছেন যে, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র অপর শ্রেণীর এক বালিকার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিবেন। সভাপতি যদি এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেই সভার নেতৃত্বের পদগ্রহণ তাঁহার পক্ষে সার্থক হইবে। আর অন্যেরা যদি তাঁহার এ কার্য্যের সহায় হন, তবেই তাঁহাদের সভাতে যোগদান সফল হইবে।"

বারুজী।

তাম্বূলী জাতি পানের খিলির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে, তাম্বূল উৎপাদনের ভার পুরুষানুক্রমে যাহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা একটি পৃথক্ জাতি-রূপে গণ্য হইল। পৌরাণিক যুগে এই ভাবে অসংখ্য জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বৈদেশিক আধিপত্যকালে নূতন জাতি সৃজন অনেকটা স্থগিত হইয়া যায়। তখন স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিতান্ত স্থিতিশীল হইতে হইয়াছিল। ক্রম-বিকাশ রহিত হইবার নহে, জন সাধারণ যথাসাধ্য তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে প্রয়াসী হইল। বরজ শব্দের অর্থ—পানলতা রক্ষার্থ কাষ্ঠিকা নির্ম্মিত গৃহ বিশেষ। বরজ এই দেশজ শব্দ হইতে তৎজীবি জাতির নাম বারুজী উৎপন্ন হইয়াছে। গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে বরজকে কাঠি কহে। তাম্বূল উৎপাদনের জন্য তথায় বারুজী নামে কোন জাতি নাই। কাঠী অর্থে কাষ্ঠিকা। যোগীন্দ্র বাবু বারুজীবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; যথা, "বারুজী বা বারুই জাতি পানের চাষ করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকই কতিপয় মসলা সহযোগে পান চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। পানকে ছোট খিলির ন্যায় করিয়া তন্মধ্যে চুণ, খদির, শুপারি, এলাচি প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, পরে খিলিটিকে একটি লবঙ্গ দ্বারা মুড়িতে হয়। এই প্রকারে উহা চর্ব্বণ করিলে চুণ ও খদির মিশ্রিত হইয়া ঠোঁটকে লাল করে এবং মসলা চর্ব্বিত হইয়া মুখ হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। মসলার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত পানের মূল্যেরও তারতম্য হয়। এক পয়সায় ৬টা হইতে প্রায় ১০০ একশত পর্য্যন্তও বিক্রীত হয়। প্রস্তুত করা পান সচরাচর এক পয়সায় পাঁচটা পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভারতবাসী প্রত্যহ অন্ততঃ ৬ ছয়টি খিলি খাইয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার ইহাতে এত অনুরক্ত যে, ১০০ খিলির কম তাহাদের দিন যায় না। ভোজনের পর এবং শয়নের সময় অধিক পান আবশ্যক হয়। ভারতীয় রাজ-

পুত্রগণের অথবা উচ্চ কর্ম্মচারিগণের উৎসব সভাদিতে সভাভঙ্গের সময়, আতর ও পানের দ্বারা অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করা হয়। হিন্দু অথবা মুসলমানের বাটিতে কোন আত্মীয় বন্ধু সমাগত হইলে, পান ও তামাক শিষ্টাচার রক্ষার্থ প্রদত্ত হয়। যখন কোন মুসলমানের বাটিতে হিন্দু সমাগত হন, তখন পানের পরিবর্ত্তে মসলা দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে অর্থাৎ উত্তর আসাম ও মান্দ্রাজ বিভাগের দক্ষিণ প্রদেশে অনাবৃত স্থানে পান গাছ লতাইয়া শুপারি বৃক্ষে অথবা মধ্যে মধ্যে বাঁশের খুটিতে উঠে। এই দুই স্থানে বারুজী বলিয়া কোন জাতি নাই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ স্থানে পান রোপণের জন্য সাতিশয় যত্ন লইতে হয়। পান প্রস্তুতকারীগণকে সমস্ত দিন বাগানে অর্থাৎ বরোজে অতিবাহিত করিতে হয় এবং তাহারাই একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পান বাগানের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ভ্রমণকারীগণ গাড়ির জানালা হইতে দেখিয়া থাকিবেন। ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য তত অধিক নহে, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য সাতিশয় মনোরম ও দর্শনযোগ্য। বারুই জাতি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী এবং শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। বঙ্গে বারুইগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর, কিন্তু আজকাল ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শিক্ষিত ও জ্ঞানোপার্জ্জনে উন্নত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।”

বঙ্গে বারুইগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ইহা সত্য; কেবল বারুই কেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্ন সাধারণতঃ তাবৎ জাতির লোক নিরক্ষর। শিক্ষিত বারুইগণ কুটুম্বদিগকে নিরক্ষর দেখিয়া আপনাদিগকে কায়স্থ নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই দোষ কোন কোন শিক্ষিত তাম্বূলীর সম্বন্ধে শুনিয়াছি। ইহাতে কায়স্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা আপনার জাতির নাম করিলে নিরক্ষরের মধ্যে মেধাবী বলিয়া অধিকতর সম্মানিত হইতে পারেন। আপন আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করা বা অন্যের নামে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর। ইহাতে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির হ্রাস হইয়া তৎজাতির উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। উপযুক্ত লোকের কর্ত্তব্য, তাঁহারা স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তাবৎ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; তাহা না বুঝিয়া অনেককে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে লিখিত আছে, নবদ্বীপাধিপতি গোয়ালা ভৃত্যদিগকে কায়স্থের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ

করিয়া কায়স্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিতেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কতকগুলি ন্যূনকল্প মর্য্যাদাপন্ন কায়স্থ আছেন। তাঁহাদিগকে বাহাত্তরে কায়স্থ শব্দে নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের নাম যথা ;—

১ নাগ, ২ পাল, ৩ আঁদিত্য, ৪ রাণা, ৫ সর, ৬ ধর, ৭ বর্দ্ধন, ৮ দানা, ৯ রাজ, ১০ হোড়, ১১ হুই, ১২ ব্রহ্ম, ১৩ তেজ, ১৪ ভঞ্জ, ১৫ ক্ষুর, ১৬ শর্ম্ম, ১৭ নন্দী, ১৮ বন্দী, ১৯ সোম, ২০ গুপ্ত, ২১ রাহা, ২২ আইচ, ২৩ রুদ্র, ২৪ দাঁহা, ২৫ ভূত, ২৬ প্রেত, ২৭ শুঁই, ২৮ চন্দ্র, ২৯ শীল, ৩০ নাথ, ৩১ রক্ষিত, ৩২ বিষ্ণু, ৩৩ ভদ্র, ৩৪ কুণ্ডু, ৩৫ সুর, ৩৬ ধরণী, ৩৭ বাণ, ৩৮ পই, ৩৯ জাম, ৪০ বিন্দু, ৪১ ধর, ৪২ বল, ৪৩ লোধ, ৪৪ বর্ম্ম, ৪৫ খিল, ৪৬ পিল, ৪৭ ইন্দ্র, ৪৮ ওম, ৪৯ অঙ্কুর, ৫০ বন্ধুর, ৫১ শাঁই, ৫২ হেশ, ৫৩ মনু, ৫৪ গণ্ড, ৫৫ রাহুত, ৫৬ গণ, ৫৭ উপমাণ্, ৫৮ ক্ষেম, ৫৯ বইশ, ৬০ বীজ, ৬১ অর্ণ, ৬২ আগ, ৬৩ শক্তি, ৬৪ শনি, ৬৫ হেম, ৬৬ বঙ্গ, ৬৭ কীর্ত্তি, ৬৮ যশ, ৬৯ ধনু, ৭০ গুণ, ৭১ ক্ষাম, ৭২ ঘর। ইহাদিগকে লইয়া যখন ৭২ গণনা করে, তখন নাগ, পাল ও নাথকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন নাগ, পাল ও নাথ অদ্ধ মৌলিক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত পদবীগুলি বঙ্গীয় অনেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। অহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলে সহজে কায়স্থ হইতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়ে দৃষ্ট হয় ;—

"এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, শর্ম্মা পুর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কোন ক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। ইহারা তদীয় অনুগ্রহে দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য, তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা ও প্রীতিবিধান করিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মা কহিলেন, আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস, নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদের কায়স্থ সমাজ মধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শর্ম্মা কহিলেন, মহোদয়গণ! যদিও আপনারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিতেছি না। কারণ আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি, অর্থাৎ

প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। আপনাদের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ-কুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহারা উত্তর করিলেন, আমরা আপনাকে আমাদিগের সমান মর্য্যাদা প্রদান করি, তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শর্ম্মার কয়েকটি কন্যা ও পৌত্রী দাস, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদান হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ ইহার মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তখন ইহাকে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে পুরা একঘর কায়স্থ ও পূর্ণমাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। পরে দলাদলি সূত্রে শর্ম্মা একপ্রকার চলিত হইলেন। ক্রমে দলাদলির বন্ধন শিথিল হইলে, তাহার বংশ পরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে প্রকৃত আধ ঘর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন। শর্ম্মার বংশের কন্যাগ্রহণ হইত, শর্ম্মার বংশে পারত্ পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শর্ম্মার বংশাবলী একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিল বলিলেই হয়।"

বারুইকুলগৌরব রায় যদুনাথ মজুমদার, বাহাদুর এম্, এ, বি, এল, নব-শাখ মাত্রের গৌরবস্থল। প্রথমে যখন তাঁহার নাম শুনি, পরিচয়দাতা বেদ প্রচারক বলিয়া যদু বাবুকে ব্রাহ্মণ ভ্রম করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত হিন্দু-পত্রিকা, হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণতা অপনোদন করিতে সচেষ্ট আছে। 'ব্রহ্মচারিন্ নামে ঐ ভাবের একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র উক্ত মহাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি যশোহরে ব্রহ্মচারি আশ্রম স্থাপন করিয়া দুইজন বারুইকে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছেন। তন্মধ্যে অন্যতর ছাত্র শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ আয়ুর্ব্বেদ বিভাগে কবিরাজের কার্য্য করিতেছেন। নাম দেখিয়া ইহাকে কেহই বারুই জ্ঞান করিতে পারিবেন না। যদু বাবু আমাকে কহিয়া-ছিলেন, যদি তোমরা দুইটী তাম্বূলী ছাত্র দাও, আমি ব্যয়ভার বহন করিয়া ব্রহ্মচারি আশ্রমে ব্যাকরণ, সাহিত্যের শিক্ষা দিব। তাঁহার উদ্যোগে ১৩০৮ সালের ৮ই কার্ত্তিক তারিখে লোহাগড়া গ্রামে বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবী জাতির সভা স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাস্থলে প্রস্তাব উপস্থিত ও সমর্থন উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাবু যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক বি, এল; বাবু রজনীকান্ত রুদ্র বি, এল; বাবু গোপালচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল; বাবু প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল; বাবু যোগেন্দ্রগোপাল রায় এল, এম, এস; বাবু যাদবচন্দ্র দাস উকিল; বাবু উমাচরণ সেন উকিল; বাবু বিধুভূষণ ভৌমিক উকিল; বাবু বিশ্বনাথ সরকার জমাদার; বাবু প্রিয়নাথ দাস জমীদার; বাবু চন্দ্রকান্ত দাস।

তাম্বূলী সভা।



অনুষ্ঠান পত্র।

বঙ্গীয় তাম্বূলী-জাতি-সম্মিলনী সভা।

সসম্মানং নিবেদনমিদং—

মহাভাগ!

আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতার অন্তর্গত আহিরীটোলা ৩৮।৫৯ নং শঙ্কর হালদার লেনস্থ ৺সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় তাম্বূলী-জাতি-সম্মিলনী" সভার প্রথম অধিবেশন হইবে, অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বজাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য, উক্ত দিবসে অপরাহ্ণ ৬॥০টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সবান্ধবে কৃপা-পূর্ব্বক সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। অলমিতবিস্তরেণ।

বিনীত নিবেদকাঃ—

(আদি সমাজ) শ্রীকৃষ্ণদাস নায়েক। (বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল কমিশনর)

(১৪ গ্রামী সমাজ) শ্রীমনোমোহন দে। (জমীদার, বড়শূল)

ঐ শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত। বৈঁচি।

ঐ শ্রীচণ্ডীলাল সিংহ। (জমীদার ও বিশিষ্ট মহাজন, দেবীপুর)

ঐ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী। (জমিদার, নাটুদহ)

ঐ শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত। (জমীদার,কাশীয়াডাঙ্গা)
ঐ শ্রীবঙ্কুবিহারী সিংহ। (মহাজন, হবিবপুর)
ঐ শ্রীরাধিকালাল সিংহ। বৈঁচি।
(২২গ্রামী সমাজ) শ্রীব্রহ্মানন্দ দত্ত। মোক্তার, হাইকোর্ট।
ঐ শ্রীপরমানন্দ দত্ত। অনুবাদক হাইকোর্ট।
ঐ শ্রীকেদারনাথ আশ বি, এল। উকীল, ২৪ পরগণা।
ঐ শ্রীকৃষ্ণধন আশ। (জমীদার, ডেরেটোন)
ঐ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ। ভদ্রকালী।
ঐ শ্রীবিপিনবিহারী দে এম, এ। শিক্ষক, ভদ্রকালী।
ঐ শ্রীরামযাদু রক্ষিত। (মহাজন, সন্ধিপুর)
ঐ শ্রীগোপীনাথ দত্ত। পাঁড়াতল।
(পল্লী সমাজ) শ্রীহারাণচন্দ্র দে বি, এল। উকীল, দুমকা।
(রাজহাটী সমাজ) শ্রীকেদারনাথ কুণ্ডু। (জমিদার, বাঁকুড়া)
ঐ শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল। উকীল বাঁকুড়া।
(অষ্টগ্রামী সমাজ) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে। (রাজা বালেশ্বর)
ঐ চৌধুরী যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক। (জমিদার, মেদিনীপুর)
(চতুর্গ্রামী সমাজ) শ্রীরামচাঁদ দত্ত। (জমীদার, মেদিনীপুর)
(সপ্তগ্রামী সমাজ) শ্রীদীননাথ দাঁ। (মহাজন, বরাহনগর)
ঐ শ্রীরাসবিহারী দত্ত। (জমীদার ও মহাজন খাঁটুরা)
ঐ শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত। (মহাজন, ৺কাশীধাম)

ঐ শ্রীসত্যপ্রিয় কোঁচ। (মহাজন হয়দাদপুর)
ঐ শ্রীহরিপ্রিয় কোঁচ। (মহাজন, কলিকাতা)
ঐ শ্রীভূতনাথ পাল। বি, এ। (মহাজন, খাঁটুরা)
ঐ শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল। মহাজন-বন্ধু-সম্পাদক, কলিকাতা।

সভার উদ্দেশ্য।

তাম্বুলি-সম্প্রদায়ের সমুদায় "থাকের" পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্মিলন এবং এই সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন, এই সভার উদ্দেশ্য। এতৎকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব :—

প্রথম প্রস্তাব। বৈশাখী পূর্ণিমা তাম্বূলি-ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় শুভদিন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই শুভদিনে কুলপূজা করিয়া সভা আহ্বান করিতেন; সেই সভাতে তাম্বুলি-সমাজের যথাযথ উন্নতি অবনতির আলোচনা এবং সমন্বয় সাধিত হইত। এক্ষণে ইহা নাই বলিলে হয়, এ কারণ আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্য-তাম্বুলিগণের প্রতিষ্ঠিত সেই পুণ্যব্রতের শুভানুষ্ঠানের জন্য, সভার পুনরাহ্বান বিশেষ আবশ্যক। এবং তাম্বূলি-কুলের উন্নতি-বিধান-কল্পে এই সভার স্থায়িত্বও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই হেতু প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহার বার্ষিক অধিবেশনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। তাম্বুলি-সমাজের সাধারণের সুবিধার জন্য, সভার বার্ষিক অধিবেশন প্রত্যেক বর্ষে বিভিন্ন স্থানে হওয়া আবশ্যক। কারণ, এইরূপে ইহার প্রসার

প্রতিপত্তির প্রতি এতজ্জাতীয় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; এবং কলিকাতাস্থ কেন্দ্র-সভার মাসিক অধিবেশন হইবে, প্রয়োজন হইলে, অতিরিক্ত অধিবেশন ও করা চলিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব। আমরা সকলে সমকুলোদ্ভব কি না, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "থাক"গুলি আধুনিক কি না,—তৎসংক্রান্ত বিচার ও মতামত প্রকাশ করা চলিবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানার্জ্জন, এবং দরিদ্রের কষ্ট-উপলব্ধি করাই জাতীয় উন্নতির সোপান। অতএব এই মহোদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এই সভা দ্বারা অনাথ দরিদ্র বালক-বালিকার প্রতিপালন-ব্যয় এবং দরিদ্র যোগ্য বিদ্যার্থীকে যথোচিত বৃত্তি দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রত্যেক "থাকের" কুলজী পত্রিকা এই সভা হইতে প্রস্তুত হওয়াও অবশ্য বিধেয়; এতৎকল্পে সভা যাহাতে অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় করিতে পারেন, তাহার আনুকূল্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গঠন।

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন।

বঙ্গীয় তাম্বূলি-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের আবাসাদি আমাদিগের সবিশেষ পরিজ্ঞাত নহে। অতএব সানুনয় অনুরোধ এই যে, মহাশয়, পত্র প্রাপ্তিমাত্র স্বীয় 'থাকের' নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া, সবান্ধবে সভারোহণ করিবেন; এবং তাঁহাদিগের নাম ধামাদি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাসের জন্য যাঁহাদিগের স্থানের সুবিধা নাই, তাঁহারও পত্র দ্বারা আমাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলে, আমরা তাঁহাদিগের বাসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব। মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন মাননীয় মহোদয়গণ কলিকাতার যেস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহারও নির্দ্দেশ করিয়া দিলে অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যথোচিত সাদর অভ্যর্থনার জন্য আমরা সাগ্রহে তত্তৎস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনয়নের ব্যবস্থা করিব। প্রস্তাব্য বিষয়াদি সমবেত সভ্যগণ দ্বারা বিবেচ্য ও ধার্য্য হইবার জন্য অভিজ্ঞ সদস্যগণ প্রস্তুত আছেন।

এই সভা সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র, ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্নাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরিতব্য।

[illegible]-সম্মিলনা" সভার বর্ত্তমান অবৈতনিক সম্পাদক,

[illegible] পাল বি, এ।

[illegible] নং [illegible]পাড়া লেন, পোষ্ট বাগবাজার,
কলিকাতা।

[illegible] [illegible]।

প্রধান সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ (১৪ গ্রামী)

সভাপতি।

শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দত্ত	(চতুর্গ্রামী)
শ্রীযুত দীননাথ দাঁ	(সপ্তগ্রামী)
শ্রীযুত দীননাথ দে	(অষ্টগ্রামী)
শ্রীযুত ললিতমোহন কর	(১৪ গ্রামী)
শ্রীযুত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুর	(৮ গ্রামী)
শ্রীযুত পরমানন্দ দত্ত	(৪২ গ্রামী)

সম্পাদক।

শ্রীযুত ভূতনাথ পাল বি, এ,	(সপ্তগ্রামী)

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার পাল চৌধুরি	(১৪ গ্রামী)
শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ পাল	(সপ্তগ্রামী)

তাম্বূলী সমাজ মাসিক পত্র।

সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত বি, এ, বি, এল.	(৪২ গ্রামী)
শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ,	

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

সভার কার্য্যালয়।

কলিকাতা, বাগবাজার, বসুপাড়া লেন নং ২৯।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুত হরিপ্রিয় কোঁচ	(সপ্তগ্রামী)

সদস্য

কানাইলাল সিংহ	১৪ গ্রামী	১৪০ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বিজয়গোপাল সিংহ	„	৩৪৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
বঙ্কুবিহারি সিংহ	„	১৩২ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অক্ষয়কুমার পাল	„	১৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রাধিকামোহন চৌধুরী	„	সিরাজগঞ্জ মনোহারী পটী।
ব্রজেন্দ্রমোহন দে	„	৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সীতানাথ পাল	„	ঢাকা, আম্‌লীগোলা।
পূর্ণচন্দ্র সিংহ	„	ঢাকা, মোগলটুলী।
তারিণীচরণ দত্ত	„	৪৮ নং কেথিড্রাল মিশন রো, কলিকাতা
দাশরথি সিংহ	„	৭ নং চিনিপটী, কলিকাতা।
রাজেন্দ্রলাল পাল	„	বোড়াগড়ি, বৈঁচি, হুগলি।
লালগোপাল দত্ত	„	হবিবপুর।
উমেশচন্দ্র দত্ত	„	বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রাধিকালাল সিংহ	„	১৯।১ আনন্দ খাঁর লেন, কলিকাতা।
রাজকৃষ্ণ সিংহ	„	বৈচি, পূর্ব্বপাড়া।
শ্রীরাম দত্ত	„	হবিবপুর।
রাজকৃষ্ণ দত্ত	„	বৈঁচি, পূর্ব্বপাড়া।
রামকৃষ্ণ সিংহ	„	ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
দীননাথ দাঁ	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর, পালপাড়া।
আশুতোষ রক্ষিত	„	„ „
প্রভাতচন্দ্র আশ	„	„ „
হরিপদ রক্ষিত	„	„ „
হরিপদ পাল	„	„ „
রামগোপাল পাল	„	„ „
কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	„	„ „
কার্ত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু	„	„ „

শ্রীযুক্ত হরিদাস রক্ষিত	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর	পালপাড়া।
„ নবীনচন্দ্র পাল	„	„	„
„ হরিহর পাল			
„ রামহরিপাল	„	„	„
„ মহানন্দ কুণ্ডু	„	„	„
„ সত্যপ্রিয় কোঁচ	„	৩৮।৩৯ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।	
„ রাজেন্দ্রনাথ পাল	„	২৪ নং গোলোক দত্তের গলি, কলিকাতা।	
„ ইন্দুভূষণ আশ	„	খাঁটুরা।	
„ হৃদয়মাণিক আশ	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।	
„ হরিপ্রিয় কোঁচ	„	৩৮।৩৯ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।	
„ ক্ষীরোদবিহারী চেল	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।	
„ শ্রীমন্তচন্দ্র আশ	„	„	
„ হরিদাস রক্ষিত	„	৯০ নং বটতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	
„ উপেন্দ্রনাথ চেল	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।	
„ বসন্তকুমার দে	„	শান্তিপুর।	
„ গোপালচন্দ্র পাল	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।	
„ শশীভূষণ কুণ্ডু	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।	
„ শরচ্চন্দ্র দত্ত	„	২০ নং শঙ্কর হালদারের গলি,	
„ গোপালচন্দ্র দে	„	২০ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।	
„ সুরেন্দ্রনাথ পাল	„	২৪ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।	
„ হরিবিহারী সেন	„	৭৮ নং জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।	
„ ললিতমোহন রক্ষিত	„	১৪ নং শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা	
„ কৃষ্ণহরি পাল	„	চিনিপটী, কলিকাতা।	
„ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল	„	৩১ নং বসুপাড়া লেন,কলিকাতা	

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রক্ষিত	সপ্তগ্রামী	ধাঁটুরা।
„ যোগীন্দ্রনাথ দত্ত	„	„
„ রাসবিহারী দত্ত	„	„
„ সতীশচন্দ্র দত্ত	„	„
„ মহানন্দ দত্ত	„	„
„ শিবচন্দ্র রক্ষিত	„	„
„ জানকীনাথ পাল	„	„
„ পার্ব্বতীচরণ আশ	„	২০ নং গোলোক দত্তের গলি, কলিকাতা।
„ বৃন্দাবনবিহারী সেন	„	২৬৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
„ পঞ্চানন রক্ষিত	„	১৫৩।১ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ হরিচরণ রক্ষিত	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।
„ শ্রীরাম আশ	„	„
„ দ্বিজরাজ কোঁচ	„	„
„ শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু	„	গোবরডাঙ্গা।
„ ভোলানাথ রক্ষিত	„	„
„ শ্রীরামচন্দ্র রক্ষিত	„	„
„ পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত	„	„
„ বিনোদবিহারী কুণ্ডু	„	„
„ ইন্দ্রভূষণ পাল	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন	„	২৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ কৃষ্ণধন রক্ষিত	৪২ গ্রামী	নূতনবাজার, কলিকাতা।
„ রামচরণ কর	(চতুর্গ্রামী)	বড়বাজার মেদিনীপুর
„ অভয়চরণ কুণ্ডু	„	মীরবাজার ঐ
„ রামচন্দ্র পীরি	„	চন্দ্রকোণা ঐ
„ উমাচরণ পীরি	„	রামজীবনপুর ঐ
„ শরচ্চন্দ্র পীরি	„	ঐ ঐ

শ্রীযুক্ত রামলাল পাত্রি	(চতুর্গ্রামী)	রামজীবনপুর		মেদিনীপুর।
„ উপেন্দ্রনাথ দে	„	গড়বেতা		ঐ
„ ফকিরচন্দ্র দে	„	ঐ		ঐ
„ দর্পনারায়ণ গুঁই	„	ঐ		ঐ
„ আশুতোষ গুঁই	„	ঐ		ঐ
„ শ্রীরামচন্দ্র লাহা	„	কামার পুকুর		হুগলী।
„ যোগেন্দ্রনাথ লাহা	„	ঐ		ঐ
„ ধ্রুবচন্দ্র লাহা	„	ঐ		ঐ
„ কালীচরণ লাহা	„	ঐ		ঐ
„ গণেশচন্দ্র কর	„	ঐ		ঐ
„ রামকুমার কর	„	কয়াপাট		হুগলী।
„ উমেশচন্দ্র পাল	„	„		ঐ
„ শ্রীরামচন্দ্র লাহা	„	বদনগঞ্জ		ঐ
„ শীতলচন্দ্র দে	„	„		ঐ
„ জগন্নাথ কুণ্ডু	„	খানাকুল		ঐ
„ ভূতনাথ সিংহ	„	ঐ		ঐ
„ গোপালচন্দ্র লাহা	„	কুমারগঞ্জ		ঐ
„ অন্নদাপ্রসাদ পাল	„	মীরবাজার		ঐ
„ রাখালচন্দ্র পাল	„	ঐ		ঐ
„ দীননাথ দাঁ	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর	পালপাড়া	২৪ পরগণা।
„ প্রভাতচন্দ্র আশ	„	„	„	ঐ
„ কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	„	„	„	ঐ
„ মহানন্দ কুণ্ডু	„	„	„	ঐ
„ নবীনচন্দ্র পাল	„	„	„	ঐ
„ হরিহর পাল	„	„	„	ঐ
„ হরিদাস পাল	„	„	„	ঐ
„ শ্রীমন্তচন্দ্র আশ	„	গোবরডাঙ্গা	হয়দাদপুর	ঐ
„ বসন্তকুমার দে	„	শান্তিপুর	সূত্রগড়	নদীয়া।
„ উপেন্দ্রনাথ চেল	„	বড়বাজার	চিনিপটী	কলিকাতা।
„ গোপালচন্দ্র পাল	„	„	„	ঐ

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ কুণ্ডু	সপ্তগ্রামী	বড়বাজার	চিনিপটী	কলিকাতা।
„ দাশরথি সিংহ	(১৪ গ্রামী)	„	„	ঐ

প্রভৃতি

নিয়মিত দিনে যথাস্থানে প্রথম অধিবেশন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া প্রায় প্রতিমাসে মাসিক সভা হইতেছে। মহানাদ, কটক প্রভৃতি স্থানে সহযোগিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্যাপি সভা রীতিমত বলসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখন কিছু বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। স্বজাতির হিতকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন, এমন কতকগুলি ব্যক্তির সভার সহিত সংযোগ হওয়া প্রার্থনীয়। যে প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা সময়ে উদ্যোগীগণ উপস্থিত করিতে ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে শুভফল প্রত্যাশা করা যায় কি না, বলিতে পারি না। তবে যত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারা যায়, ততই শ্রেয়ঃ। সভা অর্থে ব্যক্তি বিশেষ নহে—ইহা সাধারণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এবং সাধারণের কার্য্যতৎপরতা ভিন্ন সভার স্থায়িত্ব অসম্ভব। সভার কল্যাণে বিভিন্ন সমাজ একত্রিত হইয়া পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতেছেন, ইহা অল্পলাভ নহে। মাসিক পত্র হইতে পরিচয়ের পক্ষে বিশেষ আনুকুল্য হইয়া থাকে। কেবল সহকারী সম্পাদকের উদ্যোগে এই প্রয়োজনীয় বার্ত্তাবহ জীবনলাভ করিয়াছে। বালেশ্বররাজসাহায্য না দিলে মাসিকপত্র প্রকটনে বিলম্ব হইত। প্রধান সভাপতির নামের গুণে সভা প্রথম উদ্যোগে অনেক ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রমশীলতার জন্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

তাম্বূল-বণিক

ক্রোড়পত্র।

সমাজ ভেদ।

বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও বিহারের সন্ধিস্থলে ছোট নাগপুর বিভাগ অবস্থিত। এই প্রদেশ এখনও আদিম অধিবাসী দিগের বসতী স্থান হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উৎকলী, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও কোল জাতির সম্মিলন ক্ষেত্র বলিয়া, ছোট নাগপুর জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরের স্থল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিভাগকে অবলম্বন করিয়া মহামতি ডালটন জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রধান গ্রন্থ রচনা করেন। আর্য্য বা অনার্য্য হউক, ভাষা অপেক্ষা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে কিছু কালবিলম্ব হইয়া থাকে। বাঁকুড়া ও কলিকাতার লোকের পরিচ্ছদ এক, কিন্তু ভাষার প্রাদেশিকতা বিভিন্ন। সাধুভাষা এই প্রাদেশিকতা অনেক পরিমাণে লোপ করিয়াছে। আমরা লিখিবার সময় "হইবেক" লিখি, মুখে বলিতে হইলে "হবে" কহিয়া থাকি। "ইহা" এই শব্দ এবং "হইতে" এই শব্দ লিখিবার সময় ব্যবহৃত হয়। কথোপকথনে নয়। কিন্তু বাঁকুড়ায় এই দুইটী এবং ককারান্ত "হবেক" কথোপকথনের শব্দ। পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রাদেশিকতা বুঝা যাইবে না। কিন্তু কথা শুনিলে কে কোন্ দেশবাসী, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এবম্প্রকারে ভাষার দ্বারা আর্য্য বা অনার্য্য নির্ণয় অসম্ভব। মানুষের আচার ও বর্ণ বা রঙ দ্বারা কে আর্য্য, অনার্য্য ও মিশ্র তাহা স্থিরীকৃত হয়।

রেলপথ উন্মুক্ত হওয়ায় এক্ষণে স্থানান্তরে গমন নিবন্ধন জনসাধারণকে মাতৃভূমির সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয় না। যখন ইচ্ছা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। তাহাতে বাঙ্গালীর হিন্দুস্থানী হওয়া বা হিন্দুস্থানীর বাঙ্গালী হইয়া

যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে কেহ ভাবিতে পারেন, বাঙ্গালী চিরদিনই বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী চিরদিনই হিন্দুস্থানী আছেন। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। এক জাতির মধ্যে সমাজ ভেদ হইবার হেতু এক্ষণে উক্ত কারণে আর নাই। এক সমাজের লোক কার্য্যোপলক্ষে অন্য স্থানে বাস করিয়া বৈবাহিক ক্রিয়ার সময় আপন দলে গিয়া মিশিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বে সেরূপ হইতে পারিত না। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই একটী "থাক" হইয়া যাইত। স্বপাক ভোজন শুদ্ধাচারের আদর্শ রূপে গৃহীত হওয়ায়, অন্য থাকের অন্ন গ্রহণ করিতে আর প্রবৃত্তি হইবে কেন? এইরূপে এক রাজহাটীদের মধ্যে চারিটী থাকের উদ্ভব হইয়াছে।

তাম্বূলী জাতি বর্দ্ধমান হইতে জীবিকার জন্য মানভূম ও শিখরভূম প্রদেশে আগমন করিয়া পূর্ব্ব বাসস্থানের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইলেন। "বর্দ্ধমানিয়া" এই নামের মধ্যে কেবল ইতিহাস রক্ষিত থাকিল। তাম্বূলীগণ যখন দেখিলেন, অনার্য্য ভূমীর বনস্থলী পরিষ্কৃত হইয়া আর্য্য নিবাসে পরিণত হইতেছে, ব্যবসায়-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তৎকালে যে তাঁহারা সেই দিকে ধাবিত হইবেন, তাহা স্বাভাবিক।

পুরুলিয়ার সন্নিকটে কটলুই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীরাজ্যধর রক্ষিত ও শ্রীশ্রীদাম মাঝি (সেন) প্রভৃতি এই গ্রামের সমৃদ্ধ ব্যক্তি। নাগপুর পর্য্যন্ত কয়েক খানি গ্রামে এই থাকের ৫০০ পাঁচশত লোক আছেন। উল্কিপরা, মাথায় করিয়া জল আনা, মধ্যমাঙ্গুলিতে চুট্‌কী পরা ইত্যাদি ব্যবহারে হিন্দুস্থানীত্ব সূচক পরিচয়ের জনশ্রুতি থাকিলেও এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহা-দের বর্ণ যখন কৃষ্ণ নহে, তখন তাঁহাদিগকে অনার্য্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই। কটলুই গ্রামে গন্ধবণিক, ময়রা ও অনার্য্য মুদিজাতির বাস আছে। মুদিরা সাঁওতালী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জনোচিত জাতিবাচক নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই গ্রাম বলিয়া কেন, নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের অধিবাসীরা এখানকার তাম্বূলী উত্তমর্ণের নিকট ঋণী। গ্রামে যে কয়েক খানি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী আছে, তাহা সমস্তই তাম্বূলী দিগের বাসস্থান।

তাম্বূল-বণিকে সমাজ ভেদ প্রস্তাবে ভ্রম ক্রমে মানভূমের কটলুই গ্রামবাসী তাম্বূলী দিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিত হইয়াছে। পরের নিকট শুনিয়া

ঐ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সিংহভূমে উহাতে বর্ণিত প্রকারের কোন শ্রেণী বিদ্যমান নাই। সিংহভূমের ভূমিজ মুণ্ডা জাতির তামুলিয়া শ্রেণীর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের কোন সংশ্রব নাই।

ছোট নাগপুর বিভাগে গমন করিলে ভ্রমণকারী দেখিতে পাইবেন, কোন কোন স্থানে উড়িয়ার সহিত কোল মিশিয়াছে, কোথাও বা বাঙ্গালীর সহিত সাঁওতাল মিশিয়াছে। মানবাজারে বাঙ্গালীর ডাক হাঁকে হিন্দুস্থানী স্বর বেশ ধরিতে পারা যায়। বাঙ্গালী সংশ্রবান্বিত সাঁওতালকে কন্যার নামকরণে সখী, সহচরী, এমন কি প্রিয়ম্বদা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে ক্রমে ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া মুদী, কুর্ম্মি, মাহাতো বা বাউরি জাতিতে পরিণত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

পুরুলিয়া ও মানবাজারের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চকূটের রাজার শিখরভূমে আর এক থাকের তাম্বূলী আছেন। চাঁইবাসা নিবাসী তথাকার কালেক্টারির ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন পাল এই থাকের লোক। ইহাদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ছাগমাংস ভোজন করান প্রথা থাকায়, অন্য শ্রেণীর স্বজাতির নিকট কিছু বিসদৃশ ভাব দেখায়। জয়নগর ডাক ঘরের অধীন রামডিহি নিবাসী শ্রীজগন্নাথ দ্বারি (কুণ্ডু) এই থাকের জনৈক প্রধান ব্যক্তি। সম্প্রতি শ্রীঅক্ষয় দ্বারির বাটীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেড় হাজার কুটুম্ব একত্রিত হইয়াছিল। ইহারাও কটলুই শ্রেণীর মত আপনাদিগকে বর্দ্ধমানিয়া কহিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা রাখেন না। শিখরভূমের শ্রেণীর জনসংখ্যা ৬০০০ ছয় হাজার হইতে পারে।

তাম্বূল-বণিকে ১২টী সমাজের উল্লেখ আছে। তাহার পর কটক ৪২ গ্রামী, জাজপুরের অষ্টগ্রামী, আমতার ২৩।৷৹ গ্রামী ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিত কটলুইয়ের বর্দ্ধমানিয়া, শিখরভূমের বর্দ্ধমানিয়া এই কয়টী সমাজের কথা অল্পাধিক পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এখনও যে অনেক সমাজ আমাদের নিকট অশ্রুত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহা বেশ অনুমিত হইতেছে।

শিখরীয়া তাম্বূলীর মাংস ব্যবহারের কারণ এই যে, শিখরীয়া নবসেনার মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান। নবশাখকে এই দেশে নবসেনা কহে। আমাদের দেশে নবশাখ এক হুঁকায় তামাক খান। এ দেশে নবসেনার অন্তর্গত এক জাতি

অপর জাতির অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক জাতি উক্তশ্রেণীর অপর জাতিকে কুটুম্ব কহে। কিন্তু কুটুম্বিতা কালে ভিন্ন জাতির অন্ন চলে না।

নগর হইতে গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন বিভিন্ন, সামাজিক জীবনে তদ্রূপ প্রভেদ আছে। সৌধমালার পরিবর্ত্তে শস্য-শ্যামল-ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত কুটিরের অল্পবিত্ত অধিবাসী স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে রত থাকিয়া নাগরিকগণের আদি স্তর রূপে জীবলীলা সমাধা করিতেছে। মহানগরের সৎগোপ ও তৈলী ধনীক রমণী শিবিকারোহণে বদ্ধদ্বার থাকিয়া প্রতিবাসীর পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে পদার্পণ করেন। এদেশে কোমর জড়ান স্ত্রীলোক দেখিলে তৈলী বা সৎগোপ বলিয়া স্থির করা যায়। কারণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হয় বলিয়া, বস্ত্র পরিধানের প্রণালী উক্তবিধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ বাঁকুড়া হইতে মান-বাজারে মাথায় পানের চেঙ্গারি লইয়া বিক্রয় করিতে আনিতেছে। ক্ষত্রিয় বৃক্ষশাখায় উপবীত রক্ষা করিয়া ধান্যচ্ছেদনে প্রবৃত্ত। উপবীতধারী বৈশ্যের* রমণীগণ মুড়ি বহিয়া বাজারে বেচিতে যায়। নবসেনাভুক্ত নর সদারা পুত্র আপন ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইহা দেখিয়া নগরবাসীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ১৪ গ্রামী তাম্বূলী সমাজের নেতৃবৃন্দের ইহা অপরিজ্ঞাত নাই। নবসেনা বাস্তবিক পরস্পরের "কুটুম্ব" বটে। তাহাদের উপাধি একবিধ হইয়া থাকে।

এখানে কর্ম্মকার জল আচরণীয় জাতি নহে। লোহার ও কুম্ভকার দুই প্রকারের আছে। তাহাদের যে শ্রেণীতে বিধবার বিবাহ প্রচলিত, তাহারা অনাচরণীয়। বিধবাবিবাহকারী কুম্ভকারগণ মঘাই (মগধবাসী) নামে খ্যাত। অর্থাৎ ঐ জাতির হিন্দুস্থানী নাম ও ব্যবহার অদ্যাপি ঘুচে নাই।

পুরুলিয়ার কৈরী জাতি বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে, এ কথা স্বীকার

---

* এই জাতির অশিক্ষিত লোকে আপনাদিগকে বিশি বা বিশ্ কহে। বাঙ্গালায় যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ দেখিতে পান না, এই জাতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, পাবনা জেলার চাটমোহরে শঙ্খবণিক ও দাঁইহাটের নিকটস্থ সমুদ্রের কাংস্যবণিক উপবীত গ্রহণ করে। ইহাদিগকে বৈশ্য না বলিলে চলিবে না।

করিতে চাহে না। প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলে কহে, "তাহা অন্য থাকে চলিত আছে। তাহাদের সহিত উহারা আহার ব্যবহার করে না।" বৈদিক কালে দ্বিজের মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রথা ছিল। ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উল্লিখিত মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। তদ্যথা ;—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষএহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তমেতং পত্যুর্জনিত্বমভি সম্বভূব॥"

অর্থাৎ হে নারি, তুমি এই গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ ; উত্থান কর ; জীবলোকে আগমন কর এবং তোমার হস্তধারী বিবাহেচ্ছ ব্যক্তির জায়াত্ব স্বীকার কর। এ অবস্থায় বাঙ্গালী বা উৎকলী কোন শ্রেণী বিশেষের তাম্বূলীর মধ্যে বিধবা বিবাহের জনশ্রুতি থাকিলে, তাহা উক্ত শ্রেণীর হিন্দুস্থানীত্ব স্মরণ করাইয়া দিবে। বঙ্গীয় তাম্বূলীর হিন্দুস্থানী বংশাবতংশ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। : ইহা প্রদর্শনের জন্য এই প্রস্তাবে আনুসঙ্গিক নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। হিন্দুস্থানীর ক্রম বিকাশে বঙ্গীয় তাম্বূলী প্রাদুর্ভূত হইলেও এক্ষণে তাহারা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ জাতির একটী নূতন নামকরণ হইলে ভাল হয়। তাম্বূলীর পরিবর্ত্তে তাম্বূল-বণিক এই আখ্যা ধারণ করিলে সুসংগত হয়। নূতন কথা শুনিলে অনেকেই অমত করিবেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। সংশ্রব শূন্য হইয়া স্থানান্তরে বাস ব্যতীত সমাজভেদ হইবার অন্য কারণ পবিত্রতা রক্ষার প্রয়াস। এই প্রয়াস অযথারূপে ব্যবহৃত হইলে হানিজনক হয়। দলাদলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কুলপঞ্জীতে ১৪ গ্রামী সমাজের উৎপত্তির হেতু যাহা লিখিত হইয়াছে, আমি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি। বর্দ্ধমানের পাল মহাশয় কহিয়াছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষ কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হন—ইহাতে বঙ্গীয় তাম্বূলীর হিন্দুস্থানীত্ব ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে। যৎকালে ষষ্টীবর সিংহ এই কুলে বিবাহ করেন, তখন বর্দ্ধমানের পালেরা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব। তজ্জন্য শ্রীমন্ত খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করায়, ষষ্টীবরকে পিতাকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহ বঙ্গে আসিলে, ভবানন্দ মজুমদারের ন্যায় শ্রীমন্ত খাঁ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তৎকালে অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়া থাকিবেন।

শ্রীমন্তের ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তির পক্ষে দামোদর দত্ত প্রামাণিকের সহায়তায় ১৪ খানি গ্রাম হইতে কুটুম্ব আনিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বৈঁচী গ্রামে নূতন সমাজ সংস্থাপন করা কঠিন ব্যাপার হইল না। সংস্থাপকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অদ্যাপি শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরির গৃহে জামাতা বরণকালে পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাসের যোড় গ্রহণ করেন।

পরশুরাম।

সিদ্ধান্ত-সমুদ্র গ্রন্থে বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তাম্বূলী-জাতির বিবরণে লিখিয়াছেন, "তাম্বূল-বণিক প্রণেতা শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত স্থির করিয়াছেন, পরশুরাম তাম্বূলী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাম্বূলী নহেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ পরশুরাম আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" প্রকৃত পক্ষে পরশুরামের জাতি-নির্ণয় অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহাকে তাম্বূলী বলিবার যুক্তি কি আছে, "তাম্বূল-বণিক" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বারুইগণ দ্বিজপাত্র নামে কোন ব্যক্তির পূজা করিয়া থাকেন। সেই পূজার নামান্তর তাম্বূলী-পূজা। হরগৌরী পূজার সময় দেবীর পার্শ্বে মৃণ্ময় দ্বিজপাত্রের মূর্ত্তি চণ্ডীমণ্ডপে অনেকে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কুচিয়া-কোলে প্রাপ্ত আমাদের কুলচীতে দৃষ্ট হয়, দ্বিজপাত্রের নাম হরানন্দ এবং পরশুরাম দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র হরানন্দ। পরশুরামের ভণিতায় তাঁহাকে দ্বিজ কহা হইয়াছে। এখন অনুমান করিতে পারি, দ্বিজপাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিজপদ বাচ্য হইয়াছে। তাম্বূলীর কুলচী লিখন ও সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তনে পরশুরামকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহাকে স্বজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। কি গুণে তিনি দ্বিজপাত্র হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। পরশুরাম নিরঞ্জনের দাস ছিলেন, ধর্ম্মেরও আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন।

"নিরঞ্জন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর। তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর ॥
দূত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল। প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল ॥
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ। দ্বিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ ॥"

"১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হইবার বহু বৎসর পরে সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পরশুরাম তাম্বূলীর কুলচী লিখিয়াছিলেন। কেননা, পরশু-রামের কুলচীতে আমেদপুর, ইছলাবাজার প্রভৃতি তাম্বূলীগণের বাসগ্রামের এবং খাঁ ও পিরি প্রভৃতি তাহাদের উপাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"

"ব্রাহ্মণের নফর" এই কথাটীতে পরশুরাম যে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোক-ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণ জাতীয় দ্বিজ হইলে, ব্রাহ্মণের নফর বলিয়া কথিত হইতেন না। পরশুরামের পুত্রের নাম হরানন্দ। তাম্বূলীর কুলপঞ্জীতে ব্রাহ্মণ জাতীয় অন্য কোন পরশুরামের পুত্রের নামের তালিকা প্রদত্ত হইবে, ইহা অসম্ভব।

নিরঞ্জন ধর্ম্ম ঠাকুরের নামান্তর। ধর্ম্ম ঠাকুর "শূন্যমূর্ত্তি" বলিয়া নিরঞ্জন। ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজক যে জাতীয় হউন, পণ্ডিত নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ না হইলেও ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে তিনি পণ্ডিত। দ্বিজ বলিলে যেমন হঠাৎ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, পণ্ডিত শব্দেও তদ্রূপ হিন্দুস্থানীরা ব্রাহ্মণকে বুঝিয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজের সেবক আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত রাঢ়ে পণ্ডিত নামে খ্যাত। যেমন মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় শিবের গাজন হইয়া থাকে, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মোপলক্ষে তদ্রূপ ধর্ম্ম ঠাকুরের গাজন হইয়া থাকে। চড়কের সন্ন্যাসীদের মত ধর্ম্মের সন্ন্যাসীরাও গাজনের সময় উপবীত বা উত্তরীয় পরিধান করে। যতদিন উত্তরীয় না নামায়, ততদিন আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান করে। পরশুরাম ধর্ম্মের সন্ন্যাসী ছিলেন, এজন্য যদি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অন্যায় হইবে না। "সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে" এই জন্য সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় ধারণকালে ব্রাহ্মণ সদৃশ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

পাত্র অর্থে ব্যক্তি ও পর্য্যায় দুই বুঝায়। অষ্টগ্রামী তাম্বূলী মালিকের পাত্র থাকে। সেখানে পাত্র অর্থে ব্যক্তি। পাত্রের পর্য্যায় অর্থ গ্রহণ করিয়া দ্বিজবৎ অর্থে দ্বিজপাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। পরশুরাম দ্বিজপাত্র অর্থাৎ দ্বিজবৎ গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ না হইয়াও তিনি তদ্রচিত কারিকায় দ্বিজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পরশুরামকে তাম্বূলী বোধ করিবার চারিটী হেতু আছে। প্রথম, পুত্রগণের নামোল্লেখ কালে তাঁহার দাস উপাধি ব্যবহার; দ্বিতীয়, হরানন্দের পিতাকে

কারিকা লেখক হইতে অভিন্নজ্ঞান; তৃতীয়, বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া সমাজে প্রচলিত পরশুরাম-দাঁড়া-প্রবর্ত্তককে কারিকা লেখক মনে করা; চতুর্থ, দ্বিজপাত্র পূজার স্থলে তাম্বূলী পূজা কথন। এই চারিটী হেতুর মধ্যে, মধ্যের দুইটী অনুমানের উপর স্থাপিত। সুতরাং ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। চারি স্থানে দৃষ্ট পরশুরাম একাধিক ব্যক্তি হইতে পারেন। তাম্বূল-বণিক লেখক সেই কারণে উক্ত বিষয়ে "বোধ হয়" এবং "অনুমান করিতে পারি" ইত্যাকার লিখিয়াছেন।

দ্বিজপাত্রের পূজা আছে, অতএব দ্বিজপাত্র কে, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া "জিজ্ঞাসা পড়ার খাতায়" একটী আখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত "নিরঞ্জন দাস সে" ইত্যাদি ৬ পংক্তি তাহার একাংশ। ব্রাহ্মণগণ দূত দিয়া হরানন্দ যাহার পুত্র, তাঁহাকে অথবা হরানন্দকে ডাকিয়া আনিলেন, তাহা বুঝা আবশ্যক। পিতা অথবা পুত্র, প্রজাপালন করিলেন কে? যিনি ব্রাহ্মণের অনুরোধে প্রজাপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ রাজার পাত্র অর্থাৎ দ্বিজপাত্র কহা যাইতে পারে। পরশুরাম বা হরানন্দ যিনিই হউন, একজনকে দ্বিজপাত্র করিয়া দিতে পারিলেই আখ্যান-রচয়িতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাম্বূল-বণিক-প্রণেতা পরশুরামকে দ্বিজপাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অনুরাগী বন্ধুগণ এ বিষয় আলোচনা করিলে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা।

মহাভারতী মহাশয়ের পুস্তকে দেওয়ান চন্দ্রভূষণ আশ প্রভৃতির কথা পাঠের যোগ্য। তদ্ভিন্ন নূতন-তর কথা অনেক আছে। আলোক ছায়ার জন্য সেগুলি ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, তিনি তাম্বূলী-কুলকে সদয় ভাবে দেখিয়াছেন বলিয়া, সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাম্বূলীর বৈশ্যত্ব অতি বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাকে সমর্থন করিতে দেখা গেল।